ভূমিকা

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন, আমি অবতার। অবতারের একটি প্রধান কর্ম ধর্ম-সংস্থাপন। এই ধর্ম-সংস্থাপনের প্রধান কেন্দ্র গৃহস্থাশ্রম। ইহা হইতেই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমানে ভারতের গৃহস্থাশ্রম ভগ্নপ্রায়, আদর্শহীন, পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষায় বিভ্রান্ত। মনের স্থৈর্য ছিন্নভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভগ্নপ্রায় গৃহস্থাশ্রমের পুনরুদ্ধার করিবেন। এই গৃহস্থাশ্রম পুনরুদ্ধারের একটি প্রধান যন্ত্র করিলেন শ্রীমকে।

আচার্য শ্রীম-র তিনটি কার্য। প্রথম, সংসারতপ্ত লোকদের 'ভাগবত' শোনান। দ্বিতীয়, ভাগবত, 'কথামৃত' প্রকাশ। তৃতীয়, আদর্শ গৃহস্থজীবন-যাপন, যেমন চৈতন্য-পার্ষদ নিত্যানন্দ ছিলেন।

জগদম্বা আমাকে বলিয়াছেন, তোমাকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবে। আর লোকদের 'ভাগবত' শুনাইতে হইবে — ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া শ্রীম-র মন-প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই সাতাশ বৎসর বয়সেই তিনি সংসারের বিভীষিকার রূপ দর্শন করিয়াছেন। 'সংসার জ্বলন্ত অনল', ইহা বুঝিয়াছেন। তাই তিনি ইহা হইতে পলায়ন করিতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে অজ্ঞাতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দর্শন, কথা শ্রবণ, দিব্যস্নেহ শ্রীমকে অভিভূত করিল।

তিনি ভাবিলেন, এইবার ঠাকুরের সাহায্যে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিব। কিন্তু ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত ভীত হইল। হৃদয় কাঁপিল। তাই তিনি ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলেন সন্ন্যাসের জন্য।

কিন্তু ঠাকুর কৃতসংকল্প। তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না। সন্ন্যাস অনুমোদন করিলেন না। বলিলেন, তোমাকে গৃহেই থাকিতে হইবে, সন্ন্যাসীর মত। শ্রীম পুনঃ পুনঃ আপত্তি করিলে ধমক দিয়া বলিলেন, কেহ মনে না করে, আমি না হলে জগদম্বার কাজ আটকে থাকবে। জগদম্বা একখণ্ড তৃণ

থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন। শ্রীম শুনিলেন, কিন্তু প্রাণ উহা গ্রহণ করিতে চাহিল না। তাই আবার প্রার্থনা করিলেন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসের জন্য।

কেন প্রাণ চাহিল না? প্রথম, সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন। দ্বিতীয়, এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে তিনটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে — রাখাল, যোগেন ও তারককে — সন্ন্যাস-আশ্রমী করিবেন, তাঁহারা দার পরিগ্রহ করিলেও, শ্রীম বুঝিলেন। যদি তাঁহাকেও ইহাদের মত কৃপা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দেন, এইজন্য বার বার সন্ন্যাসের প্রার্থনা।

কিন্তু শেষবারে ঠাকুর রাত্রিতে গোল বারান্দায় দাঁড়াইয়া পুনরায় ধমক দিয়া বলিলেন, একটা পাইপ নষ্ট হইলে ইন্‌জিনিয়ার আর একটা পাইপ লাগাইয়া দেয়। তাহার কাজ বন্ধ থাকে না।

শ্রীম শ্রীগুরুর স্নেহ-শাসনে মনস্থির করিলেন, গৃহস্থাশ্রমেই থাকিবেন গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইয়া — ঠাকুরের আদেশে। এইবার ঠাকুর তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত করিয়া সাধনা ও শিক্ষা দিলেন নানাভাবে। আর দৈবকার্যের জন্য বৈদান্তিক সন্ন্যাস না দিলেও শ্রীমকে তান্ত্রিক সন্ন্যাস দিলেন। বলিয়াছিলেন, ঠাকুর আমাকে ও বাবুরামকে একদিনে পূর্ণাভিষিক্ত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দাদি গুরুভাইদের মত গুরুকৃপায় তিনিও ঈশ্বরদ্রষ্টা। ঠাকুর তাঁহার নিজের রূপ তাঁহাকে কখনও কখনও দেখাইতেন। শ্রীম বলিতেন ভক্তদের (শ্রীম-র) ধাঁধা লাগিয়া যাইত — ইনি দেব কি মানব! এদিকে পূজারী — ওদিকে দেখিতেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরব্রহ্ম।

ঠাকুর শ্রীমকে বলিলেন, বড় ঘরের দাসীর মত নিজ গৃহে থাক। দাসী সকলের সেবা করে, কিন্তু সেবা নেয় না। শ্রীমকেও এই শিক্ষা দিলেন। বলিলেন, পরিজনদের ভিতরে ঈশ্বর আছেন। তাঁহারই সেবা করিতেছ, এই বুদ্ধিতে সেবা করিবে। বাহিরে তাহাদের দেখাইবে যেন কত আপনার জন। কিন্তু অন্তরে জানিবে, তুমিও তাহাদের কেহ নও। তাহারাও তোমার কেহ নয়। ঈশ্বরই তোমার ও তাহাদের আপনার জন।

শ্রীম ভাবিলেন, কি করিয়া ইহা সম্ভব হয়? কিন্তু ঠাকুরের কৃপায়,

তাঁহার উপদেশে আর আপনার চেষ্টাতে বুঝিতে পারিলেন, সত্যই তো ঈশ্বর সকলেরই আপনজন। মানুষের জন্মের পূর্বেও ঈশ্বরই সঙ্গে থাকেন। মৃত্যুর পরেও তিনিই সঙ্গে যান, যতদিন না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যায়। আমাদের পূর্বজন্মের পরিজন কেহই তো ছিল না এবারের নবজন্মে। তাহাদের কথা কেহ জানে না। তাহারাও জানে না নবজন্মের কথা। তেমনি মৃত্যুতে এই জন্মের পরিজন কেহই তো সঙ্গে যায় না। শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখা যায়, এক ঈশ্বরই আমাদের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে সঙ্গে থাকেন। এবং বর্তমান জীবনেও সঙ্গে থাকেন। তিনিই পরম ও চরম বন্ধু। তাঁহাকেই এই জীবনের প্রথম ও প্রধান বান্ধব মনে করিতে হইবে। পূজা করিতে হইবে। দর্শন করিতে হইবে। তাঁহার সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে। এবং অনন্তকালের একমাত্র বান্ধবের মত আচরণ করিতে হইবে তাঁহার সহিত।

ঈশ্বর অনন্তকালের বন্ধু। সংসারের পরিজন দু'দিনের বন্ধু। অতএব ঈশ্বর আগে, সংসার পরে — ইহা চরম সত্য। ইহাই জীবনে জাগ্রত ও জীবন্ত করিতে হইবে। ইহারই নাম যথার্থ ধর্ম।

শ্রীম-র হৃদয়ে অযুত হস্তীর বল আসিল। তিনি জনকাদির ন্যায় পূর্ণ জ্ঞান হৃদয়ে রাখিয়া গৃহস্থাশ্রমের সর্ববিধ কর্তব্য সম্পাদন করিলেন সিংহবিক্রমে। আবার অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া অহর্নিশ রামকৃষ্ণ-কথামৃত — মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানদর্শন — এই মহাবাণী — প্রচার করিলেন। ইহার ফলে শত শত যুবক সন্ন্যাসী হইল। আর সহস্র সহস্র গৃহস্থ সদ্‌গৃহস্থ হইল। কিন্তু নিজের জীবনটি ঋষিবৎ নির্লিপ্ত রাখিলেন। আর শ্রীগুরু কথিত দাসীবৎ সর্বকার্য সম্পন্ন করিলেন। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই গৃহস্থাশ্রমই মেরুদণ্ড। ঠাকুর শ্রীম-র দ্বারা এই গৃহস্থাশ্রমের পুনরুদ্ধারের সূত্রপাত করাইলেন।

শ্রীম কিরূপ দাসীবৎ নিজগৃহে সারাজীবন ছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে নিম্নে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি।

কালীঘাট। গদাধর আশ্রম। শীতকাল। শ্রীম এখানে বাস করিতেছেন সাধুসঙ্গে কয়েক মাস ধরিয়া। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। রাত্রি নয়টা। শ্রীম সেবককে বলিলেন, 'মর্টন স্কুলে যেতে হবে। তিনি সেবক

সঙ্গে রওনা হইলেন। ট্রামে চলা তাঁহার প্রিয় অভ্যাস। মর্টন স্কুলে পৌঁছিতে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। পরিজনগণের অনেকের আহার হইয়া গিয়াছে। আর কেহ কেহ আহার করিতে বসিয়াছেন, তিনতলের উত্তরাংশে।

শ্রীম কিছু না বলিয়া সেবককে লইয়া চারিতলের নিজ কক্ষে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলেন। সেবকের ভাবনা, অত রাত্রিতে কি খাওয়ান যায়। বৃদ্ধ শরীর। তিনি স্থির করিলেন, পরিজনদের গিয়া বলি, কিছু ব্যবস্থা করিতে। এই ভাবিয়া যুবক সেবক আট দশ সিঁড়ি নিচে ধড়্ ধড়্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন। শ্রীম বুঝিতে পারিলেন, সেবক পরিজনদের কাছে যাইতেছেন। তাই অনুনয় বিনয় করিয়া সেবককে উপরে ফিরাইয়া আনিলেন। বলিলেন, এই রাত্রে যদি এই ঘরের ঝি দেশ থেকে আসতো, তবে কি গৃহবাসীরা তাঁকে রেঁধে খাওয়াতো? সেবক বলিলেন, না। শ্রীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খেতে দিত? সেবক উত্তর করিলেন, বাজার থেকে খাবার এনে দিত। শ্রীম বলিলেন, ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, বড়ঘরের দাসীর মত থাকবে নিজ গৃহে। যদি দাসীকে তাঁরা রেঁধে না খাওয়াতো, তবে আমাকে কেন রেঁধে খাওয়াবে এই অসময়ে? আমাকে রেঁধে দিতে চাইলেও আমি কেন নেবো? আমার কি অধিকার আছে?

সেবকের বাক্ রুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কি খাওয়াইবেন এই ভাবিয়া। শ্রীম প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে আদেশ করিলেন, যান, বাজার থেকে তিনখানা পাঞ্জাবী রুটি নিয়ে আসুন। সেবকের প্রাণ বুঝিল না। তবুও যন্ত্রচালিতবৎ তিনি মেছুয়াবাজারে গিয়া দরিদ্রের আহার তিনখানা পাঞ্জাবী রুটি লইয়া আসিলেন। শ্রীম পাখীর মত ঠুকরাইয়া ফুলকা অংশ অল্প আহার করিলেন। আর একগ্লাস জল পান করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

শ্রীম-র আহার প্রধানত দিনে গরুর দুধ আর ভাত, বিনা মিষ্টিতে। আর রাত্রে, দুধ-রুটি। এ বাড়িতে গরুর দুধ রাখা হয় নাই। রাখা হইয়াছিল গদাধর আশ্রমে। বাজারে মিশ্রিত দুধের অভাব নাই। কিন্তু শ্রীম তাহা খান না।

সেবক স্তম্ভিত। বিস্ময়ে ভাবিতেছেন, সত্যই দাসীবৎ শ্রীম নিজগৃহে। ঠাকুরের শিক্ষা ষোল আনা তিনি হাতে আনিয়াছেন। ইহাই কি বাজনার বোল হাতে আনা? যেমন অবতার অসাধারণ দেবমানব, তেমনি তাঁহার

অন্তরঙ্গ পার্ষদও অসাধারণ দেবমানব। অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য — পূর্ণ সন্ন্যাস। বাহিরে গৃহাশ্রমী। এ যেন জীবন্ত নাটক! নিজগৃহে প্রবাসী। ধর্মশালার অধিবাসী।

সকল ভাগের মত এই ত্রয়োদশ ভাগেও ত্রিবিধ অমৃত পরিবেশন করা হইয়াছে — শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মপরিবারের কথা, সর্বশাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত ব্যাখ্যা, আর 'কথামৃতে'র ভাষ্য কথামৃতকার দ্বারা।

শ্রীম-দর্শনের এই ভাগে অবতার ও পার্ষদগণের এইরূপ দিব্য জীবন্ত নাটকের পরিচয় পাইবেন পাঠকগণ। এই দিব্য নাটকের অভিনেতার যে কোন ভূমিকার কিয়দংশও নিজ জীবনে পালন করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা ধন্য হইবেন নিশ্চয়। আর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আপন চিত্তে জীবন্ত অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবেন নিঃসংশয়।

বিনীত
গ্রন্থকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ)।
ঋষিকেশ, হিমালয়।
শারদীয়া বিজয়া দশমী, ১৩৭৭ সাল (১৯৭০ খ্রীঃ)।

প্রথম অধ্যায়

সঞ্চয়ন

১

শীতকাল। সকাল পৌনে নয়টা। শ্রীম নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিলেন। মাঘোৎসব চলিতেছে। মন্দির পত্রপুষ্পে সজ্জিত। আনন্দময় স্থান। ব্রাহ্ম ভক্তগণ শুদ্ধ বস্ত্রে শোভিত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে বেঞ্চে উপবিষ্ট। আচার্য প্রমথ সেন বেদীর উপর বসিয়া ব্রহ্ম-গুণগান করিতেছেন। বারবার সুমধুর কণ্ঠে গুণকীর্তনের মধ্যে উচ্চারণ করিতেছেন — 'ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্।' পাঁচজন ভক্ত একভাবে একস্থানে একমনে ভগবৎ গুনগান করিলে সেখানে সর্বতীর্থের সমাগম হয়, সেখানে ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হন — এইসব প্রাচীন মহাবাক্যের জীবন্ত প্রমাণ এই নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ। ভগবানের সান্নিধ্যের সুশীতল ও সুমধুর স্পর্শে ভক্তহৃদয়-বিহারী শ্রীভগবান জাগ্রত আজ। শ্রীম, কথামৃত রচনার বেদব্যাস, মন্দিরের পশ্চিমদিকে বাহিরে দাঁড়াইয়া এই দিব্যস্পর্শ উপভোগ করিতেছেন। আর ভগবৎ-ভাববিভোর ভক্তমণ্ডলীকে যুক্ত করে দর্শন করিতেছেন।

আজ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। ১১ই মাঘ ১৩৩১ সাল, শনিবার। অমাবস্যা ৩৬ দণ্ড। ১৫ পল।

বেলা দশটা। শ্রীম এবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, যুক্তকরে মন্দিরমধ্যস্থিত ভক্তগণকে দর্শন করিতেছেন। এখানে ভীড় বেশী। ভীড়ে শ্রীম-র কষ্ট হয়। ছোট রমেশ শ্রীম-র সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীম বলেন, আজকাল সিন্‌টি বেশ উদ্দীপন করে। কথা সব মনে রাখা সম্ভব নয়। দু'টি জিনিস লাভ হয় এসব স্থানে এলে। একটি, ভগবৎ ভাবের স্পর্শ, আর দ্বিতীয়টি, ঐ স্পর্শে উদ্দীপিত ভক্তগণের মুখমণ্ডল দর্শন। ঠাকুর বলতেন, এই সুসময়ে সাধু ভক্ত দর্শন করতে হয়।

শ্রীম বৃদ্ধ হইলেও এই গুরুবাক্য পালন করেন। পূর্ণকাম হইলেও

বালকের ন্যায় ঔৎসুক্যে নানা সম্প্রদায়ের উপাসনা-স্থলে সর্বদা যাতায়াত করেন। শ্রীমকে দেখিলে ভগবান বেদব্যাসের কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ হয় — আত্মারাম পূর্ণকাম ছিন্নসংশয় হইলেও মুনীশ্বরগণ সর্বদা ভগবৎ রসাস্বাদনে নিমগ্ন, মধুকরের ন্যায় সকল ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, ভগবৎ রসের তৃপ্তি মিটে না, অফুরন্ত।

শ্রীম ভক্তগণকে এই আনন্দোৎসব দর্শন করিতে পাঠাইয়াছেন। কেহ বা শ্রীম-র সঙ্গেই দর্শন করিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজে সর্বত্র আনন্দ। সংসার যেমন কঠোর, এইসব উৎসবানন্দ তেমনি স্নিগ্ধ, সুশীতল ও আনন্দময়। এইসব উৎসবানন্দ না থাকিলে সংসার নিতান্তই জ্বলন্ত অনল — মরুভূমি।

দ্বিতীয় দর্শনে ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁকে ডাক। সৃষ্টিরক্ষা তিনি করবেন। তাঁর সব বন্দোবস্ত পাকা। তিনি ভক্তদের রক্ষার জন্য মঠ মন্দির দেবালয় করেছেন। সাধু করেছেন। ভগবানকে নিয়ে আনন্দোৎসব করেছেন। তোমায় কিছুই ভাবতে হবে না। তুমি কেবল তাঁকে ডাক।

ব্রাহ্ম সমাজ শ্রীম-র অতি প্রিয় — বিশেষত নববিধান। আচার্য কেশব সেন শ্রীম-র মত বাংলার বহু কৃতবিদ্য যুবক-মন হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক চরিত্র-প্রভাবে। এন্ট্রান্সের দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন পড়েন তখন হইতেই কেশব সেনের জন্য শ্রীম-র মন কেমন করিত। এলবার্ট হলের উচ্চ পিলারে আরোহণ করিয়া, যেমন বৃক্ষারোহণ করে লোক, শ্রীম কেশব সেনকে দেখিতেন। তিনি বিলাতি ডাক লিখিতেছেন। মনস্তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণের বিষয় বালকের এই কেশবাকর্ষণ।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শ্রীম-র সশ্রদ্ধ আকর্ষণের অন্য কারণও বিদ্যমান। শ্রীম-র গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখাতেই একাধিকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাই এই সকল স্থান শ্রীম-র নিকট পরম পবিত্র তীর্থবিশেষ। ব্রাহ্মসমাজের অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপাত্র — কেশব, বিজয় প্রমুখ। তাঁহাদের ভিতর দিয়া যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবাহ সঞ্চারিত। ঐ ভাবপ্রবাহ আজও আচার্যগণের প্রবচনের ভিতর দিয়া তরঙ্গায়িত। ব্রাহ্মসমাজে গেলে ঐ ভাবস্পর্শ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তাই শ্রীম ব্রাহ্মসমাজে যান। "কত ভাব ঢুকিয়েছেন ঠাকুরে ওঁদের ভিতর।

নববিধানেই বেশী। 'মা মা' ডাকটি ঠাকুরের দেওয়া। তাই যাই শুনতে ঐসব কথা কিরূপ filtered down (অনুপ্রবাহিত) হয়েছে ওদের ভিতর দিয়ে। ওটি শুনলে খুব আনন্দ হয়। তাঁরা স্বীকার করুন বা না করুন, তাতে কি এসে যায়" — উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীম এই কথা সর্বদাই বলিতেন।

আজের মাঘোৎসব তাই শ্রীম-র মনপ্রাণকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা ছয়টায় পুনরায় শ্রীম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রওনা হইলেন, পরে আদি সমাজে। কিন্তু এবার চলিলেন ডাক্তার বক্সীর মোটরে। পিছনের সিটে ডান হাতে বসিয়াছেন শ্রীম, বামে বড় জিতেন, আর ড্রাইভারের পাশে বসিলেন ডাক্তার স্বয়ং। শ্রীম-র আদেশে জগবন্ধু, বিনয়, ছোট রমেশ ও ভাটপাড়ার ললিত রায় পদব্রজে রওনা হইয়াছেন। রমণী ও সুখেন্দু পূর্বেই মেস হইতে গিয়াছেন। বলাই ও বড় অমূল্য শ্রীমকে মর্টন স্কুলে না পাইয়া আদি সমাজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুকলাল ও মনোরঞ্জন থাকেন বেলেঘাটায়। তাঁহারাও খুঁজিতে খুঁজিতে আদি সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট জিতেন যাইতে চাহিলেও শ্রীম মানা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইলেন তাঁহার বাড়িতে — রাণাঘাটে। পরিবারে অসুখবিসুখ আছে তাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীম বেদীর উপর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বসিয়াছেন। আচার্য শ্রীমকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে নিয়া বসাইলেন পূর্বধারে বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য রাখা চেয়ারে। এই বেদীর উপরই ধ্যানমগ্ন যুবক কেশবকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শন করেন। আর বলিয়াছিলেন, দেখছি এরই ফাত্না ডুবেছে। কেশব সেন এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে চিহ্নিত হন।

শ্রীম বৈদিক সুরে উপনিষদ্ পাঠ শুনিতেছেন। তারপর শুনিলেন, প্রাচীন রাগ-রাগিণীতে পাখোয়াজ সংযোগে উচ্চশ্রেণীর ভজন। এ দু'টিই শ্রীম-র অতি প্রিয়।

আজ খুব ভীড়। এখন সন্ধ্যা সাতটা। গরম বোধ হওয়ায় শ্রীম চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন। আর অভিভূতের মত সবেগে ভীড় ঠেলিয়া বাহিরে চলিয়াছেন। পায়ের চটিজুতা পড়িয়া রহিল। ভক্তরা উহা উঠাইয়া লইলেন। শ্রীম-র পিছনে বাহির হইলেন ভীড় ঠেলিয়া জগবন্ধু, বিনয়,

ডাক্তার, সুখেন্দু, বড় জিতেন ও ললিত রায়। শ্রীম একতলায় নামিয়া রাস্তার উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া জোরে নিঃশ্বাস লইতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘর্মে সিক্ত এই মাঘের শীতেও। উপনিষদের ভাবধারায় অবগাহন করিয়া মন বুঝি ব্রহ্মলীন হইতেছিল, সেই সঙ্গে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব। তাই কি শ্রীম-র এই অভিভূত ভাব?

ডাক্তার শ্রীমকে লইয়া মোটরে শীঘ্রই উন্মুক্ত স্থানে রওনা হইলেন, সঙ্গে গেলেন ললিত রায়। পিছনে পদব্রজে চলিলেন ভক্তগণ দলে দলে। বড় জিতেন স্থূলকায়, চলিতে কষ্ট হয়। তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া চলিলেন অন্তেবাসী। যাঁহারা ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইতে পারিলেন না, তাঁহারা আসিলেন প্রায় সাড়ে আটটায় সভা ভঙ্গের পর।

মর্টন স্কুলের অঙ্গনে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য — তাঁহার সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ আমহার্স্ট স্ট্রীট। শ্রীম খুব ক্লান্ত। এখন অনেকটা সুস্থ। তাই ডাক্তারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছেন চেয়ারের পিছনে। ভক্তগণ শ্রীমকে ক্লান্ত দেখিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীম ক্ষীণস্বরে বলিতেছেন বিদায়বাণী — এইসব স্থান তাঁর স্মৃতিতীর্থ। পবিত্র হয়ে থাকবে চিরকাল। তাই যাই। কপালে না থাকলে হয় না। যেতে হয় যাদের গায়ে জোর আছে।

কিন্তু আজের উৎসবের 'সোম' (সোমরস) দিলেন বড় জিতেন। ভক্তরা অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এখনও আছেন তাঁহাদের প্রেমে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন বড় জিতেন, তাঁহার বৃন্দাবন লেনের বাড়িতে। মেঝেতে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন জগবন্ধু, বিনয়, মনোরঞ্জন ও উকীল ললিত ব্যানার্জী — সঙ্গে প্রচুর ঘৃতসিক্ত অতি উত্তম খিচুড়ি। কারণ-শরীরের আহার দিলেন শ্রীম, সূক্ষ্ম শরীরের আহার মিলিল আদি সমাজে। আর বড় জিতেন 'সোম' দিলেন স্থূল শরীরের আহার দিয়া। উৎসব আজ সম্পূর্ণ।

২

সকাল সাড়ে নয়টা। আজ ২৫শে জানুয়ারী রবিবার, শ্রীম একাকী নববিধান ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছেন। অন্তেবাসী দশটায় গিয়া দেখিলেন, শ্রীম মন্দিরের ভিতর পশ্চিমদিকে বসিয়া আছেন। আচার্য বেদীতে বসিয়া

বক্তৃতা দিতেছেন। এগারটায় শেষ হইল।

শ্রীম মন্দিরের বাহিরে আসিয়া বুকস্টলে দাঁড়াইয়া আছেন — পুস্তক দেখিতেছেন। নববিধানের প্রচার-আশ্রম ইহা খুলিয়াছে।

শ্রীম অমৃতকে বলিলেন, এ কয়খানা কিনতে পারেন, যদি পয়সা সঙ্গে থাকে — (১) সাধু সমাগম, (২) নবশিশুর জন্ম আর (৩) এইখানা। প্রত্যেকখানার দাম এক আনা।

অন্তেবাসী বলিলেন, আমার কাছে পয়সা আছে। কিন্তু শ্রীম এ কথায় সাড়া দেন নাই। অমৃত কিনুন ও পড়ুন, শ্রীম-র ইচ্ছা।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য উপবিষ্ট। সম্মুখে বেঞ্চে বসা এটর্নি বীরেন বসু, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি।

একথা সেকথার পর শ্রীম বীরেনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — আপনি যান নাই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে? আমরা সব গিছলাম।

বীরেন — আমি দক্ষিণেশ্বর গিছলাম। ঐখানে বেশ লাগে। ব্রাহ্মসমাজে সব মেয়েরা যায়। মন তো সর্বদা ঐদিকেই রয়েছে। ওখানে মন ঠিক হয়ে বসে না।

শ্রীম — একবার দেখে আসা ভাল।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বিস্ময়ে বলতেন, ওমা এও আবার সম্ভব নাকি — পাশে মেয়েরা বসে আছে আর মন গিয়ে ঈশ্বরে লগ্ন হয়ে গেল! তা হয় না। মেয়েদের সঙ্গে মন ঈশ্বরে স্থির হয় না। কি করে হবে?

সাধকের অবস্থায় ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বিচার করা ভাল। ছাদে উঠলে আর এক কথা।

শ্রীম পুনরায় কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগ কি চারটিখানি কথা। পূর্বজন্মের বহু তপস্যা থাকলে হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতে হবে। 'এখানে' মানে তাঁর কাছে। তিনি সর্বস্ব

ত্যাগের প্রতীক। 'সর্বস্ব ত্যাগ' মানে জগতের ত্যাগ, মানে ভোগবাসনার ত্যাগ। অন্যদিকে ব্রহ্মানন্দ ভোগ। একটা ছাড়লে অন্যটা পাওয়া যায়। একসঙ্গে দু'টো হয় না। যাঁদের ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে, তাঁরা পারেন। তাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে পাকা — আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ। তাঁদের মনটি যেন ম্যাগনেট — সর্বদা উত্তর দিকে থাকে। ঠাকুর বলতেন, যেন দাঁতের ব্যথা। হাজার কাজ কর, কিন্তু ভিতরে মন পড়ে আছে ঈশ্বরে।

ঠাকুর বলতেন, জিনিস মাত্র দু'টো, ঈশ্বর ও সংসার। এর ভিতর ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। সাধারণ মানুষের মন পড়ে আছে সংসারে। 'সংসার' মানে কামিনীকাঞ্চন। মনটাকে সংসার থেকে তুলে নিয়ে ঈশ্বরে লগ্ন করা। কোটি জন্ম কেটে যায় এই চেষ্টায়।

একজন ভক্ত — কি দরকার, ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টার? সংসারে তো বেশ থাকা যায়। কত আনন্দ — স্ত্রী পুত্র কন্যা ধন জন কত কি!

শ্রীম — হাঁ, এটা তাঁর অবিদ্যার ডিপার্টমেণ্ট। এখানে ঐ চিন্তা, অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা আসে না। শোকতাপের ধাক্কা জন্ম জন্ম খেয়ে তবে ঈশ্বরের পরমানন্দের সন্ধান করে লোক। আমরা এই বিদ্যা ডিপার্টমেন্টের কথাই বলছি। বিদ্যা মানে, ঈশ্বরের সন্ধানের চেষ্টা, জ্ঞান, ভক্তি, সাধুসঙ্গ — এ সবে মন ঈশ্বরে যায়। অবিদ্যায় সংসারে দৃঢ়বদ্ধ হয়।

শ্রীম আবার মৌন, আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটি ছেলে আই.এস.সি. পরীক্ষা দিবে। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ্ পেয়েছিল। পড়া ভাল লাগলো না। পালিয়ে এসে এক ফ্রেণ্ডের কাছে রয়েছে। বাপ জানতে পেরে ফ্রেণ্ডকে চিঠি লিখেছে, আত্মহত্যা করবে! আমাদের জিজ্ঞেস করলে ফ্রেণ্ড, সে কি করবে। আমরা বললাম, ঐ চিঠিটা বরং তাকে দেখাও। তখন সে বললে, তাকে আপনি একবার বলবেন কি? আমরা বললাম, আমি কেমন করে তাকে বলি, ফিরে যাও — শ্রেয়ের পথ নিয়েছে।

তাই বলছিলাম, ওকেই বল, বাপকে লিখতে। ইচ্ছা হয় লিখবে, না হয় না লিখবে। কিংবা, তোমাকে বললে, তুমিও লিখতে পার, এখানে আছে আর ভাল আছে।

আমরা কি করে বলি, বাড়ি ফিরে যাও শ্রেয়ের পথ ছেড়ে? দুর্লভ

মানুষজন্মে যদি ভগবানলাভের ইচ্ছা হল, তবে এর চাইতে সৌভাগ্য আর কি আছে?

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতে হবে। শেষ জন্মে ঈশ্বরলাভ হয়। ঈশ্বর এখন এখানে নররূপে অবতীর্ণ। কার একথা বলার শক্তি আছে, ঈশ্বর ছাড়া? আর হয়েছিলও তাই। আবার এখনও হচ্ছে তাই। ভবিষ্যতেও হবে তাই, যাবৎ না অন্য অবতারশরীর তিনি ধারণ করেন।

আর বলেছিলেন, মা, যারা এখানে আন্তরিক আসবে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। নিজেই সব করেন কিন্তু মায়ের নামে। Credit (সুনাম) নিবেন না।

আহা, কি সব ছেলে বেরুচ্ছে গো — সোনার চাঁদ সব! কুমার বৈরাগ্যবান, অনাঘ্রাত কুসুম। ঠাকুর বলতেন, (এরা) নূতন হাঁড়ি, দই বসবে ভাল।

ঠাকুরের নাম শুনে কেমন ছুটে আসছে সব, যেখানে যে আছে সেখান থেকে। তিনি পূর্বেই একথা বলেছিলেন কিনা, এরপর অনেক আসবে — নানান দেশের লোক। মা দেখিয়েছিলেন তাঁকে, নানা লোক নানা পোষাক ও নানা ভাষায় কথা কইছে। এদের কেন এখানে আনলে বলায় মা উত্তর করেছিলেন, বাবা, কলিতে এ হবে।

৩

বেলুড় মঠে আজ '২৬শে জানুয়ারী', স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। শ্রীম ছাদে অন্তেবাসীর টিনের ঘরের সম্মুখে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। টিনের ঘরে বসিয়া শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ গৃহশিক্ষকের কাছে পড়িতেছে। সে ম্যাট্রিকের জন্য তৈরী হইতেছে। শ্রীম শিক্ষককে বলিয়া দিতেছেন মাঝে মাঝে কি ভাবে পড়াইতে হইবে। অল্প সময়ে বেশী কাজ চাই। আবার পরীক্ষা পাশের উপায় কি, তাহাও বলিতেছেন।

অন্তেবাসী দিনে কাজ ছিল বলিয়া মঠে যাইতে পারেন নাই। শ্রীম তাঁহাকে তাই মঠে রাত্রিবাস করিতে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, কালীপূজা

দর্শন করা উচিত সাধুদের সঙ্গে রাত্রি জাগরণ করিয়া। বলিলেন, এতে হিমালয়ে তপস্যারও অধিক ফল হয়। এসব সঙ্কেত কি আমরা জানতুম? ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বত্যাগীর পুজোতে মায়ের সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়। ভাগ্যে থাকলে এসব হয়।

পরের দিন ২৭শে। অন্তেবাসীকে শ্রীম বলিলেন, আপনি রাত জেগেছেন আর দিনে কাজ করেছেন। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। পাশের সিঁড়ির ঘরে ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য উপবিষ্ট।

২৮শে জানুয়ারীর নৈশ ভক্ত-সম্মিলন বসিয়াছে দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে। এই ঘরে আগামী কাল বীণাপাণির অর্চনা হইবে। মূর্তি উত্তর প্রান্তে স্থাপিত দক্ষিণাস্য। ছাত্র ও শিক্ষকদের পূজার আয়োজনের উদ্দীপনা। শ্রীম বসিয়াছেন মেঝেতে দেবীর সম্মুখে উত্তরাস্য। ভক্তরাও মেঝেতে মাদুরে বসিয়াছেন শ্রীম-র দুই পাশে ও পিছনে।

শ্রীম ডাক্তার বক্সীকে কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে কোন্নগরের সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঠ শুনিতেছেন আর মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতেছেন। বলিলেন, ঠাকুর যেমন নূতন সাধু তৈরী করেছেন তেমনি পুরানো সাধুদেরও সংস্কার করেছেন। তাঁদের দ্বারাও তাঁদের নিজের ও সমাজের কল্যাণকর কাজ করিয়ে নিয়েছেন। তাঁর নবীন উদার মত — 'মতপথ' — এটাও উপযুক্ত লোক দেখে ঢুকিয়েছেন তাঁদের ভিতর। কেউ কেউ তর্ক করতে আসতেন। তিনি তখন কখনও সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। যাঁদের সংস্কার ভাল তাঁরা তাঁর এই অবস্থা দেখে নির্বাক হয়ে যেতেন। কারুকে কারুকে আবার স্পর্শ করে তর্কবৃত্তি চিরতরে বন্ধ করে দিতেন। একজন সাধু দেয়ালে কয়লা দিয়ে লিখেছিলেন, আজ থেকে আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত নিলাম। ঠাকুর ভগবান, অবতার। তাঁর কৃপায় কুতর্ক সুতর্ক হয়। সব অবতারেই এরূপ দেখা যায়। ক্রাইস্টের কৃপায় কুতর্কী বিরোধী সল, পল হলো। ইনিই সেন্ট পল যিনি খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। দেহত্যাগের পর সলকে দর্শন দিয়ে সেন্ট পল করলেন। সংস্কার, এক অবতার পারেন বদলাতে। আর কারো সাধ্য নাই। ঠাকুরও আপন ভক্তদের সংস্কার বদলে দিয়ে নিজের ভাবে এই সব

ভক্তদের তৈরী করেছেন।

আজ ২৯শে জানুয়ারী। সরস্বতী-পূজা। ছাত্রদের আনন্দ ধরে না। উত্তম পোষাকে সাজিয়া তাহারা আসিয়াছে। শ্রীমও যেন আজ একটি বালক। ছেলেদের মত বার বার মায়ের সম্মুখে আসিতেছেন। আবার কখনও মায়ের সম্মুখে বসিয়া পূজা দেখিতেছেন। আনন্দে ঢল ঢল আজ শ্রীম। শিক্ষক বামনদাস মুখোপাধ্যায় পূজারী। কখনও শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া মাকে হৃদয়ে বিরাজিতা দেখিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী মা। ভক্তদের শ্রীশ্রীমাঠাকুরুণকে ঠাকুর ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী মহাসরস্বতীর অংশভূতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। আজ এই সব মহাবাণী বুঝি শ্রীম-র মনে উদিত হইতেছে। তাই ধ্যানস্থ।

শ্রীম করজোড়ে মাকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেছেন। উত্তর-পূর্ব জানালার নিচে বসিয়া, মাকে ডান হাতে রাখিয়া। পূজা শেষ হইল নয়টায়। এবার অঞ্জলি। ছেলেরা দলে দলে আসিতেছে আর পুষ্পাঞ্জলি মায়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছে। শ্রীম-র ইঙ্গিতে ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। বারংবার ধ্বনিত হইতেছে মায়ের প্রণাম মন্ত্র —

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥
সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে॥

আর প্রার্থনা মন্ত্র —

ওঁ যথা ন দেবো ভগবান ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যাজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভি পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী॥

শ্রীম-র পাশে উপবিষ্ট সব ভক্তগণ — বড় জিতেন, ললিত ব্যানার্জী, ছোট নলিনী, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট অমূল্য, ছোট রমেশ, বিজয় প্রভৃতি।

এবার স্কুলের ছেলেদের পাতার ঠোঙ্গায় প্রসাদ দেওয়া হইতেছে ফল

মিষ্টি। ভক্তগণও হাতে হাতে প্রসাদ পাইলেন।

বেলা বারটা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছাত্রগণ বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে — লুচি, ছোলার ডাল, তরকারী, চাট্‌নী, দই ও মিষ্টি। আর মাঝে মাঝে 'সরস্বতী মাইকী জয়' ধ্বনি করিতেছে আনন্দে।

সন্ধ্যারতি চলিতেছে। এ সময় ছাত্রগণ অল্প। শ্রীম ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া করজোড়ে আরতি দর্শন করিতেছেন। আরতিতে সকালে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই উপস্থিত। এ বেলা অধিকন্তু আগমন করিয়াছেন ডাক্তার বক্সী, গদাধর, বুদ্ধিরাম, ভাটপাড়ার ললিত রায়, মনোরঞ্জন, এটর্নি বীরেন প্রভৃতি। আরতির পর শীতল-প্রসাদ সকলের হাতে হাতে দেওয়া হইতেছে।

শ্রীম আজ খুব ক্লান্ত। তাই নিত্যকার নৈশ সভা হয় নাই। মায়ের সামনে বসিয়াই বলিলেন, এ সব আনন্দোৎসব না থাকলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তাই ঋষিগণ এ সবের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন ছেলেকে মা ঘুম থেকে উঠিয়ে খাওয়ায় তেমনি এসব উৎসব। মানুষ সংসারে ভুলে যায় ভগবানকে। এ সব উৎসবে তাঁর স্মরণ হয়। বিষয়ানন্দ আবার উৎসবানন্দ, এ দু'টোতে চলে সংসার।

আজ মা সরস্বতীর বিসর্জন। কাল গিয়াছে পূজা। মর্টন স্কুলের ছাত্রগণ অপরাহ্নে স্কন্ধে বহিয়া দেবী প্রতিমাকে গঙ্গাতটে লইয়া গেল। সঙ্গে পাঠাইলেন শ্রীম কয়েকজন শিক্ষককে, অপরের সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া যাহাতে না হয় তাই। কুমারটুলীর ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করিয়া ছেলেরা দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল।

কলিকাতা মহানগরীর সর্বত্র গঙ্গাতটে আজ দেবীর বিসর্জন। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা দেবীকে বিসর্জন দিয়া কত রকমের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। কেহ গাহিতেছে স্বদেশী গান — 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', — এই রবীন্দ্র-সঙ্গীত। অপর দল গাহিতেছে, 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা' — ডি.এল. রায়ের এই প্রাণমাতান সঙ্গীত। কেহ গাহিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিপ্লব-সঙ্গীত, 'বন্দে মাতরম্' — সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্। কেহ গাহিতেছে

সরস্বতী বন্দনা, 'বেদপ্রসবিনী বিঘ্ন-বিনাশিনী জ্ঞানবিকাশিনী জ্ঞানদে।'

সমগ্র কলিকাতা আজ নৃত্যগীত-আনন্দে মুখরিত। যেন বিদ্যাদায়িনী ব্রহ্মশক্তি আজ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

মর্টন স্কুলের অঙ্গনে আজ বালকগণ উন্মত্ত হইয়া নৃত্যগীত করিতেছে। আনন্দের বান আসিয়াছে। সপ্ততিবর্ষীয় আর একটি বালকও এই স্বচ্ছ নির্মল আনন্দপ্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইনি হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ কথামৃতকার শ্রীম। তাঁহার চোখে মুখে অপার্থিব আনন্দের ছটা। ইনি স্থান কাল ভুলিয়া গিয়া ছেলের দলের ভিতর দাঁড়াইয়া আছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন, ইনি মর্টন স্কুলের রেকটার, জ্ঞানী গুরু। একঘন্টার উপর নৃত্যগীতের এই নির্মল উন্মাদনার প্রবাহ চলিল।

এইবার পূজার ঘরে শান্তিজল সিঞ্চন। পূজারী শিক্ষক বামনদাস আম্রপল্লবের সাহায্যে শান্তিজল সিঞ্চন করিতেছেন। ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণ, ভক্তগণ ও শ্রীম মেঝেতে বসিয়া শান্তিজল মস্তকে ধারণ করিতেছেন। পূজকের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে — ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ ঔষধি বনস্পতি শান্তিঃ মনুষ্যদেবগন্ধর্ব শান্তিঃ সর্বজীব শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ।

এখন মিষ্টান্ন বিতরণ। বালকগণ আনন্দে একে অন্যের হাতের মিষ্টান্ন বাজের মত ছোঁ মারিয়া খাইতেছে। হো হো করিয়া হাস্যরোল উঠিতেছে। আবার কেহ হৃত মিষ্টান্নে ভরা মুখে সপ্রেমে আপনাংশ গুঁজিয়া দিতেছে। নির্মলানন্দ মূর্তিমান।

এই হাস্যকৌতুক পর্ব শান্ত হইলে শ্রীম ছাত্র ও শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া আশীর্বাণী বর্ষণ করিতেছেন —

আমার প্রথমে ভয় হচ্ছিল কারো সঙ্গে hitch (ঝগড়া) না হয়। শেষে মনে হলো, না, সকলেরই sympathy (সহানুভূতি) হবে দেবীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে।

শুনেছি, কলিতে তপস্যা নাই। সত্য কথা, আর যা করবে ভগবানকে নিয়ে — এ দু'টি মাত্র তপস্যা আছে। আর কোনও তপস্যা নাই। আজ যা করলে ওরা, এ খুব কাজ হলো।

শ্রীমকে প্রণাম করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিদায় লইলেন। রাত্রি নয়টা।

মর্টনের দ্বিতলের বৃহৎ বারান্দা। অনেকগুলি বেঞ্চ আছে। একটাতে শ্রীম বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। ভক্তগণও কেহ কেহ বসা আশে পাশে। কেহ বিদায় লইতেছেন। সকলেই আজ আনন্দক্লান্ত।

এখন শ্রীম-র পাশে বসা আছেন ডাক্তার বক্সী ও তাঁর ভাই বিনয়, জগবন্ধু, ছোট রমেশ ও ভৌমিক, গদাধর ও বুদ্ধিরাম আর ছোট অমূল্য। ছোট অমূল্য দ্বিতলের ভক্তদের শয়নগৃহের মেঝে ভিজা নেকড়া দিয়া মুছিতেছেন। ছোট রমেশও গিয়া তাহাতে হাত দিলেন।

গদাধর ও বুদ্ধিরাম কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেছেন সব কাজ কর্ম ছাড়িয়া। তপস্যার ভাবে আছেন। ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ হয়। তাঁহাদের সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন স্বভাব-গম্ভীর শ্রীম।

শ্রীম (গদাধর ও বুদ্ধিরামের প্রতি) — দেখ নাই, সাধু রোগ ভাল করে দেয়? তা' কি টাকা পয়সা খুব হবে বলে? তাদের সংসারীরা ভালবাসে। বলে, আহা, তিনি যেই আমাদের বাড়িতে এলেন, তার পরই, মাসে ছিল দু'শো টাকা মাইনে, হয়ে গেল হাজার টাকা। খুব সাধু (হাস্য)!

শ্রীম (সকলের প্রতি) ঠাকুরের এক একটি কথা মহামন্ত্র। সংস্কার না থাকলে বুঝতে পারে কি? অন্যলোকের একটা কথা ধরতেই কত জন্ম কেটে যায়।

সংস্কারবান পুরুষ যারা তারাই তাঁর কথার অধিকারী।

এখানকার একজন ভক্ত একজন সাধুকে একটা কথা বলেছিলেন। সাধু শুনে বললেন, আমি পঁচিশ বছর ধরে কত কথা শুনেছি, কত কি করছি, কিন্তু এমন কথা তো কখনও শুনি নাই।

ঠাকুর আসায় একেবারে হেউ ঢেউ। যারা সংস্কারবান তারাই নিতে পারে তাঁর কথা। সব কি নিতে পারে? খালি শুনলেই কি হলো? এই দেয়াল তো শুনছে, ওটা কি বুঝতে পারছে?

শ্রীম ক্ষণকাল মৌন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী, আর একজন কে? হাঁ, ভাস্করানন্দ। কে একজন বড়লোক তাঁর কাছে অনেক কম্বল আর টাকা দিছলেন। বললেন, এই-গুলোর (সাধুদের) কি আছে? কিছুই নেই। এরা (ব্রাহ্মণরা) বরং তবুও চেষ্টা করছে। ভাল ভাল ব্রাহ্মণ দেখেই সব দিয়ে দিলেন।

বেশী কি, রাখাল মহারাজকেই বলেছিলেন, বাপু, বাড়িতে গিয়ে বেশ করে থাক। এইসব (সাধুদের ভিতর অনাচার) দেখে আর ভরসা হয় না। সন্তদাস বাবাজীও আমাকে এই কথা বলেছিলেন।

ভাস্করানন্দ আমাকে বলেছিলেন, এই বলছো অত কাজ কর। কিন্তু এইসব কথা ভাববার অবসর কি করে পাও? ঠাকুরের অনেকগুলি গান আমার মুখে শুনে একথা বলেছিলেন।

ইনিই স্বামীজীকে (বিবেকানন্দ) বলেছিলেন, বের করে দাও ছোকরাকে। ভাস্করানন্দ উপদেশ দিচ্ছিলেন, কামিনী ছাড়া চলে কিন্তু কাঞ্চন ছাড়া চলে না। স্বামীজী বললেন, আমি একজনকে দেখেছি, কাঞ্চন ছুঁলে হাত আড়ষ্ট হয়ে যায়, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকা বিজয়ের পর তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্বামীজী যেতে পারেন নাই। নিরঞ্জনানন্দ আর শুদ্ধানন্দকে পাঠিয়ে দিছলেন। এমনি সব কাণ্ড।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ১৭ই মাঘ, ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার। শুক্লা ষষ্ঠী ১৭।২০ পল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভিতরে সাম্য বাহিরে ভেদ

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন তিনটা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন দরজার পূর্বদিকে বেঞ্চে পশ্চিমাস্য। ভক্তগণ মাদুরে বসা। শনিবারের ভক্তগণ — ভাটপাড়ার ললিত রায়, 'ভবরাণী', ভোলানাথ মুখার্জী, এঁড়েদহের ভট্টাচার্য প্রভৃতি আসিয়াছেন। ইঁহারা প্রায় প্রতি শনিবার অফিসের পরে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে জগবন্ধু ও শান্তি বসিয়া আছেন। একটু পর গদাধর ও লক্ষ্মণ আসিয়া বসিলেন।

আর্য সমাজের আজ বার্ষিক উৎসব। সমাজ মন্দিরের সম্মুখেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। তাহাতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। শোভাযাত্রা কলেজ স্কোয়ারের দিকে যাইতেছে। পূর্ব ফুটপাথে বিদ্যাসাগর কলেজ আর পশ্চিম ফুটপাথে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

শোভাযাত্রীদের বক্ষস্থলে জামায় 'ওঁ' অক্ষরটি কাপড়ে কাটিয়া পিন দিয়া গ্রথিত। অন্তেবাসী উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় ঐ ব্যাজ একটি লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম অন্তেবাসীর বাসগৃহে ঐ ব্যাজটি দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে উৎসব সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে উহা গৃহ হইতে আনাইয়া যুক্ত করে ধারণ করিয়া অতি সম্ভ্রমে স্বীয় মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিলেন। এইবার এই ওঙ্কার মহিমা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ব্রাহ্মসমাজ আর এরা ভেবেছিল, আমরা সব বুঝে ফেলেছি। বলে, কিসে আর কিসে! ঋষিরা কত তপস্যা করে ওটি (ওঁ) পেতেন। আর এরা অত সহজেই পেয়ে ফেললো! কত যুগ যুগান্তর কেটে যেতো। তপস্যাই করছেন। তবে ওটি পেতেন ঋষিরা।

এ একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজে কেটে বা কাপড়ে কেটে

পিন দিয়ে বুকে এঁটে দিলাম। কিম্বা ফ্ল্যাগে লাগিয়ে দিলাম। অত সহজ যদি হতো ধর্ম তবে আর রক্ষে ছিল না। এটি যাঁর প্রতীক তাঁরই সঙ্গে ঠাকুর কথা কইতেন। 'মা মা' বলে সমাধিস্থ। ব্রহ্মশক্তির প্রতীক কিনা এটি! অত cheap (সস্তা) করতে নেই।

What a beautiful flower (কি সুন্দর পুষ্পটি), বলা যেমন। দেখতে তো beautiful (সুন্দর) খুবই। কথাতেই সব মেরে দিবে? কি আশ্চর্য! তবে আর তপস্যা কেন? রাজ্য ছেড়ে, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে ভিক্ষাজীবন কেন নেয় তা হলে? একটু কথা, একটু আবেগ, একটু ভাবের উচ্ছ্বাস — হা, হু করলেই যদি হয়ে যেতো, তা হলে কেন অত কষ্ট বরণ করা। যারা এর গুরুত্ব ভাবে তারা এসব হালকামো করতে পারে না। কত অসংখ্য জীবন ব্যতীত হয়ে যায় ত্যাগ তপস্যায়, তাঁর কাছে কান্নাকাটা করে করে তবে যদি ওটির (ওঙ্কারের) প্রতিপাদ্য বস্তুটির দর্শন হয়।

ব্রাহ্মণত্ব লাভ হলে তবে এর অধিকার। বিশ্বামিত্র কত তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। তবে এর যথার্থ অধিকারী হলেন। এই অলৌকিক ত্যাগ, এই পাষাণ-কঠোর তপস্যা, দিবানিশি ব্যাকুল হয়ে উন্মাদবৎ তাঁকে ডাকা — এগুলি কি সব তা হলে ফাঁকি?

সব লোক এর নাম করার অধিকারী নয়। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়; গায়ত্রী লয় হয় ওঙ্কারে। ওঙ্কার পরমব্রহ্মে লয় হয়! ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। এমনতর জিনিস এটি। অত উঁচু! এর পরই ব্রহ্মদর্শন।

এই প্রতীকটির সহায়ে ব্রহ্মদর্শন হলেই তখন ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলে তখন অন্য ভাব, যা সংস্কারলব্ধ, তা আর রইল না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিহিংসাবৃত্তি, বৈশ্যের ধনাগমচেষ্টা, শূদ্রের দাসত্বভাব আর থাকে না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, বৈশ্য সমাধি আর শূদ্র রুইদাস ব্রাহ্মণ হলেন। তখন হয়, 'অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ', তাই 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্', ইত্যাদি ব্রাহ্মণসুলভ গুণ এসে যায়।

তাড়কা বড় জ্বালাতন করছে ঋষিদের। ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র রামের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাম ক্ষত্রিয়, রাজা। অতবড় বীর ধনুর্ধর বিশ্বামিত্র

গিয়ে বালক রামকে নিয়ে এলেন। তাঁকে নাকি উনি ধনুর্বিদ্যা নিজে শিখালেন আর উপদেশ দিলেন, কোন অস্ত্রে সংহার করতে হবে তাড়কাকে। কিন্তু নিজে ধনু ধারণ করলেন না। কার্যটি করালেন রামকে দিয়ে। কেন করালেন? তবে সব ঋষিদের শান্তিতে তপস্যা চলবে বলে।

হিংসা করে, ঈর্ষা করে, প্রতিহিংসা-বৃত্তিতে নয়। বহুর কল্যাণের জন্য, বহুর শান্তির জন্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশের সহায়তার জন্য — অবতার হয়ে রাম, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়-শরীরে এইসব করেছেন।

চণ্ডীতে আছে, দেবী জগন্মাতা অসুরদের স্বয়ং বধ করলেন, জগতের কল্যাণের জন্য। দেবতারা তারপর স্তব করে বললেন, মা তোমার কি হিংসা ভাব আছে? না, তা নয়। বহুজনের কল্যাণের জন্য, আর ঐ অসুরদেরও কল্যাণের জন্য এই সংহার। দেবী নিজের হাতে বধ করলে সদ্যমুক্তি।

রাম ও কৃষ্ণের হাতে যাদের প্রাণ গেছে, তাদেরও সদ্যমুক্তি হয়ে গেছে। মানুষবুদ্ধিতে দেখলে অন্যকথা। আর ঈশ্বরবুদ্ধিতে, অবতারবুদ্ধিতে দেখলে এই ভাব। জগতের এবং বধ্যের উভয়ের কল্যাণের জন্য এই বধকার্য।

দৃষ্ট্বৈব কিন্নভবতী প্রকরোতি ভস্ম সর্বাসুরানরিষু
যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ ইত্থং মতির্ভবতি-
তেষ্বপিতেঽতিসাধ্বী॥

— চণ্ডী ৪।১৯

রাম যখন তাড়কাকে বধ করবেন, তখন বিশ্বামিত্র কাঁপতে লাগলেন অত বড় বীর হয়েও। কেন? না, এখন যে ব্রাহ্মণ। এইসব হিংসাকার্য জগতের কল্যাণকর হলেও এখন এই শরীর মন এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। বিশ্বামিত্র কাঁপছেন দেখে রাম কাছে গিয়ে বললেন, আপনি এই জঙ্গলে গিয়ে লুকোন (হাস্য)। এক মতে এই বলে।

তাতে আর আশ্চর্য কি? সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হলে এসব সহ্য হয় না। ঠাকুর হৃদয়ের জ্বালায় জ্বলে গিছলেন। বলতেন, আমার অত হাঁক ডাক সহ্য হয় না।

তা হবে না। মনে কর তখন বিশ্বামিত্রের মন সদা ঈশ্বরে নিমগ্ন। সর্বদা তাঁর চিন্তা — অন্য কিছু চিন্তা নাই। শরীর মন তখন তাই অত কোমল।

২

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, যেখানে মুড়ি মিছরীর একদর সেখানে থাকতে নেই। তা হলে শূলে যেতে হবে।

ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন। এক গুরুর এক শিষ্য ছিল। গুরু শিষ্য উভয়ে সাধু। গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন, যেখানে দেখবে একসের মুড়ির যা দাম, একসের মিছরীরও সেই দাম, সেখানে থাকবে না। যদি জোর করে থাক তবে শূলে যেতে হবে।

শিষ্য ভ্রমণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই একটা স্থানে এসে বসলো। সেখানে সব জিনিস সস্তা। একসের মুড়িরও যা দাম একসের মিছরীরও সেই দাম। ইচ্ছা, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে, আর ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া ক'রে শরীরটা সেরে নেয়। গুরুবাক্য ভুলে গেছে। আছে বেশ, খায় বেড়ায়। শরীর হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে।

ঐ দেশের রাজার দেবালয়ে নরবলি হয়। বধ্য নরপশুর সন্ধানে সব লোক বেরিয়ে পড়লো। শিষ্যকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে ধরে নিয়ে এলো — বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলির সর্বপ্রকারে উপযুক্ত মনে করে।

শিষ্য বসে কাঁদছে গুরুবাক্য স্মরণ হওয়ায়। গুরু তো ভগবান। তিনি ডাক শুনেছেন। তার নিজ গুরু পর্যটন করতে করতে সেইখানে উপস্থিত। বধ্যভূমিতে বহুলোক একত্র হয়েছে দেখে চুপি দিলেন। দেখতে পেলেন একটি নরপশু। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, তাঁর আপন শিষ্যই নরপশু। গুরুকে দেখে আরও কাঁদছে।

গুরু ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। শিষ্যর শরীরে একটা ঘা ছিল, তা তিনি জানতেন। তাই তিন রাজদরবারে গিয়ে বললেন, এ বলি অশাস্ত্রীয়। এই নরপশুর শরীর শুদ্ধ নয়। তখন ছেড়ে দেয়।

এমনতর কাণ্ড। মুড়ি মিছরীর একদর মানে গুরুলঘু ভেদহীন। সে হয় ব্রহ্মজ্ঞানে সমাধিস্থ অবস্থায়। নিচে নামলেই ভেদ। জগতের নামই ভেদ — diversity. এতে বড় ছোট ভাল মন্দ ভেদ আছে। মন্দ ছেড়ে ভাল নেওয়া, ঠাকুরের এই কথা।

বেদে আছে, জ্ঞানবৃদ্ধকে মানতে হয়। একজন মানুষ অবতার, আর একজন মানুষ ডাক্তার — দুই-ই সমান হয়ে গেল? তবে কেন ঋষিরা অত ভেদ দেখিয়েছেন? বয়োবৃদ্ধ, কুলবৃদ্ধ, বর্ণবৃদ্ধ, আশ্রমবৃদ্ধ, ধনবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ — কত কি। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ, অর্থাৎ যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন, তিনি হলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। বেদে বলেছেন অপর বৃদ্ধ সব জ্ঞানবৃদ্ধের 'কিঙ্করাঃ' — মানে, সেবক।

ব্যবহারভেদ থাকবেই। কেহ তা সরাতে পারে না। তবে ভেদের ভিতর অভেদ দৃষ্টি রাখা। 'অভেদ' এক ভগবান। সর্বজীবে উনি বিরাজমান। সে দৃষ্টি থাকলে দয়া করুণা পরোপকার শ্রদ্ধামিশ্রিত ব্যবহার হয়। এগুলি দৈবী সম্পদ। কর্কশতা, কঠোরতা, এইসব আসুরিক সম্পদ দৈবী সম্পদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কল্যাণকর হয়। যেমন মায়ের শাসন, মায়ের প্রহার। হৃদয়ে সন্তানের কল্যাণ-কামনা — বাইরে প্রহার, তিরস্কার।

Untouchability (অস্পৃশ্যতা) নিয়ে অত চেষ্টা হচ্ছে দূর করতে, কিন্তু হচ্ছে কৈ? কেন হচ্ছে না? কেবল বাইরের 'ছুঁয়ো না' ভাবটা দূর করলেই তো হলো না। অবশ্য প্রথমে এটার দরকার। কিন্তু যতক্ষণ না ভিতরে উচ্চ ভাবটি জাগ্রত হচ্ছে touchables আর untouchables উভয়ের ভিতর, ততক্ষণ বস্তুতঃ দূর হ'ল না। এক সঙ্গে খেলেই উহা দূর হ'ল না। ভিতরের ভেদ দূর না করলে কিছু হবে না। দয়া করে বা দেশপ্রীতিতে অভিভূত হয়ে একসঙ্গে বসে খেলেই কি হলো? এতেও superiority arrogance উচ্চাভিমান থাকে — আমরা উঁচু জাতি নীচুদের সঙ্গে বসে খাচ্ছি।

তবে কি বাইরের ভেদটা দূর করা ভাল না? তা মানা করা হচ্ছে না। তা কর। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ভেদের ভাবটাও দূর কর। এটার উপর জোর দেও। ভিতরে হৃদয়ে যদি ঈশ্বরবুদ্ধি জাগ্রত করা যায় বড় ও ছোট উভয়ের ভিতর, তবেই হবে ঠিক ঠিক কাজ।

ঠাকুর তাই বলেছিলেন, ভক্তিতে উহা দূর হতে পারে, যদি ভাবা যায় সকলের হৃদয়ে ভগবান নিবাস করেন। অতএব সব জীব, সব মানুষ তাঁর পবিত্র মন্দির। তবে ভিতর থেকে ভেদভাব দূর হতে পারে। ভাগবতে আছে, যাঁর এ দৃষ্টি লাভ হয় তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, সকলের সুহৃদ।

নিচে যে আছে তাকে উপরে উঠাও। উপরে যে আছে তাকে নিচে নামিও না। এটি বেদের শিক্ষা। ঠাকুরের শিক্ষা। এটা করতে রাজী নয় লোক। নিজের ভিতরটা দেখবে না। গায়ের জোরে করতে যায়, তাতেই তো কাজ হয় না। নিজে ভক্ত হও আগে, তখন অপর সকলকেই দেখতে পাবে উত্তম, মহৎ। দয়া করুণা মৈত্রী শ্রদ্ধা, এসব আপনিই এসে পড়ে।

আজকালের ফ্যাশান — রাজনীতির রং দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা। তা হয় না। ভোটে সব হয় না। ভোট তো গায়ের জোর। নিজে মহৎ হলে তখন অপরকেও ঐ দৃষ্টিতে দেখা যায়। যারা ভেদ ওঠাতে চাইছে তাদের ভিতর যে ভেদ বসে আছে। এই পলিটিসিয়ানরা কি সকলে সমদৃষ্টি? লম্বা লম্বা কথা কইলে তো হলো না।

দেখ না, রাশিয়া — কোথায় সমদৃষ্টি? ব্যবহারে কত বৈষম্য। কয়দিনের ভিতর কত নেমেছে। একটা এরিস্টক্রেসি গিয়ে আর একটা এরিস্টক্রেসি এসেছে। তা না এসে পারে যতক্ষণ জগৎ আছে? হাঁ, যদি জগৎ ভুলে যেতে পার তবে বড় ছোটর দরকার নাই।

যতক্ষণ জগৎ ততক্ষণ বড় ছোট ভেদ। ঈশ্বরবুদ্ধি দিয়ে মানুষকে দেখতে পারলে ব্যবহারে, স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা এসে যায়। তা হলেই সমাজ উঁচুতে উঠতে পারে। আর এই সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ভারত এইটে ব্যবহারে আনতে চেষ্টা করেছে যুগযুগান্তর থেকে।

যদি সকলে সকলকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বলে জানতে পারে তবে তো পৃথিবী বৈকুণ্ঠ হয়ে যাবে। Theoretically (বিচার দৃষ্টিতে) হতে পারে এটা, কিন্তু practically (ব্যবহারে) হয় না।

ভেদের সঙ্গে অভেদ দৃষ্টি রেখে যে সমাজ গড়ে ওঠে তারই নাম, ভারতের ভাষায় — রামরাজ্য, স্বর্গ, সত্যযুগ।

এক রব তুলেছে — all men are equal (মানুষ সব সমান) কেমন করে তা হয়? ফ্রান্স রিভলিউশানের war-cry (সংগ্রাম ধ্বনি) ছিল এই সব কথা — equality, fraternity and liberty (সমতা ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা)। এর দেখাদেখি বললেই হয় না। রাশিয়ার সাম্যবাদেও ঘুণ ধরেছে। ভারতের সংস্কারবাদী নবীন দল ঐ ধার-করা কথা কপচাচ্ছে।

দেখাদেখি বড় একটা কিছু কাজ হয় না। নিজের ভিতর আগে

সমভাব প্রতিষ্ঠা কর। তখন মুখে কিছু বলতে হবে না। কাজেই বলবে। শতগুণ বেশী কাজ হবে।

খালি মুখে বলে আর আইন করে কাজ হয় না। একেই বলে গায়ের জোরে করা। যদি law-ই rule (আইনই শাসন) করতে পারতো তবে রক্ষা ছিল না। ঈশ্বর, অবতার, ঋষি, সাধু — এ সবের দরকার হতো না।

Law (আইন) কেবল বাইরেরটা সংযত করতে পারে। ভিতর সংযত করতে হলে — ভিতরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে — ঈশ্বরের দরকার। তাই ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন এক একবার।

এগুলিকে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না। একেই বলেছেন ঠাকুর, মুড়ি মিছরীর একদর। তার ফল কুফল হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা প্রসঙ্গ।

ঠাকুর রসিক মেথরের বাড়ির নর্দমা চুল দিয়ে মুছেছিলেন। কেন? না, ব্রাহ্মণ-অভিমান দূর করতে। আবার ছোকরা নরেন্দ্রকে দেখে ছুটে চললেন এগিয়ে আনতে, কেশব সেনকে বসিয়ে রেখে। এতে নরেন্দ্র পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুরকে অনুযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি পাগল হয়েছ আমায় নিয়ে। কোথায় জগৎ-বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় আমি! একথা শুনে কেঁদে দিছলেন ঠাকুর। বলেছিলেন, ওরে, আমি কি বলছি একথা? মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন আমার নরেনের আঠারটা গুণ। কেশবের মাত্র একটা। দেখ, এখানে আবার ভেদদৃষ্টি।

কেদার চাটুয্যে চলে যাচ্ছেন। অধর সেনের বাড়ি খাবেন না। জাত যাবে। ঠাকুর ডেকে নিয়ে গেলেন। আর পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। এখানে ভেদের ভিতর অভেদ দৃষ্টি। ভক্ত ভাগবত ভগবান এক। ভক্তিতে সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি ভগবানের স্বরূপ।

পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির এই 'Equality' (সাম্য) কিসে? Spiritual matter-এ (আধ্যাত্মিক বিষয়ে) নয়। টাকাকড়ি, মানসম্মান-আদি জাগতিক বিষয়ে, দেহের সুখে। আধ্যাত্মিক সমদৃষ্টি ওদের ছিল না। গান্ধী মহারাজ ভারতীয় রাজনীতিতে এই প্রাচীন আধ্যাত্মিক সাম্যদৃষ্টির পুনরায় প্রবর্তন করেছেন।

শ্রীম অতক্ষণ ধরিয়া কাপড়ে-কাটা ওঙ্কারটি সসম্ভ্রমে হাতে রাখিয়াছিলেন। এবার ফেরৎ দিলেন অন্তেবাসীর হাতে। বলিলেন, এ ধূপধুনো দিয়ে পুজো করতে হয়।

৩

অপরাহ্ন তিনটা। ভাটপাড়ার ললিত রায় একজন সঙ্গীসহ আসিয়াছেন। তারপর আসিলেন বড় জিতেন। তাঁহারা ছাদে অন্তেবাসীর কাছে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। এক ঘন্টা পর শ্রীম ছাদে আসিয়া বেড়াইতেছেন। গভীর ধ্যান করিলে ছাদে আসিয়া এইরূপ বেড়ান। ভক্তরা উঠিয়া গিয়া শ্রীমকে যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। ললিতের সঙ্গীর হাতে এক চ্যাঙ্গারী সন্দেশ। শ্রীম-র সামনে উহা ধরিলে তিনি অন্তেবাসীকে হাত ধুইয়া উহা নিতে বলিলেন। ছাদের উত্তর ধারে 'তপোবনে' দাঁড়াইয়াই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অর্ধ স্বগত) — গুরুর কথা শুনলুম না। অথচ গুরুকে খুব ভক্তি করি। এ আবার কেমন কথা? যাকে ভক্তি করবো তার কথা শুনবো।

বড় জিতেন — প্রকৃতি, প্রকৃতি —।

শ্রীম (কথা শেষ না হইতেই) — না। মনে করে (আমার) বেশী বুদ্ধি — বেশী বুদ্ধি (হাস্য)।

ওদের সামনে দুর্বলতা দেখাতে আছে?

বড় জিতেন — পাঁচ জনের সঙ্গে থাকতে গেলে চুড়ি বাজবেই।

শ্রীম — আগেই মনে করতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেমন করে তা হলে মিলবে? আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে আর রাগ হবে না কেউ কথা না শুনলে। কর্তাদের কত restrain (সংযম) exercise (প্রয়োগ) করতে হয়। আবার tact (কৌশল)।

শ্রীম আসিয়া চেয়ারে বসিলেন ছাদেই দরজার সামনে উত্তরাস্য। ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চে বসা। শ্রীম-র আদেশে ললিত বাল্মীকি-কৃত সমগ্র গঙ্গার স্তবটি আবৃত্তি করিতেছেন।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নী বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলী।

... ...

মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥

শ্রীম — বিশ্বাস করলে এই ফল — মোক্ষ। আর জন্ম-মরণ হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য, অত সোজা পথ থাকতেও কেউ যায় না ওদিকে! হয়তো মনে করে, অমনি বলছে বাড়িয়ে। তা কেমন করে হয়? ঠাকুর যে সব দর্শন করেছেন! সব সত্য। গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি বলতেন। তিনি নিত্য পান করতেন। স্বামীজী, রাখালমহারাজ এঁরা সকলেই মানতেন, পুজো করতেন।

মানুষ যে স্নান করে, পূজা করে গঙ্গার, সকলে কি তখন ভেবে করে — গঙ্গার স্বরূপ? তা নয়। দশ জনে করে তাই দেখাদেখি করে। একটা social influence (সামাজিক প্রভাব)। ঋষিরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন, অমনি করবে না। অথচ সমাজকে মোক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঋষিরা কল্যাণকামী জগতের, সকল জীবের। তাই নিয়ম করে দিলেন গঙ্গাস্নানে পুণ্য হয়। যারা দূরে থাকে তাদেরও বিশেষ বিশেষ দিনে স্নান করার বিধি করে দিলেন। করতে করতে যদি ভিতর খোলে, চৈতন্য হয়। যদি এ সব বিধি না করতেন তা হলে আরও খারাপ হতো সমাজের অবস্থা। ঋষিরা কাউকে ছাড়েন না। তাঁদের ভাবনা সকলের জন্য যেমন মা-বাপের ভাবনা সকল সন্তানের জন্য। বদ্ধ জীব থেকে মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, সকলের জন্য ভাবনা ঋষিদের।

কখনও মনে হতে পারে, কেন করা? ভাল কাজ বলে বোধ আছে কতক। নইলে করতো না। প্রথম শুনে করে, পরে ভাল কাজ বোধে করে। শোক-তাপের সময়, দুঃখ-কষ্টের সময় এই ভাবটি এই অল্প বোধই বৃহৎ রূপ ধারণ করতে পারে — possibility (সম্ভাবনা) রয়েছে।

তাছাড়াও এইসব পবিত্র স্থানে, দেবালয়, তীর্থাদিতে যেতে যেতে দশজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাদের মধ্যে কত ভাল লোক আছে, ভক্ত লোক। শোকতাপের সময় এই সব ভাললোক সহায় হন। তাঁরা প্রবোধ দেন, সান্ত্বনা দেন। এটা কি কম লাভ? কত সব মহৎ লোক থাকেন ও সব পবিত্র নিত্যতীর্থে।

দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তিলাভের পথ বলে দিয়েছেন ঋষিগণ। তবুও হয় না চৈতন্য। এটি ঈশ্বরের অবিদ্যা মায়ার কাজ। দু'এক জনকে মুক্তির পথে নিয়ে যান — তাদের ভিতরটা খুলে দেন, চৈতন্য দেন। বদ্ধ ও মুক্ত — এ দু'টোই ঈশ্বরের বিধানে আছে। সব মুক্ত হলে তাঁর জগৎলীলা

অচল। সব বদ্ধ থাকলেও তাঁর মোক্ষলীলা অচল। সৃষ্টিতে এ দুটোই চাই। অবশ্য সব লোক মুক্ত হবে একদিন, সব জীব মুক্ত হবে। অনন্ত প্রবাহ এই বদ্ধ-মুক্ত ধারা।

দরজা বন্ধ আছে। একটু ফাঁক করে দিল। তাতে ভিতরের বস্তু দর্শন হয়। তখন কাজ হয়ে গেল। তাঁর কাছে কাঁদলে সহজে এই দরজা ফাঁক হতে পারে, এইটে এই যুগের সহজ পথ, ঠাকুর বলে গেছেন।

একজন ভক্তকে বলেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় দর্শনে, সব ঠিক আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি খালি একমনে তাঁকে ডাক।

৪

সিঁড়ির ঘর। এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম নিজের কক্ষে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এইবার আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন — দোরগোড়ায় চেয়ারে দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে নিচে যাইবার সিঁড়ি। নিত্যকার ভক্তগণ বেঞ্চে বসিয়া আছেন, শ্রীম-র সম্মুখে ও বাম পাশে। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখ না, কি করে আমাদের শরীরটা চালাচ্ছেন। কলটি আপনিই চলছে। একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে motion (চালিত) করে দিলেন। এবার চলতে থাক্। আবার motion-টা (চলার শক্তি) বন্ধ হয়ে গেল। আর চলছে না। এটা মৃত্যু।

কি আশ্চর্য! এই শরীরের ভিতর কি করে মন ঢুকলো? আবার consciousness (চৈতন্য) আছে। কি করে হচ্ছে এসব, কেউ explain (ব্যাখ্যা) করতে পারে না। ঋষিরা বলেছেন, তাঁর ইচ্ছায়। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি এই motion (গতি) সৃষ্টি করেছে।

বুদ্ধিরূপে তিনিই আমাদের চালাচ্ছেন, হৃদয়ে থেকে। যে এটা বুঝতে পারে তাকে আর জন্ম নিতে হয় না। রামপ্রসাদের গান গেয়ে ঠাকুর এটা বুঝিয়ে দিছলেন। 'যে কলে জেনেছে তাঁরে কল হতে হবে না তারে। কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছেন।'

অত বড় একটা আশ্চর্য বস্তু সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু নজর নেই এদিকে। যতক্ষণ শ্বাস এমন এমন করছে (নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দেখিয়ে), ততক্ষণ সব আছে। শ্বাসও বন্ধ হলো, সব গেলো। কোথায় তখন স্ত্রীপুত্র ধন জন মান সম্মান? সব শেষ। তখন আর কোনও বিষয়ের খবর নেই।

ডাক্তার বক্সী — বিষয়বাসনা ত্যাগ যাদের হয়ে গেছে তাদের বেশ হয়েছে।

শ্রীম (রহস্য করে) — ডাঁড়ান (দাঁড়ান), বুঝি আগে কি বলছেন। (প্রবল সংযত নয়নহাস্যে স্বগত) বি-ষ-য় বা-স-না ত্যাগ। হাঁ — তবে বিষয়ত্যাগ হয়?

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ 'আমি'। 'আমি' থাকলেই সব আছে। (দুষ্ট হাস্যে) আপনার কথাটা তা হলে contradictory (পরস্পর বিরুদ্ধ)।

ডাক্তার বক্সী — আমি এইভাবে বলি নাই। আমি বলেছি, এই যাদের কাজটাজ কমে গেছে।

শ্রীম — একে বিষয়ত্যাগ বলে না। বিষয়ত্যাগ মানে, রূপ-রসাদি ত্যাগ। সমাধিস্থ হলে, ব্রহ্মলীন হলে কেবল এটি হয়। নিচে ব্যুত্থিত হলেই বিষয়ের এলাকা। সংসারের নামই বিষয়। এর আর এক নাম রূপ, জগৎ। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস আছে ততক্ষণই জগতের এলাকা।

ডাক্তার বক্সী বিবাহিত যুবক। অতি ব্যাকুল ভক্ত। মন ঈশ্বরে মগ্ন করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা আর ব্যাকুল প্রার্থনা করেন। কাম-ক্রোধাদির সহিত তাঁহার সংগ্রাম চলিতেছে। সেই জ্বালায় অস্থির। তাই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীম ডাক্তারের অন্তরের সব কথা জানেন। তাই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ ঠাকুরের ব্যবস্থা ডাক্তারকে বলিলেন, সান্ত্বনারূপে।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি, কিন্তু লক্ষ্য একজন বিবাহিত ভক্ত) — ঠাকুর বলতেন, 'স্বদারায়' গমন বরং ভাল। তা না হলে, জোর করে সাধু হলো। তারপর আর একটা মেয়েমানুষের পোঁদে পোঁদে দৌড়াচ্ছে।

অর্জুনকে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ — যদি আমার কথা না শোন তবে বিনাশপ্রাপ্ত হবে — 'বিনঙ্ক্ষসি' (গীতা ১৮:৫৮)।

শ্রীম (নয়ন হাস্যে) — অমুকের বড় বৈরাগ্য। পরিবারের সঙ্গে কথা কয় না। কেন? না, আর একটি নূতন পাবে বলে।

এ আছে এক রকম ত্যাগ। বেশী ভোগের জন্য ত্যাগ। যোগীর ত্যাগ ভিন্ন। আপনিই আলগা হয়ে যায়, খসে পড়ে যায়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ।
১৮ই মাঘ ১৩৩১ সাল।
শনিবার, শুক্লা সপ্তমী। ১৮ দণ্ড। ৩ পল।

তৃতীয় অধ্যায়

পূজারী কি ভগবান — এই ধাঁধা

১

মর্টন স্কুল। বেলা এগারটা। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে গদাধর। একটি যুবক শিক্ষক আসিয়া আজের দিনের জন্য ছুটির আবেদন করিলেন। শিক্ষক ভক্ত।

বেলুড় মঠে আজ ধর্মসম্মিলনী। তাই শিক্ষক সেখান যাইবেন। শ্রীম ভক্তদের বেলুড় মঠে পাঠাইতে কত না চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্ত শিক্ষককে অনুমতি দিলেন না। বলিলেন, আজ স্কুল বন্ধ বটে, কিন্তু একটু কাজ আছে — ওটা সেরে যান।

আজ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ। ১৯শে মাঘ, ১৩৩১ সাল। রবিবার, শুক্লা অষ্টমী, ২০ দণ্ড। ৩ পল।

শ্রীম কেবল ধর্মোপদেশ দেন না। কর্তব্যের পালন-উপদেশও দেন, বরং অগ্রে। যাহার যাহা কর্তব্য তাহা পালন করিতে বলেন আগে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম করা। হাতের কাজে অবহেলা করিয়া ধর্ম করা — এই ধর্ম বিচারসাপেক্ষ। ইহা ধর্ম নয় — তমোগুণের ঐশ্বর্য। শ্রীম কত যুবককে একেবারে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ত্যাগব্রত গ্রহণে সত্যকার সহায়তা করিয়াছেন। বেলুড় মঠে পাঠাইয়াছেন। তিন পুরুষ ধরিয়া এই কাজ করিয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ কেহ কোন কর্ম নিয়া থাকে ততক্ষণ তাহাকে কর্মে মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। শ্রীম ইহা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্ত শিক্ষকের প্রতি) — কিন্তু এখানে সব responsibility (দায়িত্ব) আপনাদের নিতে হবে। কের্‌মে (ক্রমে) হেড মাস্টারের কর্ম নিতে হবে।

কি করা যায়, আমরা যখন কর্মে রয়েছি তখন কর্ম করতেই হবে। কর্ম ছাড়তে পারছি কৈ? এতে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ এর interest

(স্বার্থ) দেখতে হয়।

শিক্ষক — কিন্তু ছেলেগুলি যে কথা শুনে না। শরৎ রায় সরস্বতীর ভাসানের দিনে সিগারেট খেল।

শ্রীম — এসব বিষয়ে charitable view (উদার দৃষ্টি) নিতে হয়। এই সেদিন এতো হৈ চৈ করলে ছেলেরা, কিছুই বলা হ'ল না। কেন? না, একটা মহৎ কাজ করেছে — সরস্বতী পূজা, আবার পরের দিন কাঁধে করে প্রতিমা বয়ে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে।

শিক্ষক — সে কি এরা? Ex-students (ভূতপূর্ব ছাত্ররা) সব করেছে।

শ্রীম — তাদের দেখেই এরা শিখবে।

শিক্ষক দেড়টার পূর্বে মঠে গেলেন। অনেক সাধু একত্রিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছেন। একটা হইতে চারিটা পর্যন্ত সাধুগণ ধর্ম, সমাজ, নিজের ও পরের কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষক পাঁচটায় ফেরৎ আসিলেন। মর্টন স্কুলে আজ বায়স্কোপ। তাহার ব্যবস্থা করিতে শীঘ্র ফিরিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চিত্র দর্শন করিলেন ছাত্র, শিক্ষক ও ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীম।

রাত্রি দশটা। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ — ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, গদাধর প্রভৃতি বসা পাশে ও সম্মুখে বেঞ্চে। কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ যা হলো এসব historical and scientific films (ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্র) ভাল। এর educative value (প্রশিক্ষণ মূল্য) আছে। ওয়েস্টের শিক্ষা বার আনা দেয় এসব উপায়ে। এখানে সব rubbish pictures (কদর্য চিত্র) আনে। কেউ নেই check (পরীক্ষা) করবার। পরাধীন দেশ!

ডাক্তার বক্সী — খারাপ পিক্‌চারে বড়ই খারাপ হচ্ছে। তরুণদের মনে ছাপ পড়ে।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ। তবে একটু অম্লরস না খেলে হজম হয় না কারু কারু। তাই তাদের ওসবের দরকার। মাত্রা বেড়ে না যায়, এটা দেখা।

ছেলেমেয়েদের কেবল historical, scientific, biographical and religious (ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবন-চরিত্র ও ধর্ম-সম্বন্ধীয়) চিত্র দেখান উচিত। আর বিশেষ বিশেষ সামাজিক চিত্র। Moral tone (নৈতিক সুরটি) খুব high (উচ্চ) রাখা উচিত। এই ছেলেমেয়েরাই দু'দিন পরে সমাজপতি হবে কিনা। মনে কতকগুলি সৎ ছাপ আর শুভ চিন্তা ফেলে দেওয়া। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে ঐগুলি গুরুর কাজ করবে।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। মাঘের শেষ। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। সম্মুখে ও পাশে বেঞ্চে ভক্তরা কেহ বসা। এখন সাড়ে চারটা। 'বসুমতী'র সত্ত্বাধিকারী সতীশ মুখার্জী আসিয়াছেন। 'কথামৃতে'র ডায়েরীর সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

সতীশ (শ্রীম-র প্রতি) — অমূল্য জিনিস এই ডায়েরী। কত accurate (যথার্থ) লেখা, time place personality (স্থান কাল পাত্র) সব আছে। শুনলে মনে হয় যেন চোখের সামনে দেখছি।

শ্রীম — হাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, চৈতন্যদেবের সময়ের একটি লোক পেলে আমরা দৌড়ে যাব না কি দেখতে? তেমনি ঠাকুরের কথা। তা শুনতে তো লোক আসবেই, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘর করেছেন, তাঁদের কাছে।

আমরা তাঁর contemporary (সমসাময়িক)। তাই লোক আসে তাঁর সম্বন্ধে evidence (সাক্ষ্য) নিতে, examine (পরীক্ষা) করতে। ছেলে খেলা!

অবতার যখন আসেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় পরখ করতে। বিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র নেয়। বাকী লোক পরখ করে। তা'তে টিঁকলে তখন নেয়।

তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাঁকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে, তাদের জীবনও দেখে। তাদের কথা শুনে যদি বুঝে ঠিক, তবে নেয়।

আমাদের কাছে যে লোক ছুটে আসে এতে আমাদের বাহাদুরী নেই।

তাঁর সম্পর্কে বলে আমাদের দাম। নইলে কিছু নয়।

Contemporary (সমসাময়িক) লোক ভাব অনেকটা ঠিক রাখতে পারে। তারপর মিকশ্চার হয়ে যায়। Mother tincture (মূল নির্যাসটি) আর পাওয়া যায় না তখন। First-hand evidence (চোখে-দেখা কানে-শোনা সাক্ষ্য) চলে যায়। তারপরে first-hand evidence and second-hand evidence diluted (অধিক তরল) হয়ে যায়। আসল জিনিস আর তখন পাওয়া যায় না।

'কথামৃত' পুস্তকাকারে ছাপার পূর্বে স্বামীজী দেখেছিলেন। তাই বলেছিলেন, ...Never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind, as you are doing... (আপনার 'কথামৃতে'র ন্যায়, লেখকের মনোভাব-বির্নিমুক্ত অকলঙ্কিত নির্মল কোন মহামানবের জীবনালেখ্য ইতিপূর্বে জগতে জনসাধারণের সম্মুখে আর কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই)।

আজ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ২১শে মাঘ ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার, শুক্লাদশমী ২৭।২৯ পল।

এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম ছাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে সিঁড়ি। ভৃত্য আসিয়া সিঁড়ির উপর হ্যারিকেন লণ্ঠন রাখিয়া গেল। আলো দেখিয়াই শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। আর হাততালি দিয়া, 'হরিবোল হরিবোল' এই ঈশবন্দনা করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। নিত্যকার ভক্তগণ — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীম-র পাশে বসা। শ্রীম-র সঙ্গে তাঁহারাও ধ্যান করিতে লাগিলেন। হৃদয়স্পর্শী এক নির্মল প্রশান্ত নির্জনতা বিরাজ করিতেছে। এক ঘণ্টা ধ্যানের পর শ্রীম এখন কথা কহিতেছেন।

সম্প্রতি শুকলালের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। আগামী কাল তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ। শ্রীম একটি যুবক ভক্তের সহিত কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — কাল শ্রাদ্ধ। একবার আপনাদের যাওয়া উচিত। ভক্ত বন্ধুদের সাহায্য করতে হয়। তা ছাড়া ভক্তদের দেখলে

ঠাকুরকে মনে পড়বে। তখন শোকও কম হবে। তাই যাওয়া উচিত।

যুবক — গেলেই তো খেতে হবে। ঠাকুর মানা করেছেন যে শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে।

শ্রীম — ঠাকুর একথাও বলেছেন, সাধু ভক্তের সেবা করতে হয়। আরও বলতেন, গুরুজনদের সেবা করতে হয়। আর যাদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যায়, সেবা পাওয়া যায়, তাদেরও সেবা করা উচিত। তাই বলরামবাবুর বাড়িতে কিছু হলে, বিয়ে বা শ্রাদ্ধ, বেলুড় মঠের সাধু এসে help (সাহায্য) করে। করবে না? কত সেবা পেয়েছে!

কি করা যায়। সাধু তো সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ভক্তদের, ফ্রেণ্ডদের এ সব কাজেও help (সাহায্য) করতে হয়, সেবা করতে হয়।

এ তো অন্য কিছুর জন্য যাওয়া নয়। শুকলালবাবুর সেবা করতে যাওয়া। শুকলালবাবু ঠাকুরের ভক্ত। আর ইনি ভক্তদের কত সেবা করেন। আমরা মিহিজামে ছিলুম, সে সময় কত সেবা করেছেন। রোজ পার্শেল পাঠিয়েছেন ভক্তদের জন্য।

অতো কাজের ভিতরও যে মনটি পড়ে আছে ওখানে (মিহিজামে), এ কি চারটিখানি কথা! আবার নিজে নড়তে পারেন না, বহু কাজ আর স্থূলকায়। তাই অর্থ ব্যয় করে বন্ধুদের পাঠান সব স্থানে, তীর্থে, সাধুদের কাছে। বেশ খেলোয়াড়।

কাশীতে একজন সাধু থাকেন। তাঁকে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা দেন। আর ভক্তদের সেবা, সাহায্য তো লেগেই আছে।

তাই সেবা করা উচিত ওঁর। সেবা করতে যাওয়া আর খাওয়া — দু'টো কথা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — না খেলেই হলো। এক বেলা এক দিন এক পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে থাকা যায়। কাজের মাঝে ফস্ করে গিয়ে কিছু কিনে খেয়ে আসা।

ঠাকুর তাই বলতেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? লোকে বলে, যে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলে। ভক্তদের পিঠেও দু'টো চোখ থাকবে। এ সবই ঠাকুরের মহাবাক্য।

একা পঁচিশ জন লোকের কাজ করবে। আমরা করলুম কি তাঁর জন্য? সাধুদের কতদিন অনাহারে কেটে যায়, খাওয়া মিলছে না। কি করবে? তবুও তাঁর নাম করবে? তাই তো তিনি তাঁদের কাছে বাঁধা।

ঈশ্বরের জন্য কিছু করলে নিজের মনের খেদ মিটে। শেষে মন বলে কিনা, তাঁর জন্য কিছুই করলাম না। তাই আগে কিছু করতে হয় তাঁর নামে।

এসব কাজও তপস্যা — নিষ্কাম কর্ম। যে কোন কাজ করা, নিজে benefit (সুবিধা) না নেওয়া।

সাধুরা যে তপস্যা করেন তাও নিষ্কামভাবে করেন। সকাম করলেই উল্টো ফল ফলে। হয়তো আরও কত জন্ম ভোগ বেড়ে যায়। তাই ভাল মন্দ সব কাজ তাঁতে ফল সমর্পণ ক'রে করা।

গৃহস্থরাও পরিবার প্রতিপালন যদি ঈশ্বরবুদ্ধিতে করে তা হলে এতেও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। তাতেই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বরবুদ্ধি মানে, ঈশ্বর এই পরিজনরূপে আমার সেবা নিচ্ছেন, এই ভাব। এতে স্নেহ শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। Altruistic work-ও (পরের জন্য কার্য) নিষ্কামভাবে করতে হয়। আমাদের মিশনের কাজ সব ঈশ্বরবুদ্ধিতে করা হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — দুই বন্ধু ও ভাল্লুকের গল্প জানেন না? দুই বন্ধু বনে বেড়াতে বের হলো। অমনি একটা ভাল্লুক এসে সামনে পড়লো। একজন দৌড়ে পালাল। আর একজন চলতে অসমর্থ। তাই মরার মত শ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। সে জানতো, ভাল্লুক মরা মানুষ ধরে না। ভাল্লুক ঐ ব্যক্তির নাক মুখ শুঁকে চলে গেল, মৃত মনে করে। তখন বন্ধু এসে জিজ্ঞাসা করলে, ভাল্লুক তোমার নাক মুখ কান শুঁকে শুঁকে কি বলল? সে উত্তর করলো, ভাল্লুক আমায় এই বলে গেল, যে-বন্ধু বিপদের সময় পালিয়ে যায় তার মুখ দর্শন করতে নেই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেউ কেউ একটু স্বার্থপর। তা কি করবে? যেমন দেশে জন্মেছে, যে পরিবারে বড় হয়েছে তার দাগ থেকে যায়। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায়। গ-র কাছে দক্ষিণেশ্বরে কে একজন কম্বল চাইলে। ওর দু'খানা আছে। আর অন্য জনের একখানাও

নেই। বললে, আমার দু'খানাতেই হয় না। তোমায় কি করে দেব? তাই একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায় সব। কি করবে, যেমন প্রকৃতি। তবে সাধুসঙ্গে বদলে যায়। এ কি আর চিরকাল থাকবে? সাধুসঙ্গে কেরমে (ক্রমে) বদলে যায়।

সভা ভঙ্গ হয় নয়টায়। অন্তেবাসী ছাদে গিয়া বেঞ্চে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দশটায় বড় জিতেন তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার বাড়ি লইয়া গেলেন। ঘি ভাত আহারের নিমন্ত্রণ। সঙ্গে গেলেন ছোট জিতেন, বিনয় ও ছোট অমূল্য।

৩

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসা, চেয়ারে দক্ষিণাস্য। ভক্তরা কেহ কেহ শ্রীম-র কছে উপবিষ্ট। অন্তেবাসী পাশের টিনের ঘরে আছেন। একটি ভক্ত আসিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব। কাহাকেও দেখিলে বলেন, 'জয় নিতাই'। এইটি তাঁহার অভিবাদন ধ্বনি। ভক্তরা তাই তাঁহার নাম রাখিয়াছেন 'জয় নিতাই'। অন্তেবাসী বৈষ্ণব ভক্তকে শ্রীম-র কাছে লইয়া গেলেন। এইবার কথাবার্তা হইতেছে।

জয় নিতাই (শ্রীম-র প্রতি) — নিতাইগৌর না ভজলে কিছু হবে না। আবার নিতাইকে না ভজলে গৌর মিলে না। তাই নিতাইগৌর ভজনা করুন। (গানের নাকি সুরে) 'নিতাই ভজলে গৌর পাবে।'

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, গৌর-গৌরী এক করতে পারলে তবেই খাঁটি। তিনি যা বলতেন, তাই শুনবো। আপনার কথা কি করে নেবো? হৃদয়ে সেই সব ছাপ মেরে রয়েছে। তা কি ভোলা যায়?

তাই ঠাকুর বলতেন, আমি তো কাউকে বলি না, আমার কথা নেও, আমার ভাব নেও। আমার ভাব আমার কাছে। তোমরা ইচ্ছা হয় নেও, না হয় না নেও।

বললেই কি লোকে নেয়? ভালবাসা না পেলে কেউ কারো কথা নেয় না।

ভক্তরা যে ঠাকুরের কথা নিয়েছে, তা কি কৃপা করে নিয়েছে? তা নয়। ভালবাসায় তাদের কিনে ফেলেছেন ঠাকুর। তারপর যা দুর্লভ বস্তু ভগবান, তাঁর দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। এও দর্শন করিয়ে দিয়েছেন,

তিনিই ভগবান। ভক্তরা ধাঁধায় পড়ে যেতো। এ কি হেঁয়ালী, এই তো পূজারী বামুন। আর এ কি দেখছি? সচ্চিদানন্দ, জগদম্বা — এই ভেবে।

ভক্তরা তো তাঁকে জানতো না। সকলেই সংসার-জ্বালায় জ্বলে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতো।

ছোকরারা যে গেছে তাদেরও সংসার আলুনী লেগেছে। তাই যেতো। সকলেই তাঁর ভালবাসায় কেনা হয়ে আছে, তবে তাঁকে গ্রহণ করেছে। পেয়েছে কত — সবই পেয়েছে।

কারো কথা কেউ নেয় না, যদি সঙ্গে হৃদয়টি খোলা না থাকে।

তাই মনে করুন, আপনার কথা কি করে নি এই বৃদ্ধ বয়সে?

তিনি যে বলেছেন, গৌর-গৌরী যখন এক বোধ হবে তখন ঠিক হলো।

তিনি তো একঘেয়ে ছিলেন না। তিনি সব পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। শেষে গিয়ে একই স্থানে পৌঁছেছিলেন। তাই বলতেন, মত পথ। মত কিছু ঈশ্বর নয়। তাঁ'তে যাবার পথ মাত্র। যার যা ভাল লাগে সেটি নেও।

এ সময়ে পুরানো মাল চলবেনা। ভিক্টোরিয়ার টাকা অচল। সারা জগৎ বিজ্ঞানের প্রভাবে এক হয়ে গেছে। তাই সমন্বয়। উদার ভাব চাই। সেইটি ঠাকুর আবিষ্কার করে জগতের কল্যাণের জন্য রেখে গেছেন। ঐ পথে বিশ্বের শান্তি হবে।

একজন ভক্ত (স্বগত) — 'জয় নিতাই'র চোখে তন্দ্রা। তমোগুণে এটি হয়। শ্রীম-র এই উদ্দীপনাময়ী বাণী ওর কর্ণে প্রবেশ করেছে কি? বেচারী চুপ করে বসে আছে। ধর্মের সহজ সংস্করণটি সে নিয়েছে। মুখে বলছে নিতাই, অন্তর পূর্ণ বিষয়ে। এটিই ধর্মের পতন। সত্যিকার ধর্মে, হৃদয় পূর্ণ ঈশ্বরে, বাইরে যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্ত বিষয় ভোগ। শ্রীচৈতন্য রাজপুত্র রঘুনাথকে এই উপদেশ দিয়েছেন — অন্তরে রাধাকৃষ্ণ, আর বাইরে 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া'।

শ্রীম-র কথায় অন্তেবাসী 'জয় নিতাই'কে আট আনা দিলেন। এই করিয়া হাল্‌কা নামপ্রচারের দ্বারা 'জয় নিতাই' জীবিকার্জন করে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ।
২৩শে মাঘ ১৩৩১ সাল। বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী ৩৭।৪৯ পল।

চতুর্থ অধ্যায়

তোমাকে মায়ের একটু কাজ করতে হবে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। এখন সন্ধ্যা। শ্রীম ঘরের ভিতর বিছানায় বসিয়া একাকী ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণ পাশের পার্টিশানের ঘরে বসিয়াছেন। এই ঘরে স্কুলের শিশুদের ক্লাস হয়। ঠাকুর বলিতেন, পরমহংসগণ কাছে চার পাঁচ বছরের দু'একজন বালক রেখে দেন, ভাব আরোপ করবার জন্য। শিশু — কোন গুণের বশ নয় — এই ভাব। তাই কি শ্রীম শিশুদের কাছে রাখিয়াছেন? অনেক সময় দেখা যায় শ্রীম শিশুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন আর তাহাদের ভাব ভাষা ভঙ্গী সব অনুকরণ করিতেছেন।

ভক্তগণ আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া শ্রীম আহ্বান করিয়া বলিলেন, আসুন ঘরের ভিতর আসুন। বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, গদাধর ও বড় অমূল্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। আর দক্ষিণের বেঞ্চে বসিলেন। বাহিরের ঘরে বসিয়াছেন জগবন্ধু, বিনয়, ছোট রমেশ, বলাই, সুধীর, সুখেন্দু, 'ব্রুকবণ্ড', রমণী, বিজয়, ছোট নলিনী। ধ্যানান্তে শ্রীম ভজন গাহিতেছেন।

গান। বল রে শ্রীদুর্গা নাম।

গান। শ্রীদুর্গা নাম জপ সদা রসনা আমার।

গান। জাগো জাগো অমৃতের অধিকারী।

গান। হৃদে আছে বিভাবরী।

ভজন শেষ হইল। এইবার শ্রীম ভক্তদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর বলিলেন, বাইরে কে কে বসা, নাম বলুন যার-যার। কলেজের নাম-ডাকার মত ভক্তরা নিজ নিজ নাম বলিতেছেন। ঘরের ভিতর সকলের স্থান হয় না। অথচ শ্রীম সর্বদা সাধু ভক্তের মুখ দর্শন করিতে ব্যাকুল। কখনও নিজের হাতে লণ্ঠন লইয়া ভক্তদের কাছে উঠিয়া গিয়া একে একে

সকলের মুখ দর্শন করেন।

আজ শ্রীম ক্লান্ত। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বসিবার ইচ্ছা নাই। তাই চক্ষুর বদলে কর্ণে দর্শন করিতেছেন ভক্তদের। নাম শুনিয়া মনশ্চক্ষে দর্শন করিতেছেন। 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি', এই নীতিবাক্যটি আজ রাজনীতির পরিবর্তে ধর্মনীতিতে আসন লাভ করিল।

কথা কহিতে কহিতে শ্রীম একটি গানের কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করিতেছেন — 'ওহে বঙ্কুরায়' ইত্যাদি। শ্রীম এখন শ্রীকৃষ্ণভাবে ভরপুর। আর মহাভারতের দৃশ্যাবলী ভক্তদের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিতেছেন একটির পর একটি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভগবানকে চিনতে পারে না মানুষ, যখন তিনি অবতার হয়ে আসেন। পাণ্ডবরা এক একবার একটু বুঝলেন। অমনি পরক্ষণেই সব ভুলিয়ে দিল তাঁর মহামায়া। অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ এই একটি মহাসঙ্কট পাণ্ডবদের। দুর্য্যোধন ও শকুনির নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করলেন, কাল ধরিত্রী অপাণ্ডবীয় করবো। উড়িয়ে দিলেন এই প্রতিজ্ঞা tactics (কৌশল) দিয়ে। কৌশলে ঐ দিনই দ্রোপদীকে নিয়ে 'অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হও', এই বর ভীষ্ম পিতামহের নিকট থেকে লাভ করিয়ে।

নবম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম অর্জুনের বাণে আহত। দারুণ যন্ত্রণায় শিবিরে ধ্যানমগ্ন হতে চেষ্টা করছেন। ওমা, সেই অবস্থায় দুর্যোধন শকুনিকে নিয়ে উপস্থিত। একে তো যুদ্ধে বাণাঘাতে জর্জরিত, এর উপর এখন দুর্যোধনের বাক্যবাণবিদ্ধ। দুর্যোধন বলছে, আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন। মন দিয়ে যুদ্ধ করছেন না। অর্জুনের প্রতি স্নেহে মুগ্ধ। আপনার হাতে আমাদের জীবন, ধন মান রাজ্য সব। কিন্তু আপনি বিশ্বাসঘাতক। ধর্মপালন করছেন না প্রধান সেনাপতির। এই সব দুর্বাক্যে জর্জরিত হয়ে ভীষ্ম উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, কালই ধরিত্রী অপাণ্ডবীয় করবো। দুর্যোধনের হর্ষ। কিন্তু পাণ্ডব শিবির বিষাদময়। গুপ্তচরের মুখে এই কথা শুনে দ্রৌপদী পাগল প্রায়। তখনই শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে গিয়ে তাঁর শরণ প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তিরস্কার করলেন। বললেন, কেন গভীর রজনীতে পর শিবিরে এসেছ? যাও ফিরে যাও আপন শিবিরে।

দ্রৌপদীর আলুথালু বেশ। ভূমিতে পড়ে বারংবার প্রণাম করে স্তব করতে লাগলেন, হে মহাযোগী, পাণ্ডবধন, আজ এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তুমি পাণ্ডবসখা, এ নামটি রক্ষা কর।

চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণ বললেন, আমি কিছুই করতে পারব না। তুমি যদি সতী হও, তা হলে তোমার সতীত্ব তোমায় কেবল রক্ষা করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের উভয়-সঙ্কট। সত্যসন্ধ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ভগবানের কাজ। কারণ সাধারণ মানুষ সত্যের অনুসরণ করে। কিন্তু সত্য অনুসরণ করে ব্রহ্মদ্রষ্টা ভক্তের। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, কাল পাণ্ডববধ করবো। এই একটি সঙ্কট।

অপর সঙ্কট পাণ্ডবদের রক্ষা করা। নইলে যে জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন — ধর্মস্থাপন করা — তা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়-সঙ্কটে পড়ে গেলেন। বিচার করলেন, যদি ভীষ্মের মুখ থেকে 'অপাণ্ডবীয় করা' প্রতিজ্ঞার প্রতিষেধ করা যায় তবেই উভয় দিক রক্ষা হয় আপাততঃ। ভাবলেন, ভীষ্মকে শেষ অবধি যুদ্ধ থেকে উঠিয়ে নিতে হবে।

বর্তমান কার্যটি ভীষ্মের মুখ থেকে বের করা — পাণ্ডবগণ দীর্ঘজীবী হোক। এইরূপ বিচার করে ছলনাময় কৃষ্ণ দ্রোপদীকে নিয়ে মোহিনী বেশ ধারণ করে বের হয়ে পড়লেন ঐ গভীর রজনীতে। দ্রোপদী ধারণ করলে গ্রাম্য শোকার্তা কৃষকপত্নীর বেশ। আর কৃষ্ণ সাজলেন, গ্রাম্য কৃষক। ভগ্নীর শোকাপনোদনের জন্য মহাপুরুষ ভীষ্মের শিবিরে যাচ্ছেন। পূর্বে বুঝি মহাপুরুষ দর্শনে সর্বদা অবারিত দ্বার ছিল।

কৌরব শিবির। প্রহরী পথ অবরোধ করলো ছদ্মবেশী কৃষক ভ্রাতা-ভগিনীর। ভ্রাতা বললে, আমার ভগিনী বড় দুঃখী। তার শোক নিবারণের জন্য মহাপুরুষ পিতামহের দর্শনপ্রার্থী। প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, তোমার ভগিনী সধবা কি বিধবা? ছলনাচতুর কৃষ্ণ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলতে লাগলেন, ভাই তোমার কি মা বোন নেই? তাদের কি শোক হয় না? আমার এই বোনের প্রাণঘাতী শোক। তুমি তা দূর করায় সাহায্য না করে, যাতে শোক বাড়ে তা করছো। তোমার কি ঘর নেই, পরিবার নেই, তোমার ভিতর কি স্নেহ মমতা নেই। হা ভগবান — বলে বিলাপ করতে লাগলেন। হতভম্ব হয়ে প্রহরী বোনকে যেতে দিল। কিন্তু কৃষ্ণকে বারণ করলো।

কৃষ্ণ বললেন, না আমি যাব না!

পিতামহ যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ধরিত্রী অপাণ্ডবীয় করবো তখনই দুর্য্যোধন আদেশ প্রচার করলো সমগ্র কৌরব শিবিরে আজ রজনীতে কোনও সধবা স্ত্রীকে পিতামহের শিবিরে যেতে দিও না। দুর্য্যোধনের মন্ত্রী শকুনি অনুমান করেছিল, ঐ ছলচতুর ছোকরা কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে দিয়ে কিছু কাণ্ড করাবে। তাই প্রহরী প্রথমে যেতে দেয় নাই।

দ্রৌপদীকে বলে দিয়েছেন, পিতামহ শরীর ও মনের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে সমাধিস্থ হওয়ার চেষ্টায় ধ্যানমগ্ন। তুমি গিয়ে চরণে প্রণতা হয়ে কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে বলবে, পিতামহ, আপনার পৌত্রবধূর চরণবন্দনা স্বীকার করুন। বারবার ঐ কথা বলায়, পিতামহের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো আর আশীর্বাদ করলেন, দেবী, চির সৌভাগ্যবতী হও। দ্রৌপদী বললেন, তা কি করে হবে? আপনি যে কিছুক্ষণ পূর্বে বলেছেন, পৃথিবী কাল অপাণ্ডবীয় করবো। ভীষ্ম চক্ষু মেললেন, হাত দিয়ে কৃষ্ণাকে ধরে বললেন, কৃষ্ণা, তোমাকে যে শিখিয়ে দিয়েছে সে কোথায়? দ্রৌপদী বললে, ঐ দেখুন দাঁড়িয়ে হাসছে প্রহরীর কাছে। ভীষ্ম কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে নমস্কার করলেন, কোনও কথা নেই। ফিরে এলেন আবার নিজের আসনে। বুঝলেন এ যুদ্ধ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে। ইচ্ছা করে যদিও নিব না। কিন্তু ছলনাময় কৃষ্ণের চাতুরীতে অবশ্য নিতে হবে। এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের জয় নিশ্চয়। ভগবান কৃষ্ণ তাদের পক্ষে।

পরের দিন শিখণ্ডীকে রথাগ্রে বসিয়ে অর্জুন যুদ্ধে বের হলেন। ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করলেন। শিখণ্ডী নপুংসক। ভীষ্মের মনে ছিল, অশুভ দর্শন করলে অস্ত্রত্যাগ করবো। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তা' জানতেন। ভীষ্মের কর্ম শেষ হয়েছে। তাই তাঁকে সরিয়ে নিলেন।

২

যেখানে পাণ্ডবদের বিপদ সেখানেই কৃষ্ণ — সারা মহাভারতে এই এক কথা। এতে কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে? তাঁকে মানুষ মনে করলে এ হতে পারে। কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর। এখন মানুষরূপ ধারণ করেছেন। তাঁর মনে একই ভাব — পাণ্ডবদের রক্ষা ও কৌরবদের বিনাশ। তিনি

নিজেই কৌরব, নিজেই পাণ্ডব। ঋষিরা এটা বুঝেছিলেন। তাই বলেছেন, নিজের সঙ্গে নিজে আনন্দে খেলা করছেন — যেমন শিশুগণ আর্শিতে নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে নিজে খেলে। তিনি আনন্দে সৃষ্টি করেন, আনন্দে পালন করেন। আবার আনন্দে বিনাশ করেন। তিনিই যে একমাত্র সত্য, তবে partiality (পক্ষপাতিত্ব) কার সঙ্গে করবেন? তিনিই এক, তিনিই বহু। লীলায় দেখায় বহু — কৌরব পাণ্ডব আদি। কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই নেই। আছেন তিনি একা — সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

কিন্তু পাণ্ডবরা তাঁকে বুঝতে পারেন নাই অবতার বলে। এক একবার একটু আভাস পেল অমনি ভুলিয়ে দিলে তাঁর মহামায়া। নইলে যে লীলা চলে না। লীলায় জ্ঞান-অজ্ঞান দু'টোই থাকে।

তিনি যখন শরীর ত্যাগ করলেন তখন পাণ্ডবরা বুঝতে পেরেছিলেন — শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। এসেছেন ধর্মসংস্থাপনের জন্য। যখন বুঝলেন, তখন আর সংসারে থাকতে পারলেন না — মহাপ্রস্থান করলেন। মহাপ্রস্থান মানে বরফের উপর দিয়ে চলতে চলতে শরীর ত্যাগ করা। এটা আত্মহত্যা নয়। বেদে জ্ঞানীদের জন্য এই বিধান হয়েছে। মিথ্যা বোধ হয়েছে সংসার, দেহ — তাই সব ছেড়ে চলে যায়।

একজন পড়ে গেল বরফের উপর যেতে যেতে। কে পড়েছিল প্রথম — হাঁ দ্রৌপদী। এবার কে নকুল? তারপর? ভীম। কারো লক্ষ্য নেই কে পড়লো, কে রইলো। শোক নাই মোহ নাই। সকলে প্রায় উন্মত্ত, ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন। এখন বুঝেছেন পাণ্ডবরা — কেবল ঈশ্বর সত্য, শ্রীকৃষ্ণ সত্য। সংসার অনিত্য — দু'দিনের জন্য। যে দ্রৌপদীকে অবমাননার প্রতিশোধে ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করেছিলেন, সেই দ্রৌপদী বরফের উপর পড়ে রইল। চিল শকুনির আহার এখন। ভীম ফিরেও চাইলেন না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর কেশববাবুর বাড়িতে গেলেন কমলকুটীরে। কেশববাবু খুব অসুস্থ। বৈঠকখানায় বসলেন। কৌচ, চেয়ার সব রয়েছে। এইগুলি দেখে বললেন, এই সবের কি দরকার, কৌচ কেদারার? মানে শরীর যে থাকবে না তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।

পাণ্ডবদেরও তাই। যখন দরকার ছিল, তখন রাজ্য, যুদ্ধ, কত কি

কাজ — কত যুক্তি, কত চেষ্টা। মহাপ্রস্থানের সময় কেউ কাউকে ডেকে নিলেন না; আপনা-আপনি সব চললেন। কারো দিকে কেউ তাকিয়েও দেখলেন না। সকলের মন সমাহিত শ্রীকৃষ্ণে, ভগবানে।

কিন্তু বুঝলেন সংসার অনিত্য, কেউ কারো নয় — কখন? শ্রীকৃষ্ণ যখন দূরে সরে দাঁড়ালেন, অন্তর্ধান করলেন। কাছে থাকতে কেউ বুঝতে পারে নাই।

একটি যুবক (স্বগত) — তাই বুঝি শ্রীম বলেন, ঠাকুর থাকতে আমাদের বুঝতে দেন নাই, তিনি কত বড়। এক একবার তাঁর স্বরূপ একটু বোঝান আবার ভুলিয়ে দেন। স্নেহ ভালবাসায় ভক্তদের ডুবিয়ে রাখতেন। Equal footing-এ (সমান পর্যায়ে) রাখতেন, যেমন আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুদের লোক রাখে। যেমন বাপ ছেলেকে দেখে। এই স্নেহটি তাঁর মহামায়ার একটি রূপ। এ দিয়ে জগৎ চালাচ্ছেন। এখন অবতার হয়ে এসেছেন। ভক্তদের তৈরী করতে হবে। তাঁরা তাঁর প্রচার করবেন। সকলে যদি বুঝে ফেলে, আর সর্বদা ঐ জ্ঞান রাখে, তবে কাজ করেকে? কি আশ্চর্য! ঠাকুর ভক্তদের ঈশ্বরদর্শন করিয়েও আবার মায়াতে বাঁধেন। প্রহেলিকা। যুক্তি এখানে পঙ্গু। নরেন্দ্রকে নিরাকাররূপ দেখালেন। নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ। আবার তাঁকে বাঁধবার চেষ্টা। বলছেন, 'মা, লরেনকে বাঁধ। নইলে যে শরীর ছেড়ে চলে যাবে।' বাঁধলেনও।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কম ভাবনা শ্রীকৃষ্ণের! যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুন বললেন, যুদ্ধ করবো না। কি বিপদ! তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই বুঝছেন না অর্জুন। সব যুক্তি বিকল। একবার বললেন, তুমি অত বড় লোক, তোমার রাজ্য চাই, যশ চাই। যে দিকে inclination (বাসনা) সে দিকের কথাই বলছেন। এতে কাজ হচ্ছে না। এবার বিশ্বরূপ দেখালেন, স্নেহ মমতা মান্যতা সব দূর হয়ে যাবে হয়তো এতে এই ভেবে। তাতেও কাজ হলো না। অর্জুন দৃঢ় সংকল্প করলেন যুদ্ধ করবো না বলে। শ্রীকৃষ্ণ তখন জোর ধমক দিলেন, 'বিনঙ্ক্ষসি' (গীতা ১৮:৫৮)। বিনাশপ্রাপ্ত হবে আমার কথা না শুনলে। তখন কাঁপতে লাগলেন অর্জুন। বললেন, 'নষ্টমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' (গীতা ১৮:৭৩)। গুরুর ধমকও শ্রেয়ের জন্য। তখন অর্জুনকে দিয়ে ভারতযুদ্ধ করালেন।

শ্রীম — একি সহজ কথা? মন নিয়ে খেলা! তা আবার অর্জুনের মত উত্তরাধিকারীর মন! অর্জুনের জন্যই যুদ্ধ-আয়োজন। যুদ্ধের সময় অর্জুনের dejection (হতাশা) এলো। তাকে দূর করিয়ে যুদ্ধটি করিয়ে নিলেন।

উৎসাহ, বিষাদ, শরণাগতি, যুক্তিজাল, বিশ্বরূপদর্শন, ধমকপ্রাপ্তি, মোহনাশ, যুদ্ধে কৃতসংকল্প, যুদ্ধাবসান, বিজয়লাভ, — পরপর এ সব অবস্থা অর্জুনে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণ সব বাধা কেটে দিলেন। কম পরিশ্রম শ্রীকৃষ্ণের! এসব যদি ভাবা যায় অবতার-চরিত্রের, তবে ভক্তদের মনের সংশয় মিটে যায়। আর কর্তব্যে রুচি ও বুদ্ধি স্থির হয়।

তাঁর নাম নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকলে এসবের দরকার নাই। কাজ করতে হলে, কাজ করাতে হলে — শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের এসব দিক চিন্তা করা দরকার।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — কি শ্লোকটা? — 'কার্পণ্যদোষো'..

ডাক্তার বক্সী — কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ (গীতা ২:৭)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিপদে পড়ে অর্জুন কৃষ্ণকে গুরুর মর্যাদা দিলেন। বিপদ তাই আমাদের বন্ধু। একসঙ্গে রয়েছেন ভাই ভাই। সমবয়সী, তাই বন্ধু। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদে পড়ে তখন একটু বুঝতে পেরেছিলেন অবতার ভাবটি। তাই তো বললেন, 'শিষ্যস্তেঽহং' — আমি তোমার শিষ্য।

বড় কঠিন কাজ মানুষ তৈরী করা। ঠাকুর দিনরাত ভক্তদের কিভাবে কাকে তৈরী করতে হবে তাঁর কাজের জন্য, তাই ভাবতেন। তাঁদের প্রকৃতির সঙ্গে কখনও লড়াই করতেও হতো। কম খাটুনী!

যার যে দিকে inclination তাকে সেই দিকেই নিয়ে যেতেন। একজন বিচার ভালবাসে তাকে ঐ দিকে নিয়ে যাবেন। একজন ঈশ্বরের কথা কইতে ভালবাসে তাকে সেই দিক দিয়ে তৈরী করে কাজে লাগিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের যে দিকে inclination সেই দিকের কথাই বলছেন। বড় একটা বাধা দেন নাই। বড় বাড়াবাড়ি দেখলে তখন এক একটা ধমক দিচ্ছেন। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, 'তোর ঘাড়ে করবে।' আর একজনকে বললেন, 'মা আমায় বলেছেন, তোমায় ঘরে থেকে তাঁর

একটু কাজ করতে হবে (তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া) এই, এইটুকু — লোকদের ভাগবত শোনাতে হবে। ভক্তের ইচ্ছা সন্ন্যাসী হওয়া। বার বার বুঝিয়েও শান্ত হচ্ছে না দেখে ধমক দিলেন — বললেন, কেউ মনে না করে, আমি না হলে মায়ের কাজ নষ্ট হবে। মা এক টুকরো তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করেন।'

অবতার কি খালি কাজ করেন? আবার সর্বদা highest idealটি (শ্রেষ্ঠ আদর্শটি) সামনে ধরেন। সেই আদর্শটি হলো ঈশ্বর দর্শন। এটা ছেড়ে দিয়ে কাজ নয়। অর্জুনকে বলছেন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যো' হও। ত্রিগুণাতীতও হও। আত্মস্থ হও। ব্রহ্মলীন হও। আবার বলেছেন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ!' সর্বদা আমার চিন্তা কর, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধও কর। ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে যুদ্ধ করতে বলেন নাই। একবার বলছেন, 'ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'। আবার বললেন, যে 'আত্মরতি আত্মতৃপ্ত' তার কর্তব্য নেই। একবার বলছেন, 'সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে'। আবার বললেন, 'ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে।' (গীতা ২:৪৫, ৮:৭, ১১:৩৩, ২:৩৪, ৩:১৭, ১১:৩২)।

গীতাতে যত সব contradictory ideas (পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব) রয়েছে! তাই তো সবাই গীতাকে ভালবাসে। Antagonist-ও (বিরুদ্ধবাদীও) গীতা quote (উদ্ধৃত) করে।

৩

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বগত) — বিশ্বরূপের কি দরকার? না, মারামারি কাটাকাটি এই বীভৎস রূপ দেখে যদি বৈরাগ্য হয়। তখন শরণাগত হবে, কথা শুনবে। তা হলেই কার্যসিদ্ধি হবে। গুরুর শরণাগত না হলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, বেড়ে যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গীতার অর্থ বোঝা বড় শক্ত। যে যেমন সে তেমনি অর্থ করে। কত রকম ভাষ্য! যেমনি শ্লোক বোঝা, তেমনি ভাষ্য বোঝা! সব না ছাড়লে গীতার অর্থ বোঝা যায় না। সর্বত্যাগ চাই এর মর্ম উদ্ঘাটন করতে হলে।

একজন খুব উঁচু পাহাড়ে উঠেছে। দূরে কি একটা কাল ভূতের মত

দেখাচ্ছে। আর একটু কাছে এলো। তখন দেখলে ওটা জানোয়ারের মত crawl করে (বুকে ভর দিয়ে) চলছে। আরও কাছে এলো — measurable distance-এ (দৃষ্টির নিকটে)। তখন দেখলে ওটা একটা মানুষ। তারপর তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব দেখতে পেলো। তেমনি যে যেখানে আছে সেখান থেকেই ঈশ্বরকে দেখে, তাঁর মহাবাণী শোনে।

তাই সাধুরা গীতার এক রকম অর্থ করেন। অন্যরা অন্য রকম। সাধুদেরও আবার মতভেদ আছে।

কেবল যোগীরা শাস্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝতে পারেন। তাঁদের মুখে শুনতে হয় শাস্ত্র, তাঁরা nearest approach (অতি নিকটে) ঈশ্বরের।

পণ্ডিতের কি সাধ্য বোঝা? ঠাকুর বলতেন, যে পণ্ডিতগুলোর বিবেক-বৈরাগ্য নেই, ভক্তি নেই, সেগুলোকে যেন খড়কুটোর মত মনে হয়।

পণ্ডিতগুলো কেবল শব্দার্থ নিয়ে মরে। শব্দার্থ আর মর্মার্থ। মর্মার্থই সার। মর্মার্থ তপস্যা না করলে বোঝা যায় না। ঠিক ঠিক বোঝা মর্মার্থ — সে কেবল তপস্যা দ্বারা ভগবৎকৃপায় তাঁর দর্শনের পর হয়।

শাস্ত্রে আবার interpolation (প্রক্ষিপ্ত) আছে। আবার যারা publish (প্রকাশ) করেছে তাদের ভুল প্রমাদও ঢুকেছে। আবার যারা শ্লোকগুলি সাজিয়েছে তারা নিজের নিজের taste (রুচি) অনুযায়ী উহা করেছে। তা ছাড়া কত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে এই শাস্ত্র চলেছে। কখনও বিরুদ্ধ দলের সংঘর্ষে শাস্ত্র ধ্বংসপ্রায়।

অবতার এসে এক একবার এই ছিন্ন শাস্ত্রের প্রাণসঞ্চার করেছেন। তাই তো শাস্ত্রবাক্যের key (অর্থ) দেখতে হলে আমরা ঠাকুরের কথা নিই। তার মহাবাক্য চিন্তা করলে একটু light (আভাস) পাওয়া যায়।

শ্রীম পুনরায় কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — মর্মার্থ বোঝান গুরু। গুরু কে? এক ঈশ্বরই গুরু। অবতার গুরু। আর যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তিনি গুরু। ঈশ্বরের শক্তিই এঁদের সকলের ভিতর দিয়ে চলছে। ঈশ্বরদ্রষ্টাকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলে। ঋষিরা সব মন্ত্রদ্রষ্টা।

গুরুর definition (সংজ্ঞা) ঠাকুর দিয়েছেন, 'যিনি কাশীতে গিয়েছেন', অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তিনি গুরু। 'তাঁর মুখে কাশীর

কথা।' অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা শুনতে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর আছে।

ডাক্তার বক্সী — গুরু ভগবানদর্শন করেছেন, এ কথা কি করে বুঝবে লোক?

শ্রীম — গুরুকে চেনা যায় না। তবে অবতারাদি এলে অন্য রকম। অবতার নিজেকে চিনিয়ে দেন তাদের, যাদের দ্বারা তাঁর কাজ করাবেন। ঠাকুর নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছেন আমাদের, যাঁরা তাঁর কাজ করছেন। নইলে করবে কেন কাজ মন-প্রাণ-জীবন দিয়ে?

ঠাকুর আমাদিগকে চিনিয়ে দিয়েছেন — যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ — বাক্য মনের অতীত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মশক্তি। তিনিই মা কালী।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, বুঝিয়ে দাও বলে। তা হলে তিনিই হয়তো বুঝিয়ে দিবেন।

গুরুকে বোঝা যায় না, superman-কে (অতিমানবকে)। কেমন করে বোঝা যাবে? একজন ছাদে আছে। আর একজন সিঁড়িতে আছে। সিঁড়ির লোক ছাদের লোককে কি করে বুঝবে? গুরুকে চেনা যায় না।

শ্রীম পুনরায় মৌনী। এই অবসরে বড় জিতেন ভক্তদের সঙ্গে অবান্তর কথা কহিতেছেন। শ্রীম উহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই কথার স্রোত বন্ধ করার জন্য পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে ভক্তদের প্রতি) — নরেন্দ্রের বিয়ের কথা হচ্ছে আর. মিত্তিরের মেয়ের সঙ্গে। ভক্তরা (শ্রীম) এ কথা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর জবাব দিলেন, হাঁ। ও একটা বড় দলপতিটতি কিছু হবে। এই পর্যন্ত। অমনি ও কথা উল্টে দিয়ে অন্য কথা পাড়লেন। ও কথা আরও হলে, অন্য কথা, বিষয়ের কথার স্রোত বেড়ে যেতো। আর. মিত্তির আমাদের প্রতিবেশী, তাঁর টাকাকড়ি, ইনি ব্যারিস্টার — এই সব কত কথা এসে পড়তো। সব চাপা দিলেন, অন্য সব কথা।

ভক্তদের, যাঁরা তাঁকে খুব ভালবাসেন, তাঁদের মধ্যে অন্য সব কথা হচ্ছে শুনতে পেলে, ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব ধমক দিতেন।

(সহাস্যে) ঠাকুর চড়টড়ও দিতেন। আমায় একটি চড় দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব আবার লাথি মারতেন। জগদানন্দকে একদিন লাথি মারলেন

রাস্তায়। তারপর জগন্নাথ দেখতে গেলেন।

বৈষ্ণবেরা একে বলে প্রহার-প্রসাদ (হাস্য)। একি লাথি? যে পা সকলে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করে তার আঘাত কি লাথি? কৃপা, কৃপা।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এসব (সংসার) কি চিরদিনই করতে হবে? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, আমাকে এখন ইহা ছাড়তে হবে। অন্য পথ নিতে হবে—সন্ন্যাস। 'প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি'(বৃহঃ ৪:৫:২)। কেন চিরকাল এই পথ নিয়ে থাকতে হবে? অন্য পথ নিতে হবে।

বড় অমূল্য — এ তো ঋষিদের কথা। তাঁরা পারেন।

শ্রীম — আপনারাও ঋষি! হাঁ, আপনারা ঋষি!! তাঁর চিন্তা করছেন। কেন ঋষি নন? ঋষিরা, দেখুন না ঘরে থাকতেন। সব ছিল।

সবাই কি বললেই পারে (সর্বস্ব ত্যাগ করতে)? প্রকৃতি যাবে কোথা? বুদ্ধদেব পেরেছিলেন। সাধু দেখে একেবারে চৈতন্য হয়ে গেল। সব ছেড়ে চললেন।

বড় অমূল্য — মনে হচ্ছে, দিন দিন যেন আরও জড়িয়ে যাচ্ছি।

শ্রীম — তরঙ্গ উঠে কেন? মাঝিকে আরও পাকা করবে বলে। In a calm sea everyone is a pilot (প্রশান্ত সমুদ্রে সকলেই নাবিক হতে পারে)। উত্তাল তরঙ্গের ভিতর দিয়ে যে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাকেই বলে কর্ণধার।

বিবেকানন্দ বেশ বলেছিলেন, বিপদে যে পড়ে নাই সে যে baby শিশু)। (ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর) বিপদ, প্রলোভনের ভিতর দিয়ে গেলে তবে বুঝি বীর! স্বামীজী মহাবীর!!

বড় অমূল্য (আক্ষেপের সহিত) — না কিছুই হবে না। মন নিচেই যাচ্ছে। কি করবো?

শ্রীম (উচ্চ গর্জিত কণ্ঠে) — কেন, তিনি তো তার উপায় বলে দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। আর সাধুসঙ্গ। আর তাঁর চিন্তা করা। আর নির্জনে চলে যাওয়া মাঝে মাঝে। এ সব করবে না, অথচ বলা, কি করবো!

৪

কথামৃত তিনটি প্রেসে ছাপা হইতেছে। শ্রীম-র খুব খাটুনি বাড়িয়াছে। অন্তেবাসীর মুখে ইহার ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই প্রিন্টিং নিয়ে পড়া গেছে। তিনটা ছাপাখানা থেকে প্রুফ আসছে। প্রকৃতিতে আছে, তাই করছি। ছাড়তে পারছি না, তাই করছি।

বড় জিতেন — না, আপনাদের কর্ম সব লোকশিক্ষার জন্য। আপনাদের নিজের কি দরকার?

শ্রীম (প্রতিবাদের সুরে) — না, না। Ideal (আদর্শ) যা তা তিনি দিয়ে গেছেন—সর্বদা তাঁর চিন্তা করা। কর্ম করছি, প্রকৃতিতে রয়েছে তাই।

বড় জিতেন (বিনীতভাবে) — না মশায়। আমরা যতটা বুঝতে পারছি, লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করছেন।

শ্রীম (আপত্তির উচ্চ স্বরে) — Thanks! many many thanks (ধন্যবাদ! বহু বহু ধন্যবাদ)!

শ্রীম (সকলের প্রতি) — Ideal (আদর্শ) হলো, সর্বদা তাঁর চিন্তা করা। কর্ম প্রকৃতিতে রয়েছে বলে করছি।

কর্ম কি ত্যাগ হয়? তাই গুরু একটা additional factor (অতিরিক্ত ভাব) ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এইভাবে (নিষ্কামভাবে) কর। তবুও অনেকটা হলো।

কর্মত্যাগ হলে তখন সমাধি — ঠাকুরের অবস্থা। এক আধবার নয়। সর্বদা সমাধিস্থ। অপরের এক আধবার হয়। তার পর প্রারব্ধ ভোগের জন্য নিচে নেমে থাকে।

সমাধিস্থ হয়ে শরীর একুশ দিন থাকে। তারপর শরীর ত্যাগ হয়, ঠাকুর বলতেন।

একটি বালক ভক্ত জোর করিয়া কর্ম ছাড়িয়াছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তরা প্রশ্ন করিতেছেন।

ছোট জিতেন (অন্তেবাসীর ইঙ্গিতে) — তা হলে যারা জোর করে কাজ ছেড়ে দেয় —।

শ্রীম — তারা কি পারে থাকতে? ঘায়ের মাম্‌রী, না শুকুতেই টেনে তুলবে!

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যদি ঠাকুরের অবস্থা হয় তবে কর্ম ত্যাগ হয়। সমাধিতে যার কর্ম ত্যাগ হয়, তখন কিছুর খবর রাখে না। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' (গীতা ৬:২২) — যে বস্তু (ব্রহ্ম) লাভ করলে মনে হয় এর অধিক আর কিছু লভ্য নাই।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ক্ষুধাতৃষ্ণা যেমন অভ্যাস হয়ে গেছে কর্মও তেমনি। ও ছাড়তে পারে না।

শ্রীম পুনরায় কিছুকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বগত) — কি আশ্চর্য! একদিনও দেখলাম না কারুকে কিছু করতে বারণ করতে। যে যা করতে চায় তাই করছে। তাঁকে কোনটাই বারণ করতে দেখলাম না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন গোপালদাদা ওদের (ছোকরা ভক্তদের) রঙ্গিয়ে (গেরুয়া পরিয়ে) এনে নমস্কার করালেন। ঠাকুর কিছুই বললেন না।

তিনি জানতেন কিনা, এতে আবার একটা উপাধি বাড়বে। এদিকে (বাইরে) যতখানি হবে, ওদিকে (ভিতরের দিকে) ততখানি আসল জিনিস টান পড়ে যাবে।

তাই তিনি এমন কিছু ঢুকিয়ে দিতেন যাতে ভিতর ফাঁক করে দিল। এতে (সংসারে) আর ভাল লাগে না।

শ্রীম পুনরায় নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বগত) — তারপর তো মিশন চার্চ হবেই। একটা ইনস্টিটিউশান্ হবে। এসবও তাঁর কার্য।

কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে একটি আলাদা কাণ্ড করেন। ওটি কেরমে (ক্রমে) দূর হয়ে যায়।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম আজ অত কর্মক্লান্ত। বাইরে গিয়ে বসতে পারেন নাই। দেখছি, ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে যেন যুবকের শক্তি ফিরে এসেছে। ক্লান্ত মন যেন লিফটে চড়ে সাত তলায় উঠে পড়েছে। ব্রহ্মাত্মভাব বুঝি এর উৎস। এটা কি বিদেহী ভাব!

শ্রীম এবার কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — 'জয় নিতাই' ছেলেদের হরিনাম দিচ্ছে।

কেউ টিকি ধরে টানছে, কেউ কাপড়। এই সব বলছিল।

তা করবে না! (আশ্চর্যের সহিত) ছেলেদের বলছে! ওদের বাপেরা সব কি নিয়ে আছে? ছেলেদের বললেই নেবে?

Reform (সংস্কার) আগে করতে হয় বাড়িতে, 'at home'। বেশ তো, তোমার ইচ্ছা থাকে বাড়িতে গিয়ে বাপদের আগে শুনাও না, কেমন দেখি। ওদের (ছেলেদের) বললে, ওরা কি করে নেবে? ওরা তোমার ridiculous side-টাই (উপহাসের দিকটাই) দেখবে। বেশ তো যাও। বাড়িতে গিয়ে বাপদের আগে সংস্কার কর। তখন ছেলেরা আপনা থেকেই reformed (উন্নত) হবে। বললেই কি হয়? তা হলে রক্ষে ছিল না। তুমি তো খালি বাইরেটা দেখছো। ভিতরে যে প্রকৃতি রয়েছে। অনন্তকালের পুঞ্জীভূত সংস্কার।

সেই সংস্কার assert (আত্মপ্রকাশ) করে। গুরুকৃপা হলে কেবল ওর মোড় ফিরতে পারে। শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না, ঠাকুর বলতেন।

অপরের সংস্কার বদলাতে চাও তো আগে নিজের বদলাও। নিজের ভিতর রয়েছে ভোগবাসনা। তোমার কথা শুনবে কে?

মনে করছো নিষ্কাম করছো, কিন্তু হয়ে পড়ছে সকাম। সকাম ভাব যে তোমার ভিতর পাহাড় হয়ে আছে।

নাম শুনাচ্ছে কি জন্য? পয়সা রোজগারের জন্য। কে শুনবে তোমার নাম? ভগবানের আদেশ পেলে তবে নাম শোনাবার অধিকার হয়। ঠাকুর ভক্তদের আদেশ দিয়েছিলেন। তাই তাদের কথা লোক শোনে। কেহ কেহ সাধু হচ্ছে, কেহ দাসীবৎ গৃহে থাকতে চেষ্টা করছে।

তিনি ইচ্ছা করলে এই প্রকৃতিও বদলে দিতে পারেন। তবে সচরাচর দেন না। ঠাকুর বলেছিলেন, মা ইচ্ছা করলে আমড়া গাছে বোম্বাই আম ফলাতে পারেন। তবে বেশী করেন না। কেন? না, বোম্বাই আমগাছ যে অনেক রয়েছে।

যদি কেউ প্রকৃতি বদলাতে চায় তবে তাঁর শরণ নিক — কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে, শিশুর মত। তবে হয়। তাঁর ইচ্ছায় সব সম্ভব।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ। ২৪শে মাঘ, ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা ত্রয়োদশী ৪৩ দণ্ড। ৯ পল।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজর্ষি ভক্ত চিত্তরঞ্জন

১

আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদ্যশ্রাদ্ধ। বিরাটভাবে উহার আয়োজন হইয়াছে ভবানীপুরে তাঁহার প্রাসাদোপম ভবনে।

দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ দেখিয়া শ্রীম তাঁহার বড়ই অনুরাগী হইয়াছেন। তাঁহার শরীরত্যাগ উপলক্ষে মর্টন স্কুল তিনদিন বন্ধ রাখিয়াছেন। নিজ হাতে শ্রীম, সারকুলার বইতে উহা লিখিয়াছেন। মর্টন স্কুলে ছুটি খুব কম। ইহাতেই বুঝা যায় শ্রীম কত শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। লিখিয়াছেন "The school will remain closed for three days on account of the sad and untimely demise of the great patriot Saint of Bengal." — বাংলার বিখ্যাত দেশপ্রেমিক মহাত্মার অতি দুঃখপূর্ণ অকাল অন্তর্ধানের জন্য মর্টন স্কুল তিন দিন বন্ধ থাকিবে।

শ্রীম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছেন, দাশমশায়ের অত বড় আয়ের ব্যারিস্টারী ত্যাগ আর দেশকে সর্বস্ব দান — এ যেন বুদ্ধদেবের ন্যায়।

আজ ১লা জুলাই ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩২ সাল। বুধবার, শুক্লা দশমী তিথি, স্বাতী নক্ষত্র, শিবযোগ।

সকাল আটটার সময় শ্রীম দাশমহাশয়ের ভবনে যান। সঙ্গে ছিলেন বিনয়, ছোট রমেশ, সুখেন্দু ও মনোরঞ্জন। দানসাগর শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে বৈদিক সনাতনী বিধিতে। ইহার পরও আজের দিনে আরও দুইবার শ্রাদ্ধস্থলীতে শ্রীম যান। দাশমহাশয়ের মৃত্যুতে শ্রীম অতীব শোকার্ত।

আজ অপরাহ্নে গড়ের মাঠে অতি বৃহৎ শোকসভা হয়। শ্রীম সুখেন্দু ও জগবন্ধুকে ঐ স্থানে পাঠান। সন্ধ্যার পর সভার ফেরৎ ভক্তদের মুখে দাশমহাশয়ের গুণাবলী শুনিতেছেন। মা যেমন মৃত পুত্রের গুণাবলী শুনিয়া যুগপৎ শান্ত ও শোকার্ত হন আজ শ্রীম-র সেই অবস্থা। গুণাবলীর

শ্রবণ ও কীর্তনে পরলোকগত দাশমহাশয় যেন আজ জীবন্ত।

রাত্রি আটটা। বিনয় মাহেশ হইতে ফিরিয়াছেন। আজ সেখানে ৺জগন্নাথ দেবের উল্টারথ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে সেখানে গিয়াছিলেন। আর ভক্তদের পাঠাইয়া দিতেন। তাই শ্রীম-র নিকট মাহেশের রথ অতি পবিত্র ও আদরণীয়। নিজে বৃদ্ধ। সকল স্থানে যাইতে পারেন না। তাই ভক্তদের পাঠাইয়া দেন। আজও তিনি বিনয়কে পাঠাইয়াছিলেন। বিনয়ের নিকট রথের সকল বিবরণ শুনিতেছেন। মাহেশের ফেরৎ বিনয় কাশীপুরের বাড়ি হইয়া আসিয়াছেন ডাক্তার বক্সীর সঙ্গে তাঁহার মোটরে। উল্টারথে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, কিন্তু আজ তাহা হয় নাই। বেলা দুইটার পর রথ টানা আরম্ভ হয়। এইবার শ্রীম ঠাকুরের স্মৃতি কথার উত্থাপন করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রথে কেউ গেলে ঠাকুর বলতেন, ছুরি কাঁচি বঁটি আনবে। পাঁপড়ভাজা, বেগুনী খাবে। আর সব দেখবে ঘুরে ঘুরে দোকানপাট সব কিছু। এটা বাল্যলীলার একটা অভিনয়।

ডাক্তার বক্সী — মেয়েরা খালি কিনতে যায়, ঘর গেরস্থালীর নানা জিনিসপত্তর।

শ্রীম — না, ভক্তিও আছে। সঙ্গে ঐ। ঘর ওদের চালাতে হয় কি না। তাই তার ভাবনা আছে।

(সহাস্যে) অনেক জিনিস কিনলে মনে হয় ওদের — না, এইবার কিছু তীর্থ হলো। আর সেই সব প্রতিবেশীকে দেখাবে। কেউ যদি কোনও জিনিস খারাপ বলে তবে চটে যাবে (হাস্য)।

একজন ভক্ত — আজ মিটিং-এ বলছিল, সি.আর. দাশ খুব ভক্তলোক ছিলেন।

শ্রীম — খুব ভক্ত। ভিতরে ভক্তি ছিল। বেলুড় মঠে গিয়ে কখনও রাত্রিবাস করতেন। আবার কাঙ্গালীদের সঙ্গে একত্র বসে প্রসাদ খেতেন।

ভিতরে ভক্তি না থাকলে অমন ত্যাগ হয় না। রাজর্ষি ভক্ত। সর্বস্ব দিয়ে দিলেন, কি খাবেন পরবেন তারও সংস্থান রাখেন নাই। এই কঠোরতা করেই তো অকালে শরীর গেল।

যোগীভোগী লোক ছিলেন, যেমন পাণ্ডবরা। হঠাৎ যোগী হয়ে গেলেন। তাই শরীর ধারণ করতে পারলো না এর প্রতিক্রিয়া। মহৎ লোক।

উনি বুঝেছিলেন, বিষয় ঘেঁটে ঘেঁটে মনের যে অপব্যয় হয় তা পূরণ হয় সর্বস্বত্যাগে, সন্ন্যাসে। তাই সব ছাড়লেন।

ত্যাগী না হলে ঠিক ঠিক সেবা হয় না। পরোপকারকে ঠিক সেবা বলা চলে না। যদি ঈশ্বরবুদ্ধি থাকে সেব্যে, তবেই ঠিক সেবা হয়। ঠাকুর এই কথাটা বলতে গিছলেন বিদ্যেসাগরমশায়কে। এই সেবার জন্যই সর্বস্ব ছেড়ে ফকির হলেন দাশমশায়। গান্ধীজী রয়েছেন কিনা সামনে আদর্শ।

এটাই ভারতীয় আদর্শ — renunciation and service of God in all (সর্বস্ব ছেড়ে জীবশিবের সেবা)।

ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। নইলে চেষ্টা কর। নইলে এই সব কর — জীবশিবের সেবা।

২

আজ মুসলমান পর্ব বকর-ঈদ। মুসলমান ভক্তদের নামাজ ও আনন্দ দেখিয়া শ্রীম-র বিশেষ উদ্দীপন হইয়াছে। তিনি আজও বলিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর চক্ষুতে এমন একটি চশমা পরিয়ে দিয়েছেন যে সব মিষ্টি লাগে। সব ধর্ম সব লোক আপনার বলে বোধ হয়। তাঁর কাছে আল্লা আর বেদের ব্রহ্ম এক।

আজ ২রা জুলাই, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, শুক্লা একাদশী।

সারাদিন শ্রীম এই উচ্চভাবে কাটাইতেছেন। যে আসে তাহাকেই বলিতেছেন, ঠাকুরের এই 'যত মত তত পথ' মহাবাক্য ভবিষ্যৎ-জগৎ বুঝবে। এই মহাবাক্যের উপর জগতের মিলনমন্দির স্থাপিত হবে। অবতারের কাজ মানুষ তৎকালে বুঝতে পারে না। যত সময় যায় ততই বোঝে। কয়েকটি মাত্র লোককে তৎকালে বুঝিয়ে দিয়ে যান। তারাই তাঁর বার্তাবাহক।

বারবার শ্রীম বলিতেছেন, আজের দিনে একবার দক্ষিণেশ্বর গেলে হতো। যে কোনও ভাবে ঈশ্বরের উদ্দীপন হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া পড়েন চক্ষুর সম্মুখে। আর হৃদয়পুর পরিপূর্ণ হইয়া যায় তাঁহার ভাবে। সেই সঙ্গে তাঁহার দিব্য লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরও আসিয়া পড়ে মনে।

দক্ষিণেশ্বর-লীলার অসংখ্য স্মৃতি রহিয়াছে শ্রীম-র হৃদয়পটে। এই সবই যুগপৎ মনে উদয় হইয়া দিব্যোন্মাদপ্রায় হইয়া পড়েন। তিনি ভক্তদের সর্বদা বলেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই ইদানিং নররূপে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার অবতারলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীম মধ্যাহ্নে ঈদের নামাজ দর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখেন মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু। আমারই ইষ্টদেব শ্রীভগবানকে সকল ভক্তগণ ডাকছেন। নাম কেবল ভিন্ন।

মহাপুরুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। দক্ষিণেশ্বর যাইবার সাধন আপনি আসিয়া পড়িল। ডাক্তার কার্তিক বক্সী ও বিনয় তাঁহাদের মোটর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অপরাহ্ন তিনটার সময় শ্রীম চলিলেন দক্ষিণেশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে। ফিরিলেন সন্ধ্যার পর।

এখন রাত্রি আটটা। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। সম্মুখে ভক্তগণ বসা বেঞ্চে। বড় জিতেন, বলাই, ডাক্তার, বিনয়, গদাধর, বুদ্ধিরাম, জগবন্ধু প্রভৃতি। একজন কীর্তনীয়া আসিয়াছেন। একটু পর অন্তেবাসী উঠিয়া গিয়া পাশেই অদূরে শ্রীম-র কাপড়ে সাবান লাগাইতেছেন।

শ্রীম আজ খুব ক্লান্ত। একথা সেকথার পর কথার স্রোত উল্টাইয়া দিলেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — শুনিয়ে দাও তো ভক্তদের বেদ, যা মুখস্থ করলে।

গদাধর — এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাব্যাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত। ইত্যাদি। (বৃহঃ ৩:৮:৯-১০)

শ্রীম — এমন কাণ্ড — সূর্য চন্দ্র, আকাশ পৃথিবী, সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের বিধানে চলছে। তাঁর ইচ্ছায় সব কাজ করছে। লোক মনে করে এমনি চলছে। ঋষিরা বলছেন, না, তিনি চালাচ্ছেন। আবার ঠাকুর নিজ চক্ষে দেখছেন তিনি চালাচ্ছেন। বলেছেন, কি বিচার করবো, দেখছি মা-ই সব হয়ে আছেন, সব চালাচ্ছেন! এতে আর 'কিন্তু' চলে না।

একজন ভক্ত — নিজে দেখতে না পেলে কি করে বিশ্বাস করে

লোক?

শ্রীম — কেন? গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা। অবতার গুরু। একটি শিশু, সে সাপের সঙ্গে খেলতে যাচ্ছে। বাপ টেনে নিয়ে এলো। বিপদ হবে বলে। শিশু জানে না সাপের বিষে মরণ হয়। বাপের কথায় বিশ্বাস করে সে বেঁচে গেল। তেমনি ঠাকুর বলেছেন, বেদ বলেছেন, এর উপর কথা নেই।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — ওটাও বল, মহানির্বাণতন্ত্রের নমস্কার। নমস্তে সতে —

গদাধর — 'নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়'। ইত্যাদি।

শ্রীম — এখানেও বলছেন ঋষিরা — তুমি সর্বলোকের আশ্রয়। তোমায় নমস্কার। 'সর্বলোক' মানে সমগ্র বিশ্ব। চতুর্দশ ভুবন — entire universe.

যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে এ কথার probability (সম্ভাব্যতা) সিদ্ধ হয়। যেখানে কর্ম সেখানেই কর্তা। কর্তা ছাড়া কর্ম হয় না। বিশ্ব একটা কর্ম। তার কর্তা চাই। এ যুক্তিতে জগতের কর্তার সম্ভাব্যতা সিদ্ধ হয়।

একজন ভক্ত — কেন দেখা দেন না সেই কর্তা? সংসারে লোক-ব্যবহারের কর্তাকে তো সকলে দেখতে পায়। তাজমহল করিয়েছেন সাজাহান। লোকে দেখছে তাঁকে।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ, এ মায়ের খেলা। বেদেও তাই আছে —আনন্দে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন জগতের ঈশ্বর। ঠাকুর বলতেন, বুড়ী ছুঁলে খেলা হয় না। 'বুড়ী' মানে ঈশ্বর। চোখ বেঁধে খেলে ছেলেরা। বাঁধা চোখে বুড়ীকে যে ছোঁয়, তার চোখের বন্ধন খুলে যায়। সে আর খেলতে পারে না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানে তার আর খেলা হবে না — সে জন্মমরণরূপ ক্রীড়াচক্রে আর পড়বে না।

একজন ভক্ত — কেন এরূপ খেলছেন? লোকের যে প্রাণ যায়।

শ্রীম — এই 'কেন'র জবাব কেউ দিতে পারে না। তাই ঋষিরা বলেছেন, আমরা জানি না কেন খেলছেন। ঈশ্বরের আনন্দের অভাব নেই, তিনি আনন্দ স্বরূপ। খেলায় লোকের আনন্দ হয়, তাই খেলে। সকল আনন্দের উৎস যিনি তাঁর তো আনন্দের অভাব নেই। তবুও কেন

খেলছেন? এর উত্তর ঐ, আমরা জানি না। বলতে গেলে ঐ বলা যায়, তিনি খেলছেন।

'লোকের যে প্রাণ যায়', এর জবাবও দিয়েছেন ঠাকুর। বলেছেন, 'আমায় ধর' — তা হলে অত কষ্ট হবে না এই সংসার-খেলায়। শরীর ধারণ করলে দুঃখ কষ্ট হবেই হবে। 'আমায় ধর', তা হলে দুঃখকষ্টে বিভ্রান্ত হবে না, সহনের শক্তি আসবে।

মানে হলো, মনেই তো দুঃখকষ্টের বোধ হয়। সেই মন যদি আনন্দস্বরূপে লগ্ন থাকে তবে তার বোধ হয় না, হলেও কম।

ঈশ্বর, জগৎ আর 'আমি' — এই তিনটে বস্তু। 'আমি'-টা আছে বলে জগৎবোধ, জগৎবোধে সুখদুঃখবোধ। এই 'আমি'-টা ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দিলেই দুঃখবোধ চলে গেল। এই করার প্রক্রিয়াকে বলে, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। এর একটা পথ ধরা। ঠাকুর বলেছেন, এ সময়ে কলিকালে ভক্তিযোগ সহজ — শরণাগতি যোগ। লোকের মন চঞ্চল, আয়ু কম, অন্নগত প্রাণ, তাই তাঁকে কেঁদে কেঁদে বলা — আমার মন তোমার পাদপদ্মে লগ্ন করে দাও।

একজন ভক্ত — যার কর্ম করতে ভাল লাগে তার কি হবে না?

শ্রীম — কেন হবে না? কর্ম করুক ঈশ্বরার্থে, ফল নিজে না নিয়ে। যেমন, হাজার টাকা রোজগার করলে। নিজের জন্য যা না নিলে নয় তা নেওয়া দেহধারণের জন্য। ঠাকুর বলেছিলেন, বাকী টাকায় দেবসেবা, সাধু-ভক্তসেবা, দরিদ্র নারায়ণসেবায় লাগাও। বিদ্যার সংসারে টাকা খরচা করতে বলেছিলেন। এই ভাবে খরচা করাকেই বলা হয় বিদ্যার সংসার। পরিবারের লোকদের দাবী আছে। তা এক চতুর্থাংশের মাত্র। তার ভিতর তোমার দাবী মাত্র বিশ টাকার, হাজার টাকা আয়ের মধ্যে। 'দাসী'র যা দাবী তোমারও সেই দাবী।

শ্রীম অনেকক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — তুমিও কর না বেদ মুখস্থ। নিজের আনন্দ, আবার অপরের আনন্দ। এর (গদাধরের) দেখ না, নিজেরও আনন্দ হলো, আর আমাদেরও আনন্দ দিলে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — মাঝে মাঝে একে (বুদ্ধিরামকে) এক

একটা মন্ত্র, শ্লোক মুখস্থ করিয়ে দিবে। নির্জনে ঐ সব আবৃত্তি করলে যেন তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া হচ্ছে মনে হয়। তোমাদের তো কত অবসর।

তুমি ব্যাকরণ পড়ছো কি? পড়ে ফেলো। বড় উপকার হবে। কি কি নিয়ে গেছ?

গদাধর — উপক্রমণিকা আর ব্যাকরণ কৌমুদী।

৩

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যারা ভিক্ষা করতে পারছে তাদের আর কি? তারা world (জগৎ) জয় করেছে। খাবার চিন্তা নাই। আবার অসুখ হলে কি হবে তারও চিন্তা নাই। তিন মুঠো চাল ফুটিয়ে খাওয়া।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — প্রথম অবস্থায় একটু আচার থাকে। পরে আর থাকে না। শেষে এই বাড়ি থেকে এক মুঠো ও-বাড়ি থেকে এক মুঠো — এই করে পেট ভরে।

শ্রীম (ডাক্তার বক্সীর প্রতি) — যাদের অবসর আছে, আর ঈশ্বরের দিকে মন আছে, তাদের দেখলে ঠাকুর লাফিয়ে উঠতেন। কেন? না, অবসর না থাকলে ঈশ্বরচিন্তা হতে পারে না। পাঁচ কাজে মন থাকলে একাগ্রতা হয় না। তাই ঈশ্বরচিন্তার unavoidable factor (অপরিহার্য উপাদান) — অবসর। তারপর তাঁ'তে মন। অনেকের অবসর আছে, মন নাই। কারো মন আছে, অবসর নাই। মন ও অবসর, দু'টো একসঙ্গে থাকা চাই।

তাই এ দু'টো যার আছে, তাকে দেখলে লাফিয়ে উঠতেন ঠাকুর। কত আহ্লাদ করতেন। ভাবতেন — না, এর প্রধান দু'টো জিনিস আছে। এখন ইচ্ছা করলে তাঁর চিন্তা করতে পারে।

এ দু'টো থাকলে সকলে এর advantage (সুযোগ) নেয়, সব ক্ষেত্রে তাও নয়। তবে এ দু'টো থাকলেও হয় না, যদি একজন খুব চেষ্টা করে, তবুও।

এদের (বুদ্ধিরামাদির) এ দু'টোই আছে। আবার সব ছেড়ে গিয়েছে। তারপর কেমন জায়গায় রয়েছে — দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বর এখন world-এর (জগতের) মধ্যে greatest place (সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান)। সে

স্থান যে ভাল লেগেছে — এর মানে, এদের সংস্কার আছে।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি) — আজকাল বর্ষাকাল, গাছতলায় বসো না। এদিকে বসো। ঠাকুরের ঘরের সব বারান্দায় বসা ভাল। পশ্চিমের গোল বারান্দা, উত্তরের বারান্দা, উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব, সব বারান্দায়ই ঠাকুরের স্পর্শ আছে। কত সমাধি, কত মহাভাব, কত দর্শন ঐসব স্থানে হয়ে গেছে। যেমন বারুদখানা। একটু আগুন, মানে ঈশ্বরচিন্তা হলেই দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠে। যেস্থানে যে চিন্তা হয় সেই স্থান সেই চিন্তাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। আজকাল সায়েন্সও একথা স্বীকার করছে। ন'বতেও বসলে হয় দোর বন্ধ করে। মায়ের স্থান — কত ভাব, সমাধি কত কি হয়েছে।

মা কালীর সামনা, রাধাকান্তের বারান্দা, নাটমন্দির, এ সব স্থানেই তাঁর পদরেণু রয়েছে। এঁরা সব জীবন্ত — এই সব রেণু! এদের জড়ত্ব ঘুচে গেছে। এরা conscious living atoms (চৈতন্যময় জীবন্ত পরমাণু)।

যেমন ফিন্‌কি পাথর দিয়ে লোহাতে আঘাত করলে আগুনের জন্ম হয়, তেমনি ঐসব স্থানের পরমাণুতে মনের চিন্তার পরমাণু দিয়ে আঘাত করলে চৈতন্য উৎপাদন হয়। মানুষ শিব। তার জীবভাব দূর হয় ঐসব স্থানে ধ্যানে। বড় সূক্ষ্ম জিনিস। তাই ঠাকুর ভক্তদের বলতেন ঐসব স্থানে ধ্যান করতে।

আর দিনে পড়ে ঘুমুবে লোকের ভীড় থাকলে। রাত্রে ঐ (ধ্যান) করবে। লোক আর কতক্ষণ থাকে। সন্ধ্যা হলেই দে দৌড়।

সাধুরা চাতুর্মাস্য করে কেন এক জায়গায় বসে? বর্ষায় শরীর খারাপ হতে পারে, এই জন্য।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ভিক্ষা করে দু'টি খেয়ে নিয়ে তাঁর নাম করা। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা। ইচ্ছা হয় দেখা দিবেন।

Minimum qualifications (সব চাইতে অল্প সাধন) এই দু'টি — ভিক্ষালব্ধ অন্ন, আর তা' দিয়ে উদরপূরণ। এ দু'টি চাই-ই।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ধ্যান কি শুধু চোখ বুজে হয়? চোখ চেয়েও হয়। নির্জন স্থানে গেলে চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। সাধুদের পক্ষে

এই দুই প্রকারেই ধ্যান হতে পারে। অন্য লোকের পক্ষে চোখ বুজে ধ্যান। কত দিকে তাদের মন যাচ্ছে।

সাধুসঙ্গ করা কেন? না, তবেই বোঝা যায় difference (প্রভেদ)। সাধু আছে ঈশ্বরকে নিয়ে, অন্য লোক আছে বিষয় নিয়ে, সংসার নিয়ে। সাধুসঙ্গ করলে, one can mark the difference between a sadhu and a worldly man. A world of difference between these two men. (বুঝতে পারা যায় কত তফাৎ সাধু আর সংসারীতে — বোঝা যায় আকাশ পাতাল তফাৎ)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অন্য লোক কি করছে? তীর্থে যায়, আবার এসে যা করছিল তাই করছে — থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়, এই করছে।

কিন্তু যার গুরুকৃপা লাভ হয়েছে সে যদি তীর্থে যায়, খুঁটে খুঁটে সব দেখে। এঁরা এমন একটি জিনিস চোখে লাগিয়ে দেন যে সব ভাল লাগে।

বড় অমূল্য — তাঁর ইচ্ছাতেই তো আমরা সংসারে পড়ে আছি।

শ্রীম — হাঁ। কিন্তু ঠাকুর একটা কথা বলেছিলেন একজন এই কথা বলায় — হাঁ, তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা সংসারে পড়ে আছি। কিন্তু তোমার ডেঁপোমী করে কাজ নেই। বলেছিলেন, প্রার্থনা কর তাঁর কাছে কি করে এ থেকে বের হতে পার। প্রার্থনা চাই। চেষ্টা ও প্রার্থনা, এই দুই-ই চাই।

৪

মর্টন স্কুল। শ্রীম-র চারতলার কক্ষ। সন্ধ্যা হয় হয়। তিনি বিছানায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। খুব পরিশ্রান্ত। কথামৃত ছাপা চলিতেছে।

বর্ধমান হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে শ্রীম-র ঘরে লইয়া গেলেন। তারপর আসিলেন একজন সাধু। তাঁহাকেও শ্রীম-র ঘরে লইয়া গেলেন।

ছোট অমূল্য অসুস্থ। সিটি কলেজের পিছনে তিনি থাকেন। দুইদিন ভক্তসভায় আসিতে পারেন নাই। শ্রীম তাঁহাকে খুব ভালবাসেন। বলেন, ইনি সত্ত্বগুণী ভক্ত। শ্রীম এজন্য চিন্তিত। তাই অন্তেবাসীকে পাঠাইলেন

তাঁহার সংবাদ লইতে। সঙ্গে গেলেন গদাধর।

রাত্রি আটটা। গুমট গরম। শ্রীম আসিয়া চারতলার ছাদে বসিয়াছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে নিত্যকার ভক্তবৃন্দ বেঞ্চে উপবিষ্ট। কথাবার্তা হইতেছে।

বড় জিতেন — দুঃখে মানুষ সব ভুলে যায়, দারুণ দুঃখে।

শ্রীম — কিছুতেই কিছু বলবার উপায় নাই — তিনি দুঃখ দিচ্ছেন। বেদ বলছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই কথাই ঠাকুরও বলছেন, দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — জীবজন্তু, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এই বিশ্বজগৎ। যদি তাই হয়, তা হলে কি করে বলা যায়, তিনি দুঃখ দিচ্ছেন? বরং বলুন, তিনিই তাঁকে নিজেকে, দুঃখ দিচ্ছেন। আবার কখনও সুখও দিচ্ছেন।

অহংকার মাঝখানে খাড়া হয়ে আছে বলেই তো এই সব সুখ দুঃখ। তা না হলে সব সুখ সচ্চিদানন্দ।

আবার বলেছেন, এটা যায় না, জীবের এই অহংকার। তাই উপায় বলেছেন, আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে থাক। তা হলে দুঃখ, দুঃখ বলে অত বোধ হবে না। বলেছেন, অহংকারটাকে আমার কাছে বন্ধক দাও। যেমন সংসারী লোক নিজের পুত্র মিত্রের কাছে নিজেদের বন্ধক দেয় মোহে। বলেছেন, ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর দাস, তাঁর সখা হয়ে থাক।

বড় জিতেন — পারি কই আমরা নিতে এই কথা।

শ্রীম — তা কি একদিনে হয়? চেষ্টা চাই। তাই ঠাকুর বলেছেন, সাধুসঙ্গ কর। কেরমে (ক্রমে) বুঝবে। ঠাকুরের কথা না নিতে পারাই সব চাইতে বড় দুঃখ। অন্নবস্ত্রের কষ্ট আর কি কষ্ট! বড় কষ্ট এরই ভিতর হলো অজ্ঞান। অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছেন, আমরা তাঁর দাস, পুত্র — এ বোধ না থাকা।

তাই বিপদ রেখেছেন তিনি। জন্ম জন্ম বিপদের ভিতর ফেলে দারুণ কশাঘাতে এই জ্ঞান আসে। তখন আর দুঃখকে দুঃখ বলে না। বলে, তাঁর প্রসাদ। বুঝতে পেরেছে, দুঃখের অগ্নিতে চিত্ত শুদ্ধ করছেন। তবে তাতে তাঁর ছাপ পড়বে। তখন সর্বদুঃখের নিবৃত্তি। 'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।'

মহামায়ার সঙ্গে চালাকি! তা হলে দুঃখ বাড়তেই যাবে। তিনি আছেন। তাঁর কাছে শরণাগত হওয়া, গুরুবাক্য বিশ্বাস করে।

তাই তিনি বারে বারে মানুষ হয়ে এসে এই একই কথা বলে গেছেন। বলেছেন 'আমায় ধর'। তা হলে দুঃখ অত কাতর করতে পারবে না এই সংসারে। আবার মুক্তি পাবে। আর জন্মমরণ চক্রে পড়তে হবে না।

বড় জিতেন — কি জানি মশায়। অত পারা যাচ্ছে না। এখানে আসি। আপনি করে দিন।

শ্রীম (রহস্যের সুরে) — হাঁ, মশায় করে দিন (হাস্য)। কাজের কথা বললে বন্ধু বেজার। (সহাস্যে) 'করে দিন'। তা যদি চাও তবে শরণাগত হও।

আজ বেগুনটা ভেজে দাও, কাল পটলের ঝোল করে দিও — এও চাই, আবার ও-ও — তা হলে হয় কি করে? হয়, প্রাণ থেকে যদি বল, সবটা প্রাণ দিয়ে, ও (ঈশ্বর) চাই-ই, আর এও (ভোগ) ছাড়তে পারছি না। কেঁদে কেঁদে বল শিশুর মত। তবে হয়।

একজন ভক্ত — জল পড়ছে।

শ্রীম — এ আর বলতে হবে না। আপনিই উঠে পড়বে সব।

রাত্রি নয়টা।

কলিকাতা, ৭ শঙ্কর ঘোষ লেন।
৩রা জুলাই ১৯২৫ খ্রীঃ। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা দ্বাদশী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরদা তুললে সব চুপ — মান্দালের ভক্ত

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শনিবার বলিয়া ভক্তগণ বেলা দুইটা হইতে আসিতেছেন অফিসের ফেরৎ। অন্তেবাসী ছাদে ও সিঁড়ির ঘরে বসিয়া ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। পাঁচটার সময় শ্রীম স্বীয় কক্ষের দরজা খুলিয়া অন্তেবাসীকে বলিলেন ভক্তদের লইয়া ভিতরে যাইতে।

শ্রীম বৃদ্ধ। কথামৃত তিনটা প্রেসে ছাপা হইতেছে। তাহার প্রুফ দেখা। আবার স্কুলের কাজও তদারক করিতে হইতেছে। তাই আজ অতিশয় ক্লান্ত। এখন কথা কহিবার শক্তি নাই, ইচ্ছা থাকিলেও। তাই কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন।

শ্রীম বিছানায় উপবিষ্ট পশ্চিমাস্য। তাঁহার বাম হস্তে বেঞ্চে বসা রেক্টার মুকুন্দবিহারী সাহা, ভোলানাথ মুখার্জী ও ললিত রায়। একটু পর স্টুডেন্টস্ হোমের কয়েকজন বিদ্যার্থী আসিল।

একজন ভক্ত কথামৃত পাঠ করিতেছেন — চতুর্থ ভাগ, দ্বাবিংশ খণ্ড। সকলে চুপ করিয়া শুনিতেছেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম দুই একটি কথা কহিতে কহিতে উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন, চেয়ারে দক্ষিণাস্য। সন্ধ্যার একটু বাকী। কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এই যে লোকের লক্ষণ বলিলেন, তা কি ওদের নিন্দে করলেন? তা নয়। মাত্র সাবধান করলেন। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। জোর করে বদলান যায় না। সময়ে হয়।

তাই সংসারে দশজনের সঙ্গে থাকতে গেলে এসবের দরকার। প্রকৃতি জানা থাকলে গোলমাল কম হয়। আগে থেকে সাবধান হওয়া যায়।

তিনি কার নিন্দে করবেন? তিনি যে দেখছেন, মা-ই সব হয়ে

রয়েছেন। ভক্তদের যাতে কল্যাণ হয় তাই ভাবছেন। এদের দিয়ে বড় কাজ করাবেন কিনা! সেটি হলো, জগতের শিক্ষা।

তাই নানা রকমে রক্ষা করছেন, পাখী যেমন বাচ্চাদের রক্ষা করে। প্রকৃতি জানা থাকলে charitable view (উদার দৃষ্টি) আনা সহজ। তাতে ঝগড়া কম হয়। আর অপাত্রে উপদেশ হয় না। দোষে গুণে মানুষ, এটা জানা থাকলে সংঘর্ষ কম হয় আর সহানুভূতি থাকে। বেশী বিরূপ প্রকৃতি হলে বলেছেন, দূর থেকে প্রণাম করবে। এ সবই শিক্ষার জন্য।

আবার নীলকণ্ঠের প্রশংসা করলেন। কেন? না, তাঁকে দিয়ে লোকশিক্ষার কাজ হচ্ছে। তাঁর ভক্তি শুনে অপরের ভক্তিলাভ হবে।

আর হাজরার যা দোষ, তা ভক্তদের দেখিয়ে দিলেন। তা হলে কলহ, বৃথা তর্ক হবে না।

(সহাস্যে) হাজরা ব্যাখ্যা করলেন, তত্ত্বজ্ঞান মানে, চব্বিশ তত্ত্বের জ্ঞান। ঠাকুর বললেন, না। 'তৎ' মানে ব্রহ্ম, 'ত্বং' মানে জীব। ব্রহ্ম আর জীব বস্তুতঃ এক — 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরং'। জীবব্রহ্মের একত্বজ্ঞানকে বলে তত্ত্বজ্ঞান।

ভৃত্য হ্যারিকেন লণ্ঠন সিঁড়ির উপর রাখিয়া গেল। আলো দেখিয়া শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া হাততালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিতেছেন। তারপর ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন — জগবন্ধু ছোট জিতেন, বলাই, শান্তি, গদাধর, বুদ্ধিরাম, কীর্তনীয়া প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও দুর্গাপদ মিত্র।

ব্রহ্মদেশ হইতে একজন বাঙ্গালী ভক্ত অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। তিনি মান্দালে থাকেন। তাঁহার অনেকগুলি প্রশ্ন আছে। তিনি অবসর খুঁজিতেছেন। ইনি বেলুড় মঠেও গিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ভাল লোক। ঠাকুরের জীবনী ও বাণী ইদানীং পড়িতেছেন। শ্রীম-র ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মান্দালের ভক্ত — ঠাকুর তীর্থ কতদূর করেছেন?

শ্রীম — কাশী আর বৃন্দাবন। রাস্তায় বৈদ্যনাথ দর্শন করেছিলেন।

ভক্ত — পুরীতে যান নাই?

শ্রীম — না। বলতেন, ওখানে গেলে শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। পূর্ববারের অনেক স্মৃতি রয়েছে কিনা ওখানে, চৈতন্য অবতারের! সেই সব স্মরণ হলে সমাধিতে শরীর চলে যাবে। তাই যেতেন না। বলেছিলেন, আমি আর গৌর এক। বলতেন, এই যে লোক 'গৌর গৌর' বলে আমি সেই গৌর। চৈতন্যদেবের পূর্বের নাম গৌরাঙ্গ ছিল কিনা।

কিন্তু ভক্তদের পুরী পাঠিয়ে দিতেন। বলে দিতেন, চৈতন্যদেবের সব স্থান দেখবে — গম্ভীরা, হরিদাসের সাধনস্থল, সিদ্ধ বকুল, সার্বভৌমের বাড়ি, রায় রামানন্দের বাড়ি প্রভৃতি। বলে দিয়েছিলেন, সমুদ্র দর্শন করবে — দর্শন ও স্নান করবে। 'সরসামস্মি সাগরঃ' কিনা! (গীতা ১০:২৪)। টোটা গোপীনাথ, গুণ্ডিচা মন্দির, আলালনাথ, এ সবও দর্শন করতে বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে।

বলে দিছলেন, অনেক টাকা পয়সা নিয়ে যাবে। বিদেশ আর তীর্থ তাই। এখন কি করে আলিঙ্গন হয়? পাণ্ডারা ছুঁতে দেয় না। শুনেছি, পয়সা দিলে নাকি হয়ও। ভাবছি কি করে হয়। ঠাকুর বলে দিছলেন, বিশেষ করে আলিঙ্গন করতেই হবে। মন্দিরে বহু যাত্রী। পাণ্ডারা ব্যস্ত। শোঁ করে বেদীতে উঠে আলিঙ্গন করে নিলাম। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সঙ্গে অনেক টাকা পয়সা কাপড়ে করে নিয়েছিলাম। সেই সব ছড়িয়ে দিলাম। পাণ্ডারা ঐ সব কুড়োতে লেগে গেল। এই ফাঁকে আমি বের হয়ে এলাম (হাস্য)। এই একটি adventure (দুঃসাহসিক কার্য) হয়েছিল।

গয়াতেও যান নাই ঠাকুর। ওখান থেকে এয়েছিলেন কিনা। বলতেন, গয়াতে গেলেও শরীর থাকবে না।

ভক্ত — আমরা গম্ভীরায় চৈতন্যদেবের খড়ম ও কাঁথা দেখলাম।

শ্রীম — কেউ কেউ বলে, এ খড়ম প্রথম মহন্তের। ওটা একটা মঠ। নাম রাধাকান্ত মঠ। মতভেদ আছে খড়ম নিয়ে। এই সবই ছিল কি না, তার সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। তবে জায়গা যে ঐ, তার সম্বন্ধে ভুল নেই। বিশ বছর ছিলেন ঐখানে।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তীর্থদর্শনের কথায় ঠাকুর রহস্য করে

বলতেন, হাজরা অনেক তীর্থ করেছে। অনেক উঁচুতে উঠেছে। ঐসঙ্গে একটি ফোড়ন দিতেন। বলতেন, চিল শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে; কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের দিকে (হাস্য)। হিমালয় অনেক উঁচু কিনা। অনেকে যায় ঐখানে তীর্থে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — হাজরা কত ভালবাসতেন। কত বছর ছিলেন ঠাকুরের কাছে। শেষটায় বেশ গেছেন। 'এই তাঁর (ঠাকুরের) রূপ দেখছি' — বলতে বলতে দেহ গেল। লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে, ঠাকুর বলতেন।

আমরা কামারপুকুর গিছলাম, ঠাকুরের দেশে। হাজরার ছেলেদের কোলে করেছিলাম ওখানে। ফিরে এসে ঠাকুরকে একথা বলায়, ঠাকুর বললেন হাজরাকে, এরা তোমার ছেলেকে কোলে করেছে।

কেমন একটা ভাব হয়ে গিছলো ওঁর কাছে এতকাল ছিলেন বলে। বেশ ছিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার গোলমাল করতেন, তর্ক ফর্ক। ঠাকুর বলতেন তখন, হাজরার একটা রোগ আছে।

(সহাস্যে) আজ এই বই (কথামৃত) পড়া হলো, ব্রাহ্মণ নইলে মুক্তি হয় না। ঠাকুর প্রতিবাদ করে বলতেন, তা কেন, ভক্তি হলেই মুক্তি হয়। শবরী, রুহিদাসের হয়েছিল।

এইরূপ উল্টাপাল্টা কথা কইতেন। তবুও ঠাকুর ভালবাসতেন।

মান্দালের ভক্ত — 'কথামৃতে' দেখতে পাই, 'মণি' বলে একজন ভক্ত ছিলেন। মনে হয় তিনি উচ্চকোটির ভক্ত ছিলেন। আর ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তান ছিলেন। শেষটায় তাঁর কিরূপ কাটলো? (শ্রীম ও ভক্তদের হাস্য)।

শ্রীম (নয়ন হাস্যে) — ওঁর শেষটা কিভাবে যাবে তা এখনও বলা যায় না।

ক্ষণকাল শ্রীম নীরব। 'মণি' শ্রীম নিজে। তাই এ কথা চাপা দিলেন আর পুনরায় হাজরার কথা উত্থাপন করিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — হাজরা কি কম লোক ছিল গা! তাঁর কাছে অত বছর ছিল।

শ্রীম (মান্দালের ভক্তের প্রতি) — আপনার ওদেশে কত বছর

হলো? ওখানে বুঝি আর মন টেঁকছে না? এখন বাংলাদেশের দিকে সকলের টান পড়েছে। অন্যখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

মান্দালের ভক্ত — ওদেশে দশ বছর হলো। আজ্ঞে হাঁ, মন আর টিঁকছে না। কিন্তু করি কি — পেটের দায়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে।

শ্রীম — আমি একবার হরিদ্বার, কনখল, ঋষিকেশে গিছলাম। মাসছয়েক ছিলাম। আর মন টিঁকছে না। প্রথম প্রথম ওখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। হিমালয়, বন, গঙ্গা আর প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। ওখানে যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কত অসংখ্য ঋষি মুনি ভক্তরা ওখানে ব্রহ্মদর্শন করেছেন। কেহ দর্শনের জন্য ব্যাকুল। কেহ বা ঐ চেষ্টায় শরীর ত্যাগ করেছেন। এই সব রয়েছে কিনা ঐ সব স্থানে। অনন্তকালের সঞ্চিত পরমার্থ ধন সব।

এত মুগ্ধ হয়ে গিছলাম যে আর সব ভুল হয়ে গিছলো। বন্ধুদের চিঠি লিখতাম —অমন সব সৌন্দর্যের খনি ছেড়ে মানুষ কি করে অন্যত্র থাকছে? প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য কেন তারা ভোগ করছে না? এমনি করে মাস ছয়েক গেল এই উদ্দীপনায়। ওমা! তারপর দেখছি মন আর টেঁকছে না। এখানকার কথা মনে হতে লাগলো। সেই গঙ্গা, সেই দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুরের লীলাভূমি! এইসব কথা মনে হতে লাগলো। সহস্র স্মৃতি এসে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল মনকে। এমনি সব কাণ্ড! কতক দিন বেশ লাগে। তারপর আর ভাল লাগে না।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (মান্দালের ভক্তের প্রতি) — আপনাকে এবার টেনেছেন। তাইতো মন অমন হচ্ছে।

মান্দালের ভক্ত — কোন কাগজে পড়লাম, স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুরের কথা হচ্ছিল গিরীশবাবুর সম্বন্ধে। গিরীশবাবুকে ঠাকুর 'রসুনের বাটি' বলেছেন। আর বেশী খেতে মানা করেছেন।

শ্রীম — হাঁ। 'রসুনেরর বাটি' এই কথাটা শুনে মানুষ একেবারে হতাশ হয়ে যায়। কিন্তু যেই আর একটি কথা শোনে অমনি আশা হয়। বলেছেন, 'জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়ে নিলে আর রসুনের গন্ধ থাকে না।' তাই

আমরা হেডিং দিয়েছি — 'Message of hope for so-called sinners' (তথাকথিত পাপীদের জন্য আশার বাণী)।

মান্দালের ভক্ত — জ্ঞানাগ্নি কি?

শ্রীম — ঈশ্বরচিন্তা — the fire of Baptism (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা) ওরা (খ্রীস্টানরা) বলে।

কথাটা হচ্ছে, অমৃতসাগরে পড়া। তা এমনিই পড়ুক, অথবা অন্য কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিক্, একই ফল — অমর।

গীতায় আছে, 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি' (আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দিব) (গীতা ১৮:৬৬)। এ কথাটি কেবল অর্জুনকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ? না। সমস্ত humanity-কে (মনুষ্য সমাজকে) বলেছেন। অবতার কথা কন সমগ্র humanity-র (মনুষ্য জাতির) জন্য। অবশ্য যখন বলেন, তখনকার একটা appropriateness (উপযুক্ততা) থাকে। তা' হলেও সমস্ত লোকের জন্য এই কথা বলেছেন। এই যে শ্রীকৃষ্ণের কথাটি, তা কি আর আমরা এখন নিচ্ছি না?

মান্দালের ভক্ত —আচ্ছা, ঠাকুর বলেছেন, এখানে এলে গেলেই হবে! এর মানে কি?

শ্রীম — 'এখানে'র বিশেষ মানে, ঠাকুরের কাছে। ব্যাপক মানে, ঈশ্বরের কাছে। ঠাকুর নররূপী ঈশ্বর। নররূপটা চলে গেছে। ঈশ্বররূপে কি তিনি নেই? তিনি সর্বদাই আছেন। তাঁর কথা কি শুধু কয়েকজনের জন্য? সমস্ত world-এর (জগতের) লোকের জন্য — present and future generations-এর (ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জনসমাজের) জন্য, for all time to come.

মান্দালের ভক্ত — তিনি বুঝি এগার জনকে সন্ন্যাস দিয়েছেন?

শ্রীম — তিনি সন্ন্যাস দেন নাই কারুকে। তবে ভিতর ফাঁক করে দিয়েছিলেন সবাইকে — যাঁরা তাঁর আশ্রয়ে এসেছিলেন।

বুড়ো গোপাল একদিন ওদের গেরুয়া পরিয়ে এনে ঠাকুরকে নমস্কার করালেন। তিনি ওতে protest (আপত্তি) করলেন না। এসব পরে স্বামীজী করেছেন। সঙ্ঘ করতে হলে এসব চাই।

মান্দালের ভক্ত — আচ্ছা, ঐ রকম ক'জনকে?

শ্রীম — তখন সকলেই বাড়ি থেকে আনাগোনা করতো। তখনও মঠ হয় নাই। তিনি এমন জিনিস দিয়েছিলেন, যা সন্ন্যাস থেকেও বেশী।

মান্দালের ভক্ত — আচ্ছা, যারা সংসারী তাদের কি কি কাজ করতে বলতেন?

শ্রীম — সাধুসঙ্গ করতে বলতেন।

২

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (মান্দালের ভক্তের প্রতি) — আবার দেখবেন, যে সব সাধু সংসারীদের ঘেন্না করে ওরা শেষে ভাল হবে। যারা সংসারীদের সঙ্গে বেশী মিশে তাদের বড় সুবিধা হয় না।

অবশ্য advanced stage (উন্নত অবস্থা) একটা আছে। সিদ্ধ হলে সর্বভূতে তাঁকে দেখে। তখন কা'কে ছাড়বে?

মনে কর, একজন যদি lower ideal-এর (নিম্ন আদর্শের) লোকের সঙ্গে থাকে, তা হলে তার ideal (আদর্শ) lower (নিম্নগামী) হয়ে যাবে না? সংসর্গজাত দোষ! তেমনি ঐ। No compromise (কোন আপস নয়)। Compromise (আপস) করলে চলবে না। নীচু হয়ে যাবে।

একজন ভক্ত (স্বগত) — আচার্যের কাজ অতি কঠিন। ভক্তকে বললেন সাধুসঙ্গ করতে। আবার সাবধান করছেন, তাঁর নিজের ভালর জন্য সাধুকে টেনে নীচে না নামানো হয়।

শ্রীম (মান্দালের ভক্তের প্রতি) — আবার মুড়ি মিছরীর একদর না হয়। গুরু শিষ্যকে তাই বলেছিলেন। একজন শিষ্য তীর্থভ্রমণে যাবে। গুরু শিষ্যকে বললেন, যেখানে দেখবে মুড়ি মিছরীর একদর সেখানে থাকবে না। শিষ্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একস্থানে এসেছে। সেখানে মুড়িরও যে দাম, মিছরীরও সেই দাম। সবই সস্তা। সে সেখানে থেকে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

এখন ঐ দেশের রাজার কালীবাড়িতে নরবলি হবে বলে একজন

হৃষ্টপুষ্ট লোকের দরকার। শিষ্যকে ধরে নিয়ে এলো। সে গুরুর নিষেধবাক্য শুনে নাই বলে কাঁদছে।

গুরুও দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। অনেক লোক জমা হয়েছে দেখে সেই বলির স্থানে গেল। দেখে, শিষ্য কাঁদছে তাকে বলি দিবে ভয়ে। গুরুকে দেখতে পেয়ে আরও জোরে কাঁদছে। গুরু তখন রাজ-কর্মচারীদের বললো, এ বলি অশাস্ত্রীয়। এই নরপশুর শরীরে ঘা রয়েছে। ঘা আছে দেখে, তখন তাকে ছেড়ে দেয়।

এমনি কাণ্ড! গুরুবাক্য না শুনলে এই দশা।

তাই সাধুকে মান দিতে হয়, সেবা করতে হয়!

মান্দালের ভক্ত বিদায়োন্মুখ। বড় জিতেনের প্রবেশ।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আসুন, আসুন। মুড়ি মিছরীর একদরের কথা হচ্ছে।

বড় জিতেন (সবিস্ময়ে) — সে কি! অমন দুর্ভাগ্যের কথা কেন?

শ্রীম — না। এঁকে এই গল্পটি বললাম।

মান্দালের ভক্ত প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। প্রসঙ্গ অব্যাহত।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — সবই তাঁর মহামায়া। তাঁর সঙ্গে চালাকী! যদি পরদা একটু তুলে ধরেন, তা হলে কি করে লোক? আগে কথা কচ্ছিল। এখন সব ছেড়ে এমনি করে (অভিনয় করিয়া) হাঁ করে আছে।

যেমন থিয়েটারে করে তেমনি ভগবানদর্শন হলে সব ছেড়ে যায় আপনি। অবাক হয়ে যায় লোক — আনন্দে ভরপুর!

শ্রীম অন্তর্মুখ। একটু পর আপন মনে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত) — এসবের absolute value (পারমার্থিক মূল্য) কি আছে? কিছু না। এই যে আশুবাবু, কি (সি. আর) দাশ মশায় যা করে গেলেন, কি value (মূল্য) আছে এসবের with reference to the Absolute (পরমাত্মা সম্পর্কে)?

আমরা lower plane-এ (নিম্নভূমিতে) রয়েছি বলে বলছি, খুব value (মূল্য)। তা নইলে absolute value (পারমার্থিক মূল্য) কিছুই নেই।

যেমন ঘুমন্ত ছেলে। রেতে (রাত্রিতে) মা খাইয়ে দিলে খেলে। কিন্তু সকালে বলতে পারছে না। Mechanically (যন্ত্রচালিতবৎ) খাচ্ছে। সকালে সব ভুলে গেছে। আমরা যে এসব করছি ঠিক অমনি।

ঘুম যেমন বালকের normal state (স্বাভাবিক অবস্থা), তেমনি সমাধিও যোগীর normal state স্বাভাবিক অবস্থা)। গীতায় আছে, 'তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন।' (৬:৪৬) (অতএব যোগী হও)। অর্জুন যোগী।

শ্রীম-র নৈশ ভোজন আসিয়াছে। তিনি উঠিয়া গেলেন। আধ ঘন্টা পর ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন রাত্রি পৌনে দশটা। ছিন্ন পূর্বপ্রসঙ্গের সংযোজনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমরা যা করছি, সব relative plane-এ (সংসার ভূমিকায়) কাজ করছি — এই ঘর সংসার।

Absolute-কে (পরমাত্মাকে) এ দিয়ে পাওয়া যায় না। এর value (মূল্য) খুব কম। কিছুই না।

তবে যদি বড়ঘরের দাসীর মত করে কেউ, তবে হয়। ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা। নিজেকে অকর্তা জেনে কর্তার মত করা। তখন এসব relative value-র সাংসারিক অল্প মূল্যের কাজই absolute-কে (পরমেশ্বরকে) পাবার সাধনরূপে পরিণত হয়। বিষ তখন অমৃতের কাজ করে।

এই পরিবার সেবা করেই ঈশ্বরলাভ হতে পারে, যদি নিষ্কাম ভাবে করা যায়। তাঁর সেবা করা যাচ্ছে এইসব পরিজনের ভিতর দিয়ে, এই ভাব।

দেশসেবাতেও মুক্তিলাভ হতে পারে। সমাজের সেবাতেও হবে যদি ঈশ্বরের সেবা করা যাচ্ছে, এই বুদ্ধি নিয়ে করা যায়। কিন্তু বড় কঠিন।

মহামায়া তা করতে দেন না। ভেলকী লাগিয়ে দেন। কোথা থেকে একটা false (মিথ্যা) অহংকার এসে সব ঢেকে দেয়, যেমন কুয়াশায় সব ঢেকে দেয়।

এই উজ্জ্বল সূর্য কিরণ দেখা যাচ্ছিল। কোত্থেকে কুয়াশা এসে সব অন্ধকার করে দিলে। তাইতো ঠাকুর সর্বদা সাধুসঙ্গ করতে বলছেন।

সাধুদের কাছে উজ্জ্বল সূর্যালোক। তার advantage (সুযোগ)

নিয়ে চললে হয়। তাও হতে দেয় কোথায়? সবের একদর মনে করে। সাধু অসাধু সব এক — all men are equal. তা হলে চলবে কি করে?

তাই ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না — মুগ্ধ করো না মা।' এমনি কাণ্ড!

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — প্রার্থনা করতে হয়, প্রভো, আমার যেন সৎসঙ্গ লাভ হয়। আর সৎসঙ্গ যেন চিনতে পারি, যেন শ্রদ্ধা হয়।

সৎসঙ্গও লাভ হতে পারে। কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে, ঐ একদর করে ফেলে — যেমন মুড়ি মিছরীর একদর করে।

তবে এখন অবতার এসেছেন। বড্ড chance (সুযোগ)। বলেছিলেন, এখন ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল। হাওয়া বাতাসে সর্বত্র ঠাকুরের ভাব ছড়িয়ে আছে। তখনকার ভক্তরা সব বেঁচে আছেন। তারপর মঠ করে দিয়েছেন।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই জেনে সংসার করা, এই সবের absolute value (পারমার্থিক মূল্য) নেই, যে যত বড় কাজই কর। এতে টাকা কড়ি, হদ্দ নাম যশ হতে পারে। এর বেশী না। যদি এর বেশী পেতে চাও, eternal wealth (অক্ষয় ধন) লাভ করতে চাও, তবে ঐ ঠাকুরের prescription (ব্যবস্থা) নিতে হয়।

সাধুসঙ্গ কর। সাধুসেবা কর। চৈতন্য ঠিক থাকবে। অর্থাৎ যোগী হয়ে থাক সংসারে।

আবার যোগীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি সর্বদা তাঁকেই দেখতে চেষ্টা করেন সকলের ভিতর। তাই তাঁরই সেবা করে। তা গৃহেই থাকুক, কি সন্ন্যাসীই হেকে।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (গীতা ৬:৪৭)

রাত্রি দশটা।

পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতির ভবন, ৭ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা।
৪ঠা জুলাই, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ২০শে আষাঢ়, ১৩৩২ সাল। শনিবার, জ্যৈষ্ঠা শুক্লা ত্রয়োদশী ৪।১ পল।

সপ্তম অধ্যায়

মনের ক্ষতিপূরণ হয় সর্বস্ব ত্যাগে

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম জোড়া বেঞ্চে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য, ছাদের পূর্ব ধারে। সম্মুখে অপর বেঞ্চে বসা সুরেন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারী। আর প্রফুল্লবাবু। ইনি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলের অধ্যাপক। উভয়েই ঠাকুরের ভক্ত। পূর্ববঙ্গে ঠাকুরের ভাব বেশী প্রচার হইয়াছে, এই সব কথা হইতেছে।

ভক্তগণ একে একে আসিয়া একত্রিত হইতেছেন। শচী, হরিপদ, পাত্র, গদাধর, বুদ্ধিরাম, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। একজন কীর্তনীয়া কিছুদিন হইতে আসা-যাওয়া করেন। তিনিও আসিয়াছেন।

আজ ৫ই জুলাই ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ২১শে আষাঢ় ১৩৩২ সাল, রবিবার, পূর্ণিমা।

কথামৃত ছাপা হইতেছে। প্রুফ আসিয়াছে ছাপাখানা হইতে। শ্রীম একজন ভক্তকে উহা পড়িতে বলিলেন। ভক্তগণ শুনিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন।

পাঠক (শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন) — (তোমার) অন্তরে সোনা আছে। এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও অন্য কাজ কমে যাবে। ... আরও এগিয়ে যাও।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিন্তু বিদ্যাসাগারমশায় ধরতে পারলেন না কথাটা। ঠাকুরের কিন্তু ইচ্ছা হয়েছিল, ওঁকে তুলে দেন। ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বর যেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরমশায় যাবেন বলেওছিলেন। কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই।

গেলে হয়তো মাটির চাপ সরিয়ে দিতেন। তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন কিনা। কত দয়া তাঁর! এই দয়া দেখেই তো নিজে আগ্রহ করে

গেলেন। বলতেন, দয়া সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য। উত্তম লক্ষণ। দৈবী গুণ। গেলে হয়তো এই জন্মেই দর্শন হতো। মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন, তা হয়ে যেতো।

(সহাস্যে) বিদ্যাসাগরমশায় দক্ষিণেশ্বর যান নাই বলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভক্তদের বলেছিলেন, এ কেমন তোমার বিদ্যাসাগর? কথা দিয়ে কথা রাখে না। কথার ঠিক নাই। বললো যাব, কিন্তু আসে নাই।

একজন ভক্ত — আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয়।

শ্রীম — কি করা যায়! সময় না হলে হয় না। সুযোগ সুবিধা হলেও ইচ্ছা হয় না। মানুষের দোষ নাই। সংস্কার প্রবল। এদিকে বড় হলেই ওদিকেও বড় হবে অমন নিয়ম নাই। তাঁর মায়াতেই মানুষকে নানাভাবে নিযুক্ত করে। যদি যেতেন তা হলে হয়তো বিদ্যাসাগরমশায়ের জীবন শেষটায় অন্যরূপ হতো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দয়া, পরোপকার ভাল। তার চাইতেও ভাল সেবা — ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা। এ কথাটাই বলতে ঠাকুর গিছলেন বিদ্যাসাগরমশায়ের কাছে। বললেও কিছু কাজ হলো না।

পরোপকার করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে। তখন সেবা করবার ভাবটি জাগ্রত হয়। ঐ একই কাজ করা, ভাব মাত্র বদল হয়। সেবায় চিত্ত নির্মল হয়, নিজেকে অকর্তা আর ঈশ্বর কর্তা বলে বোধ হয়। এরই নাম চিত্তশুদ্ধি। তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি। তারপর দর্শন।

নিজের উপার্জন নিজে ভোগ করার চাইতে দয়ার দান বড়। তার চাইতে বড় সেবা। সেখানে ভগবান বাঁধা পড়েন। জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়। গানে আছে, 'আমার ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোক জয়ী। ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে নন্দের বাধা মাথায় বই॥'

ডাক্তার বক্সী, অমৃত, সুখেন্দু, বলাই প্রভৃতির প্রবেশ।

একজন ভক্ত — বেলুড় মঠে সেইদিন শুনেছি, মহাপুরুষ মহারাজকে ঠাকুর প্রথম দিনেই দেখে চিনতে পেরেছিলেন, আপনার লোক। আর মায়ের মত গ্রহণ করেন।

শ্রীম — আপনার ছেলেকে মা চিনতে পারে পঞ্চাশ বছর পর দেখলেও। ঠাকুর চিনেছিলেন এতে আর আশ্চর্য কি? আপনার লোক যে!

কথায় বলে, রাজহস্তী যাকে শুঁড়ে করে তুলে পিঠে বসায় সে-ই হয় রাজা। তেমনি এই মহাপুরুষ। তিনি কখনও চান নাই এসব পদ। কিন্তু সকলে মিলে করে দিল প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের।

বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সংসার করা হয় নাই। ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির অফিসে কর্ম নিয়েছিলেন, সামান্য বেতন। কেন নিলেন এ কর্ম? না, তা হলে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত চলতে পারবে। বরাবর শিবানন্দ মহারাজের বৈরাগ্য আর তপস্যাটি ছিল। খুব সাধারণ ভাবে থাকতেন।

এসব দেখে কি শিক্ষা লাভ হয়? না, মানুষের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ। ভগবানের দৃষ্টি বিশাল। বেদে আছে 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং করোমি'। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বড় হোক, তাকেই বড় করেন। (চন্ডী - দেবীসূক্ত)

ভক্তরা অনেকেই বিদায় লইয়াছেন। শ্রীমও নৈশ ভোজনের জন্য তিনতলায় নামিয়া গেলেন। আহারান্তে শ্রীম ছাদে আসিয়া বসিয়াছেন। ভক্তরা কেহ কেহ বসিয়া আছেন। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু কিরণজাল মেঘের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। চন্দ্র এক একবার গাঢ় মেঘে ঢাকা পড়িতেছে। এক একবার মেঘমুক্ত হইতেছে। কখনও উৎফুল্ল, কখনও বিষণ্ণ। যেন মানুষকে বলিতেছে, ধরাধামে জীবন এইরূপ — কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। অনাবিল সুখ এখানে নাই। উহা আছে একমাত্র ভগবানের কাছে। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানে আশ্রয় গ্রহণই সেই সদাসুখের নিকটতম স্থল।

শ্রীম কিছুকাল চেয়ারে বসিয়া চন্দ্রমা ও মেঘের খেলা দেখিতেছেন। তারপর কথা কহিতেছেন।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দাশমশায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। কি ত্যাগ! বুদ্ধদেবের মত যেন রাজ্য ছেড়ে দিলেন। পূর্ব থেকেই ভিতরে ছিল এসব বীজ। নইলে হঠাৎ হয় না। শোনা যায় কীর্তনে একেবারে মেতে যেতেন। খুব ভালবাসতেন কিনা কীর্তন! আবার বেলুড় মঠে গিয়ে সাধারণ লোকের সঙ্গে উঠানে বসে প্রসাদ খাচ্ছেন। কখনও মঠে রাত্রিবাস করতেন। ভিতরে ত্যাগের ভাব না থাকলে হঠাৎ কিছু হয় না।

সংসারে পড়ে মনের যা বাজে খরচ হয়, তা পূরণ হয় সর্বস্বত্যাগে। অর্থাৎ সন্ন্যাস নিলে। সব ছেড়ে কেউ কেউ লেগে যায় আত্মদর্শনে। কেউ একটু ঘুরে চলে। দাশমশায় দেশসেবায়, নর-নারায়ণের সেবায় আত্মসমর্পণ করেছেন। এ করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলেই তাঁর দর্শন হয়।

দাশমশায়ের একটা কবিতা আছে — 'তোমার বংশীরব শোনাও।' ভিতরে এসব sublime (মহিমান্বিত) ভাব রয়েছে — ভগবান-দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। আহা, বংশীরব শুনে গোপীরা একেবারে পাগল হয়ে যেতেন।

দাশমশায় ঐ বংশীরব শুনেছিলেন। তা নইলে কি এমনভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন! যা ছিল সব কিছু ছেড়ে ভিক্ষু সাজলেন।

বড় অমূল্য — আমাদের জানা একজন বিধবা সাহায্যের জন্য গেলেন একবার। অমনি একশ' টাকার একটা নোট দিয়ে দিলেন। অসংখ্য দান ছিল, গুপ্ত দান।

শ্রীম — তা তো করবেনই। ভিতরে সন্ন্যাস ছিল। ঠাকুর পাণ্ডবদের বলতেন যোগীভোগী। দুই-ই ছিল তাদের, যোগ ও ভোগ। দাশমশায়ও তাই। যোগী ছিলেন ভিতরে।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বর কি আশ্চর্য উপায়ে কাজ করেন। কে বুঝতে পারে তা? দেখ, দাশমশায় থাকতে যা হয় নাই এই তাঁর death-এ (মৃত্যুতে) সে কাজ হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষ-টা যেন one house of mourning (একটি শোকার্ত পরিবার)। থাকতে এটি হয় নাই। তাঁর কাজ মানুষ বুঝতে পারে না।

বেলুড়ে দারুণ ম্যালেরিয়া। ওমা, হঠাৎ শুনলাম, ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সমগ্র গ্রাম acquire (সংগ্রহ) করে নিয়েছে। আর সব জঙ্গল কেটে ফেলবে। তা হলে ম্যালেরিয়া যাবে।

(বেলুড়) মঠটি তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে কিনা। সেটিকে রাখতে হবে। তাই এই সব আয়োজন। ঈশ্বরের কাজ মানুষ তাই বুঝতে পারে না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে পার্টি করা, বহু লোককে একত্র

রাখা, এসব সকলের কাজ নয়। ভিতরে অতি উচ্চ ভাব থাকলে হয়। তবে different angles of vision-কে (বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে) meet (সম্মুখীন) করা যায়। গান্ধীজী, দাশমশায়, এঁদের কম শক্তি!

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঠাকুরের ভাব আশ্চর্য। তাঁতে দেখতাম যেন সাগর, নানা নদী এসে মিশেছে। নানা ভাবের লোক আসতো। অপর লোকদের এমন ভাব কোথায়?

একজনের সঙ্গে এক চুল মতের তফাৎ হলো, আর রক্ষে নেই। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

কি ঠাকুরের ভাব! সবখানেই যাচ্ছেন, সব মতের লোকদের সঙ্গে মিশছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাচ্ছেন, খ্রীস্টান মুসলমান সকলের সঙ্গে মিশছেন।

মতের মিল না থাকলে পাশের বাড়িতে যাবে না, ভগবানের নাম হচ্ছে তবুও। অমনি আসুরিক ভাব মানুষের। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, ভগবানের জন্য সর্বত্র যাওয়া যায়।

একজন ভক্ত — intellect (বুদ্ধি) বড় — কি, emotion (ভাব) বড়?

শ্রীম — আমাদের মনে হয়, emotion-ই (ভাবই) বড়। Intellect (বুদ্ধি) দিয়ে যা না হয়, emotion-এ (ভাব দিয়ে) তা হয়। দেখ না দাশমশায়ের কাজ। মৃত্যু দিয়ে সমগ্র দেশকে এক করে গেলেন।

আবার দেখ, কি করে ব্রিটিশ diarchy (দ্বৈতশাসন) ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন। খুব অসুস্থ। কিন্তু স্ট্রেচারে করে গেলেন Council-এ (রাজ্যসভায়)। তিনি তাঁর এই প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করছেন দেখে সব বিরুদ্ধ মত এক হয়ে গেল। তার ফলে অত বড় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উড়িয়ে দিলেন। এতো সৈন্য, এতো navy (নৌবহর), অত বড় strong organisation (শক্তিশালী শাসনযন্ত্র), তাকে কেমন করে হারিয়ে দিলেন! Intellect দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে কি পারতো কেউ? যা কেউ কখনও ভাবতে পারে নাই, তাই সম্ভব হলো। Feeling, emotion-এতেই (দরদ, ভাবাবেগ দিয়েই) বড় কাজ হয় — intellect (বুদ্ধি) তা করতে পারে না।

ঠাকুর যে ভক্তদের টেনেছিলেন, সে কি বুদ্ধি দিয়ে? তা নয়। দরদ

দিয়ে, ভাব দিয়ে সকলকে কিনে ফেলেছিলেন। তার ফলে ভক্তরা প্রাণ দিয়ে তাঁর জীবন ও বাণী জনসমাজে প্রচার করলো, সকলের কল্যাণের জন্য, সুখশান্তি আনন্দের জন্য। ভাবাবেগই বড়, হৃদয়ই বড়, বুদ্ধি ছোট।

৩

মর্টন স্কুলের ছাদ। এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। নিত্যকার ভক্তগণ সম্মুখে তিনদিকে বেঞ্চে বসা।

আজ ১১ই জুলাই শনিবার, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। এখন গুমট গরম। অপরাহ্নে অফিসের ফেরৎ শনিবারের ভক্তরা চলিয়া গিয়াছেন। তখন হইতেই নিষ্কাম কর্মের কথা হইতেছে। এখনও তাহার অনুবৃত্তি চলিতেছে। এখন একটু হাওয়া চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কর্ম না করলে হয় না। জ্ঞান, ভক্তি দুর্লভ বস্তু। চেষ্টা করে তা অর্জন করতে হয়। দু'পাতা পড়ে, বা দু'টো কথা শুনেই বললে হয় না, আমি জানি। বাজনার বোল হাতে আনতে হয়, ঠাকুর বলতেন। কেবল মুখে বললে কি লাভ? কর্ম না করলে জ্ঞান হয় না। ঈশ্বরের জন্য কর্ম করা চাই।

কেন লোকের ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা হয় না? বাসনা রয়েছে যে কত মনে — ভোগবাসনা। মন থেকে এসব বের না হয়ে গেলে, কি করে মন ঐ ব্যাকুল ভাব ধারণ করে?

তাই কর্ম চাই, নিষ্কাম কর্ম। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে কর্ম করলে মন থেকে ভোগবাসনা গলে বের হয়ে আসে। তখন ব্যাকুলতা হয়।

সকাম কর্মে মন অভ্যস্ত। কিন্তু স্থায়ী শান্তিসুখ লাভ হচ্ছে না, এটা যখন বোঝে মানুষ তখন শান্তিসুখের পথ খোঁজে। শাস্ত্র আচার্যমুখে শোনে, নিষ্কাম কর্মের কথা। এদিকে রুচি নাই। সকাম কর্মেও শান্তি নাই। কি করে তখন? তখনই গুরুর সহায়তা দরকার হয়। তিনি হাতে ধরে শিখান, বলেন, সাধুসঙ্গ কর, সাধুসেবা কর। ঠাকুর বলেছিলেন, যদি উপার্জনের বাসনা থাকে, তা কর। কিন্তু ঐ অর্থ বিদ্যার সংসারে ব্যয় কর। বিদ্যার সংসার মানে, ভগবান, সাধু, দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ব্যয় কর।

একজন ভক্ত — কি কর্ম করা?

শ্রীম — প্রকৃতিতে যা আছে তাই করা নিষ্কামভাবে। একজনের হয়তো লেকচার দেবার ইচ্ছা আছে। সে তাই করুক। এই ভাব নিয়ে করুক যে আমি ঈশ্বরের কথা লোককে বলে সেবা করছি তাদের। দাসভাবে সেবকভাবে, করা। নিজে benefit (সুবিধা) বা credit (বাহাদুরী) না নেওয়া।

একেবারে হয় না সে অবস্থা। প্রথমে আরম্ভ করতে হয় credit (বাহাদুরী) নিয়ে। কিন্তু পরে কমাতে হবে।

কাঁদতে হয় তাঁর কাছে এই বলে, প্রভো, নিষ্কামভাবে তোমার সেবা করার অধিকারী করে নেও আমায়। চেষ্টা ও প্রার্থনা, এই দুই-ই সঙ্গে সঙ্গে চলবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বরলাভ কি চারটিখানি কথা গা? ধনলাভ, বিদ্যালাভ করতে হলেই কত চেষ্টা করতে হয়। আর, এ মনে কর পরমার্থলাভ। অনন্তকালের ধন লাভ করা এমনি বিনা চেষ্টাতে ফস্ করে হয়ে যাবে? তা হয় না।

নিষ্কাম কর্ম করে ভিতর শুদ্ধ হলে তখন ব্যাকুলতা হয় — যেমন স্বামীজীর ব্যাকুলতা। প্রাণ দিতে চান। বলেছিলেন, পশ্চিমে একটা বাগানে বসে প্রায়োপবেশন করবো। আহা, কি ব্যাকুলতা, অতি অল্পবয়সে প্রথম যৌবনে!

এসব ব্যাকুলতা সকলের হয় না। পূর্বে যাদের করা থাকে তাদের হয়, তৈরী মাল। একটু নাড়াচাড়া পড়লেই ফোঁস করে ওঠে, যেমন সাপ। কেমন হুঁসিয়ার। একটু শব্দ হয়েছে অমনি ফণা বের করে মাথা উঁচু করে রয়েছে।

তেমনি ব্যাকুলতা স্বামীজীর। একটুতেই ফোঁস্ করে উঠেছেন — চাই না সংসারভোগ, ধন-জন-যৌবনভোগ। চাই কেবল আত্মজ্ঞান। যেমন নচিকেতা, দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর। ঈশ্বরলাভ না হলে শরীর বিসর্জন দিব। বীর ভক্ত এঁরা। লোকশিক্ষার জন্য এঁদের আসা। তাই সর্বদা সজাগ। ছেলেবেলা থেকেই প্রবুদ্ধ। এঁরা চাতক। খালি স্বাতী নক্ষত্রের জল খাবে। অন্য জল খাবে না — সাত-সমুদ্র তের-নদী জলে ভরপুর, তবুও।

সকলের কি হয় এই ব্যাকুলতা প্রথমেই? যারা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি, যারা অবতারের পার্ষদ, তাদের হয়। কর্ম করে তবে অপরের হয়। নিষ্কাম

কর্ম — ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ, গুরুসেবা — এসব করতে করতে ভিতর সাফ হয়ে যায়। তখন নিজের ভিতরের দোষ দেখতে পারে। তখন হয় ব্যাকুলতা।

তখন বুঝতে পারে, কর্মপ্রবৃত্তি যেন একটা poison (বিষ)। ভিতর থেকে একে বের করতে হবে। অথবা উল্টো রাস্তা ধরে সে বিষকে নাশ করতে হবে।

তখনই কর্ম হয় ঠিক নিষ্কাম। কর্মপ্রবৃত্তি বিষ, এটা বুঝতে না পারলে সত্যিকার নিষ্কাম হয় না কর্ম। তখন মনে হয়, কর্ম না করে পারি না তাই কর্ম করছি। আবার এই কর্মের ফলভোগ করলে বন্ধন আসবে — জন্মমরণ-শৃঙ্খল। তখন সংকল্প করে কর্ম করবো। কিন্তু ফলভোগ নেবো না। বড় ঘরের দাসীর ন্যায় কর্ম করবো, গৃহিণী যা খাওয়া-পরা দেয় তাতে তুষ্ট থেকে। কর্মের এই দৈবী অমূল্য কৌশল ঠাকুর ভক্তদের হাতেনাতে শিখিয়ে গেছেন। নইলে ওসব পুস্তকে থাকে, মুখে বলে, যেমন বাজনার বোল হাতে আনাটা ঠাকুর শিখিয়ে পাকা করে গেছেন।

একটা ঘা আছে শরীরে। সেটা সারতে চায়, পারে না। সেটা নিয়ে অন্য কাজ করা যেমন, তেমনিভাবে নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করা। আর প্রার্থনা করা যাতে কর্ম নিষ্কাম হয়।

৪

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন, কয়েকজন ভক্তও সামনে বেঞ্চে বসা। গুমট গরম। এখন অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা। আজ রবিবার ১২ই জুলাই, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ।

এটর্নি বীরেন বোসের প্রবেশ। মোটর লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম-র নিকট প্রস্তাব করিলেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাবেন কি? আমি যাচ্ছি। শ্রীম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সম্মতি দিলেন। বীরেনের সঙ্গে আসিয়াছে ভক্ত গায়ক বঙ্কিম গোড়ই। তাঁহারা পনের মিনিটের ভিতর রওনা হইয়া গেলেন। ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়।

এদিকে নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। দুর্গাপদ মিত্র, বলাই, কীর্তনীয়া, গদাধর, বুদ্ধিরাম, ডাক্তার, বিনয়, সুখেন্দু,

জগবন্ধু প্রভৃতি।

শ্রীম খুব ক্লান্ত। একে গরম, তার উপর দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ভ্রমণ ও দর্শন। আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহস্র স্মৃতির জাগরণ ঐ লীলাভূমিতে। মন অতি উচ্চে আনন্দময় ধামে আরোহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধ শরীরের পুরানো স্নায়ুমণ্ডল উহা ধারণ করিতে পারিতেছে না। শরীর ও মনের সংগ্রাম চলিতেছে। মনেরই জয় হইল। শরীর ভুলিয়া শ্রীম তাঁহার পরম প্রিয়তমের কথা ও তাঁহার প্রেমপবিত্র লীলাভূমির কথামৃত ভক্তদের সপ্রেমে পরিবেশন করিতেছেন। ঐ লীলাভূমির অতি তুচ্ছ কথাও শ্রীম-র নিকট বৈকুণ্ঠের সংবাদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দক্ষিণেশ্বরের সব স্থান, বৃক্ষ, লতা সব জীবন্ত। সব পবিত্র। সব কাজ সেবার কাজ, তাই পবিত্র। এ সবেতেই ধ্যান হয়। এ সবই ধ্যানের অঙ্গ। দেখলাম একজন লুচি ভাজছে ভোগরান্নার ঘরে। ঠাকুরদের আহার হবে। মায়ের আরতির পর দেখলাম সকলে চরণামৃত নিচ্ছে। এতে স্থূল শরীরটার সঙ্গে মায়ের সংযোগ হচ্ছে। তারপর মনে যাবে। কেহ একদৃষ্টিতে মাকে দর্শন করছে। এতে মনে মায়ের সঙ্গে সংযোগ হচ্ছে। পূজারী জবা ফুলের মালা মায়ের গলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছে। মা এখন খাবেন। তারপর বিশ্রাম করবেন। কেহ নাটমন্দিরে একাকী পায়চারী করছে। হয়তো ভাবছে, জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে দর্শন করা, হৃদয়ে। কিন্তু হচ্ছে কোথায়? দিন যে বাজে কাজে চলে যাচ্ছে। গঙ্গায় মাঝিরা ডাকছে, কই গো, এসো। রাত হয়ে যাচ্ছে। এবার নৌকো ছেড়ে দিব। দেখলাম, ঠাকুরের ঘরে বসে কেহ কেহ ধ্যান করছে। হয়তো প্রার্থনা করছে — ঠাকুর, মন তোমার পাদপদ্মে লগ্ন করে দাও। পেরে উঠছি না মনের সঙ্গে। কেহ পঞ্চবটীতে বসে আছে। হয়তো স্মরণ করছে, এখানে ঠাকুর মায়ের সঙ্গে কত লীলাবিলাস করেছেন। কলিকালে ঈশ্বরের সঙ্গে এরূপ কথা কওয়া, রঙ্গরস করা দুর্লভ। এতে কি করে বলা যায় ঈশ্বর নেই? ঠাকুর যে মায়ের সঙ্গে দর্শন করে কথা কয়েছেন। বেদ উপনিষদ্ গীতা সব সত্য প্রমাণ হয়ে গেছে ঠাকুরের এই সব দর্শন স্পর্শন আলাপন লীলায়। আমরা দেখতে পাই না বলে, মা নাই — এ কথা আর বলা চলে না। ঈশ্বর সত্য।

পঞ্চবটীতে এখন বেশী বসা ভাল না। বড় ভিজে আর মশা। এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। এখন ঠাকুরের ঘর, মায়ের মন্দির, নাট-মন্দির, রাধাকান্তের মন্দির, বা ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় বসা ভাল।

একটি গরু দারোয়ানদের জিনিসে মুখ দিচ্ছে। তা দেখে একজন গরুকে ধাক্কা মারছে। বলছে, যাও সরে যাও। গরু নড়ছেও না। যেন বলছে, তোমরা কে বলবার? বলতে হয় ওরা বলুক। ইনি (বীরেন) আবার ছাদেও উঠেছিলেন। বড়ই কৌতুকপ্রিয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — পঞ্চবটীতে চলতে চলতে বসে পড়লাম, সাধুর কুটীরের পাশে। তখন জোয়ার। বেশ সাধুটি। কেমন সুমতি হয়েছে এই জীবন্ত জাগ্রত ভূমিতে তপস্যা করার। Ideal life (আদর্শ জীবন)। আমাদের কবে হবে এমন? সাধুটির কাছে কেহ কেহ বসা। আবার মায়ার কথা হচ্ছে। সাধুটি বলছেন, মায়াকী এইসী খেল হ্যায়।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। দেখছি সর্বভূতে নারায়ণ দর্শন করছেন, সর্বভূতকে নারায়ণের অধিষ্ঠান জেনে নমস্কার মুদ্রায় পুজো করছেন। সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন করছেন। ঠাকুরের কৃপায় পূর্ণকাম, আত্মারাম ছিন্ন-সংশয়। তবুও শ্রীম কেন বললেন সাধুকে দেখে 'আমাদের কবে হবে এমন?' শ্রীম বুঝি বাহিরের সব ছেড়ে একেবারে নির্মুক্ত হতে চান। কিন্তু জগদম্বার আদেশে ঠাকুর যে শ্রীমকে গৃহে রেখেছেন ভিতর ফাঁক করে লোকশিক্ষার জন্য, 'লোককে ভাগবত' শোনাতে। শ্রীম-র ইচ্ছা ছিল সন্ন্যাসী হতে সর্বত্যাগ করে। কিন্তু এক কলা শক্তি মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাঁকে সেই শক্তি দিয়ে লোকশিক্ষা করতে বললেন। তবুও মাঝে মাঝে সর্বত্যাগটি মনের মধ্যে উঁকি মারছে দেখছি। শ্রীমকে দেখে নিত্যানন্দের কথা মনে হচ্ছে। চৈতন্যদেব তাঁকে সন্ন্যাস ছাড়িয়ে ঘরে রাখলেন। আর শ্রীম ঘরে থেকে সন্ন্যাসের প্রার্থী। ঠাকুর বললেন না, লোকশিক্ষার্থ ঘরেই থাক। এইসব দৈবীলীলা বোঝা বড় কঠিন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) গেলে পাওয়া যায়। দেখলাম, সর্বস্ব ছেড়ে ঈশ্বরদর্শনের

জন্য ওখানে কুটীর বেঁধে সাধু ভজন করছেন। সর্বদা মায়ার কথা ভাবছেন। মায়া পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পথ ছেড়ে না দিলে ঈশ্বরদর্শন হবে না। তাই হয়তো ভাবছেন সাধু। আর কাঁদছেন, নীরবে প্রার্থনা করছেন, পথ ছেড়ে দিতে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে পড়ে আছেন মাস্তুলে-বসা পাখীর মত। নিশ্চয় বুঝেছেন সাধু, মায়া পথ ছেড়ে না দিলে এগোবার যো নেই। তাই হত্যা দিয়ে তাঁর দুয়ারে পড়ে আছেন।

সাধুটি নিশ্চয় ভাল লোক হবেন। নইলে কি ঠাকুরের তপস্যার স্থান, তাঁর লীলাভূমিতে, বসে আছেন! একেই বলে ব্যাকুলতা! এই ব্যাকুলতা এই সাধুটির হয়েছে। কত জন্ম এইভাবে কেটে যায়, তবে তাঁর কৃপা হয়, দর্শন দেন।

এই পথে ওঠাই হলো কষ্টকর। একবার কষ্ট করে এই পথে উঠে বসলে অনেকটা হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা। গাঁঠরী বেঁধে পথে বেরিয়ে পড়া। তা নইলে হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে খুব ম্যালেরিয়া। এ সময়টা রয়েছেন সাধু। তা ঠাকুরই দেখবেন। ব্যাকুল কিনা, ওদিকে খেয়ালই নেই। কিসে তাঁর কৃপা হয়, তাঁর দর্শন হয়, সেই এক চিন্তা।

কিন্তু যাদের অত ব্যাকুলতা নেই তাদের সাবধান হওয়া ভাল। জোর করে ব্যাকুলতা দেখালে বেশী ভুগতে হবে। দু'দিকেই দেখা উচিত। এখন ওখানে যেতে হলে দু'টো থেকে পাঁচটার ভিতর যাওয়া উচিত। তখন সূর্যদেব থাকেন। সূর্যদেব থাকতে গ্যাস উঠতে পারে না। তিনি যে বুদ্ধি দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করা উচিত যতদিন না তিনি দেহবুদ্ধি কমিয়ে দেন। প্রথমে দুই দিকে দৃষ্টি রাখা, পরে ব্যাকুলতা হলে কেবল তাঁ'তে দৃষ্টি থাকে — যেমন এই সাধুটির। তখন তার ভার নেন ভগবান।

রাত্রি দশটা।

৫

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন দুইটা। আজ সারাদিন বৃষ্টি হইতেছে। এই দুর্যোগেও ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্তগণ আসিয়াছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণ সিঁড়ির ঘরে উপবিষ্ট। কেহ কখনও বৃষ্টি বন্ধ হইলে

ছাদে যাওয়া-আসা করিতেছেন। ভোলানাথ প্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন। দুই ঘন্টা বসিয়া আছেন শ্রীম-র অপেক্ষায়।

শ্রীম পাঁচটায় বাহিরে আসিলেন। এখন বর্ষা নাই। কিন্তু আজ বাইরে বসা সম্ভব নয়। সব ভিজা। তাই সিঁড়ির ঘরে ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। শ্রীম সিঁড়ির সম্মুখে বসিয়াছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। তাঁহার সামনে বসা শচীনন্দন দত্ত ও সিদ্ধেশ্বর নিয়োগী। সিদ্ধেশ্বর মর্টন স্কুলের ছাত্র। বাঁ পাশে বসা গদাধর, বুদ্ধিরাম ও জগবন্ধু। ভোলানাথ শ্রীমকে প্রসাদ দিলেন। তিনি পায়ের চটিজুতা ছাড়িয়া প্রসাদ দর্শন, স্পর্শন, শিরে ধারণ ও সেবন করিলেন। আর প্রসাদমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রসন্ন হয়ে যা দেন ভগবান, তাকেই বলে প্রসাদ। উহা সপ্রেমে মাথায় তুলে নিতে হয়। কেন? না, এতে সে ভগবানের সঙ্গে মিল হয়ে যায়। তা'তে অজ্ঞাতে মনের উপর কাজ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। যদি লোভ থাকে কারো কোন দ্রব্যে, সেই লোভ নষ্ট হয়ে যায় যদি ঐ দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করে দিয়ে আহার করা যায়। ঠাকুর কত বড় উচ্চ স্থান দিয়েছেন প্রসাদের। বলতেন, পুরীর জগন্নাথের প্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আর গঙ্গাজল ও বৃন্দাবনের রজঃ, এ-ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ 'আট্‌কে' একদানা রোজ খেতেন। ভক্তদেরও তাই বলেছিলেন করতে। স্বামীজীকেও দিলেন। উনি খেতে চান নাই প্রথমে। বললেন, এ খেয়ে কি হবে, এই শুকনো ভাতের দানা? ঠাকুর উত্তর করলেন, দ্রব্যগুণ মানিস্ তুই — আফিংএ কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, আবার ত্রিফলায় দাস্ত হয়? এ তেমনি। এতে ভক্তিলাভ হয়, বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়। তখন স্বামীজী নির্বিচারে খেলেন। এই মহাপ্রসাদের গুণ বিষয়ে ঠাকুরের কথা শেষ কথা। তাই স্বামীজী খেলেন। তাই প্রসাদ দর্শন করতে হয়, স্পর্শন করতে হয় আবার সেবন করতে হয়। আবার "ঘুমন্ত লোককে ধাক্কা মেরে" তুলতে হয়, আর প্রসাদ দিতে হয়।

আমরা হাওড়ার পুলে দাঁড়িয়ে থাকতুম, জগন্নাথের টাট্‌কা প্রসাদের জন্য। যাত্রীরা রথ দেখে ফিরে এসেছে। কেউ দিত, কেউ বলতো, অনেক 'ছান্দন বান্ধনের' ভিতর রয়েছে (হাস্য)।

আমরা কি এসব জানতুম? ঠাকুর শিখিয়ে গেছেন এই সব সঙ্কেত

ভক্তিলাভের। ভগবান এসে এইভাবে সব মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। যদি ভক্তি চাও তবে তাঁর কথা মানতে হবে। এর উপর আর কথা নেই।

বড় অমূল্য ও কীর্তনীয়ার প্রবেশ। তাঁহারাও প্রসাদ পাইলেন। আজ একস্থানে একজন সাধু বক্তৃতা দিবেন। শ্রীম ভক্তদের পাঠাইতেছেন। শচীকে বলিলেন, যাও না তুমিও শুনে এসো, যাও এঁর (জগবন্ধুর) সঙ্গে। গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতিও গেল। ফিরিয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। শচী শীঘ্র শীঘ্র রাত্রির আহার শেষ করিতে বসিল। শ্রীম উহা দেখিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, এমন সময়, সন্ধ্যার সময় খেতে নেই। এটা রাক্ষসের আহার।

মিটিং হইতে ভক্তরা ফিরিয়া আসিয়াছে। শ্রীম গদাধর ও বুদ্ধিরামের মুখে কিছু কিছু বিবরণ শুনিতেছেন। শ্রীম ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতেছেন, এ তো মহা মুস্কিল। এসব unlearn (বিস্মরণ) করতে আবার কত হ্যাঙ্গাম। কতকগুলি কি (ভাব) ঢুকলো, এখন বের করাও শক্ত।

আজের মিটিংএ বক্তা বলেন, যাও, গ্রামে গ্রামে যাও। টেকনিক্যাল সব শিক্ষা দাও। নিজেরাও শিখে নাও। দেশসেবা কর। স্কুল কর। ঔষধ দাও। তোল, ওদের তোল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এসব তো খুব ভাল কথা। কিন্তু সকলের জন্য নয়। ওর থাক্ আলাদা। ভক্তদের থাক্ আলাদা।

যাদের ভিতর ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা রয়েছে, তাদের জন্য নয় এইসব। যারা অন্যরূপ, দেশসেবা না করলে হবে না যারা মনে করে, তাদের জন্য এসব পরোপকার ভাল।

ভালমন্দ ব্যক্তিবিশেষে হয়। একই জিনিস একজনের পক্ষে ভাল, অপরের পক্ষে খারাপ।

বাইরে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

একজন ভক্ত — তবে এসব শোনা কেন?

শ্রীম — শুনতে হয় এইজন্য, নিজের ধাত তা'তে বোঝা যায়। নানারকম শুনে যা ভাল লাগে তা নেওয়া। মুস্কিলও আছে। হয়তো গুলিয়ে গেল সব।

আবার ব্যাকুলতা থাকলে এমন একজন জুটিয়ে দেবেন ভগবান,

যিনি ঠিক ঠিক মানে বলে দেবেন। হয়তো রাস্তার লোক বলে দিলে। নির্বিচারে খেলে পেটে সইবে কেন?

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বরই সব করাচ্ছেন। মানুষ আর কি করছে? যাকে দিয়ে যা করাবেন তাকে তেমন বুদ্ধি দেন। তেমনি সঙ্গও মিলে।

তবে একজন Divine Interpreter (দেবোপম ব্যাখ্যাকর্তা) পাওয়া গেলে আর ভয় নাই। এখন খুব chance (সুযোগ)। ঠাকুর কিনা অবতার, Divine Interpreter!

Highest (সর্বোচ্চ) কর্তব্য কি, তা তিনি বলে গেছেন। কি সে-টি? — 'সচ্চিদানন্দে প্রেম।' যাতে ঐটি হয় তা করা।

আমরা ধন্য তাঁকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি, আর পালনের চেষ্টাও হচ্ছে। কত জন্মের ঘোরাফেরা তিনি ঘুচিয়ে দিলেন। আর এ জন্মেও নানা স্থানে ঘুরতে দিলেন না। বলেছিলেন, তুমি আর কোথাও যাবে না। খালি এখানে আসবে। আহা কে তিনি? তাই বলে গুরুর ঋণ শোধ হয় না। তিনি নিজে বলেছেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই এ শরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কথা শুনে চললে আনন্দ, সুখ।

শ্রীম নীরব। ডাক্তার বলিলেন, এখন গেলে হয়। বৃষ্টি নাই। শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। বাঁকা রায়ের গলিতে স্টুডেন্টস্ হোমে, চলিলেন ডাক্তারের মোটরে। সঙ্গে গেলেন ডাক্তার ও বিনয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়াছেন। রাত্রি আটটা।

পুরাতন শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ভবন,
৭, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
১৪ই জুলাই, ১৯২৫ খ্রীঃ, মঙ্গলবার।

অষ্টম অধ্যায়

নিমন্ত্রণে সকলেই খাবে — আগে আর পরে

১

মর্টন স্কুল। কলিকাতা। অপরাহ্ন তিনটা। সিঁড়ির ঘরে অন্তেবাসী, গদাধর ও বুদ্ধিরাম বসিয়া আছেন শ্রীম-র অপেক্ষায়। তিনি পাশেই নিজের শয়নকক্ষে অর্গলবদ্ধ — কখনও বিশ্রাম করেন, কখনও ধ্যান করেন।

শ্রীম-র জীবনভর একমাত্র ধ্যেয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম দর্শনের পর হইতে তাঁহার চিত্রাবলী শ্রীম মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। আর বাহিরে আছে ডায়েরীতে সেই চিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত 'স্কেচ', শ্রীম-র আবিষ্কৃত বাংলায় 'শর্টহ্যাণ্ড' অক্ষরে। এই ডায়েরী খুলিয়া শ্রীম সম্মুখে রাখেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকেন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া। ধ্যানে কি দর্শন করেন? নিশ্চয় নরদেহী সচ্চিদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে! কখনও তাঁহার চিন্ময় নরকলেবরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দে নিমগ্ন হন। কখনও অন্তরঙ্গ সঙ্গে, কখনও বহিরঙ্গ সঙ্গে, কখনও ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে উৎসবানন্দে লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন। শ্রীম বলিতেন, তোমাদের কাছে দূর। আমাদের কাছে যেন কালের ঘটনা। এক একটা ঘটনা হাজার বার ধ্যান করেছি।

একবার একজন সাধু (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ) শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া এই সামান্য একটা 'স্কেচ' হইতে তিনি এই বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর 'কথামৃত' রচনা করিলেন? শ্রীম দীনভাবে বলিলেন, তাঁর কৃপায়। লোক দেখে ত্রিশ বছরের ঘটনা। কিন্তু আমি দেখছি আমার চোখের সামনে ঘটছে এই ক্ষণে। সময়ের ব্যবধান দূর হয়ে যায় ধ্যানে। ভক্তিতে সব বর্তমান — অতীত, ভবিষ্যৎ নেই।

মর্টন স্কুলের পরিচালনার সময় ভক্তগণ দেখিতেন, শ্রীম-র মন যেন

বার আনা ঈশ্বরে নিমগ্ন আর চার আনা মন দিয়া কাজ করিতেছেন। অবসর পাইলেই অর্গলবদ্ধ হইয়া ডায়েরী খুলিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। স্কুলে বা কলেজে পড়াইবার সময়ও অবসর পাইলেই ছাদে বা কোণে বসিয়া ডায়েরী খুলিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। পড়াইতে পড়াইতে ছাত্রদের অবান্তর বলিতেন — মানুষজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন। আবার পাঠ্য বিষয়ের অনুসরণ করিতেন।

একবার সুধীর, শুকুল, বিমল, হরিপদ, স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী বালক ছাত্র রিপন কলেজের ছাদে গিয়া ধরিলেন শ্রীমকে খুঁজিতে খুঁজিতে। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীম ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে খোলা ডায়েরী। এই সব বালক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য নানা স্থানে যাইতেন। যখন শুনিলেন, তাঁহাদের কলেজের শিক্ষক শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও কথামৃতের ভাণ্ডারী তখনই তাঁহার খোঁজ পড়িল। কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া শিক্ষকদের বিশ্রামগৃহে না পাইয়া অপর শিক্ষকের কাছে সন্ধান লইয়া ছাদে গিয়া শ্রীমকে ধরিলেন।

শ্রীম বলিলেন, তোমরা তাঁর কথা শুনতে চাও — কি দেখতে চাও? বালকগণ বিস্মিত — কথা আবার দেখা যায় কি করে? শ্রীম তাঁহাদের বিস্ময় দূর করিলেন। বলিলেন, হাঁ গো তাঁর কথা মানুষরূপ ধারণ করেছেন। সেই মানুষ থাকে বরানগর মঠে। দেখতে চাও তো রবিবারে এসো নিয়ে যাব। সেখানে গিয়া দেখিল, কতগুলি দরিদ্র যুবক-তপস্বী। মন ভরিল না দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, এঁরা বোম্বাই আম, ফজলী আমের জাত। বড় হয়ে সুমিষ্ট ও সুবৃহৎ হয়। তখন অনেকের পেট ভরবে। কিন্তু ঐখানে (রাম দত্ত) পাকা বটে। কিন্তু দিশি আম। শ্রীম-র ভিতরে সদা শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রত — কর্মে, অবসরে, পরিহাসে।

ডায়েরীর মাধ্যমে শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ধ্যানপরায়ণতা ও অন্য নিষ্ঠার আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। শ্রীম-র কন্যার সম্প্রদানকার্য শেষ হইতে রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে। বিবাহের জমজমাট এখনও শান্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীম অন্তর্হিত। তিনি নীরবে ছাদে উঠিয়া হ্যারিকেনের আলোতে ডায়েরী খুলিয়া ধ্যানমগ্ন — দুইটা হইতে সকাল ছয়টা পর্যন্ত। 'কথামৃতং তপ্তজীবনং'-ই বটে শ্রীম-র জীবনে।

এখন অপরাহ্ন প্রায় চারিটা। ঢাকা জেলার বালিয়াটির বিখ্যাত জমিদার বাড়ির তিনজন ভক্ত শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়া প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করিতেছেন। অন্তেবাসী তাঁহাদের নিকট হইতে বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নানা সংবাদ লইতেছেন সিঁড়ির ঘরে বসিয়া। ঠিক চারিটার সময় শ্রীম দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দোরগোড়ায় চেয়ারে বসিলেন দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ উঠিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া পুনরায় বেঞ্চে বসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আনীত ফল মিষ্টি অন্তেবাসী পাশের হাই বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর শ্রীম কিছু পাঠ করিতে বলিলেন। একজন ভক্ত মাসিক ভারতবর্ষ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন — তান্ত্রিক ভক্তের মীমাংসা। পাঠ চলিতেছে আর মাঝে মাঝে অন্য কথাও হইতেছে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — আজকাল সায়েন্স অনেক এগিয়ে গেছে। এ্যাটম্‌কে ভেঙ্গেছে। তার ভিতর দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য ইলেকট্রনস্‌। এরা সব শক্তির কেন্দ্র। সব আপনিই ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরছে। সবই 'ফোরসেস্‌' (শক্তি)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর তাই দেখেছিলেন। তিনি এরও উপরে দেখেছিলেন — সব চৈতন্যময়। জড় নাই, সব সচ্চিদানন্দ। সায়েন্স মাত্র জড় আবরণটা ভেদ করতে চেষ্টা করছে তার বিশ্লেষণ করে।

ঠাকুরের দর্শন একেবারে গোড়ায় — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সব চেতন, বেদের কথা। ঋষিদেরও এই দর্শন হয়েছিল।

জড় ও চেতনার মাঝখানে আর একটা layer (স্তর) আছে। সেটা বুদ্ধির। সেটাও সূক্ষ্ম, কিন্তু জড় — fine matter।

এই চোখে দেখেছিলেন ঠাকুর, সব চেতন। বলেছিলেন, জড় তো কিছু নাই। আমি যে সব চেতন দেখছি।

বড় জিতেনের প্রবেশ। সঙ্গে বালক পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহারা বেঞ্চে বসিলেন। নূতন ভক্ত ও নিত্যকার ভক্তগণও কেহ কেহ আসিলেন।

অন্য একজন ভক্ত — আপ্তবাক্য কি?

শ্রীম (বড় জিতেনের ভাইপোর দিকে মুখ করিয়া) — 'আপ্ত' মানে প্রাপ্ত। 'আপ্‌' ধাতুর মানে, পাওয়া। যিনি ভগবানকে পেয়েছেন, অর্থাৎ

দর্শন করেছেন তাঁর বাক্য, তাঁর কথা — আপ্তবাক্য। তাই ঋষিদের কথা সব আপ্তবাক্য।

শ্রীম-র ইচ্ছায় ছেলেদের ঘরের সন্দেশ দেওয়া হইল। এখন সন্ধ্যার কিছু দেরী আছে।

শ্রীম (ছেলেদের প্রতি) — তোমরা একবার সাধু দর্শন করে এসো বাড়ি যাবার পথে। মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে অদ্বৈত আশ্রম। সেখানে (বেলুড়) মঠের সাধুরা থাকেন। (ভক্তদের আনীত) এই মিষ্টি আর আম সাধুদের দিয়ে, তাঁদের প্রণাম করে বাড়ি চলে যাবে। সাধুদের সেবা করা প্রণাম করা ভাল, কি বল?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমরা কি জানতুম এই সব? ঠাকুর জোর করে করিয়ে নিতেন।

একদিন বললেন, ষোলটা কাঁচাগোল্লা আনবে। আনা হলে নিজে ছুঁয়ে নিবেদন করলেন। তারপর বললেন, সবাইকে দাও।

ফলহারিণী পুজোর প্রসাদ চেয়ে নিতেন, দিতে দেরী হলে বলতেন, কই গো, আমাদের প্রসাদ যে এখনও এলো না। ভক্তরা তাই দেখে বলতেন, আপনিও দেখছি অন্য বামুনদের মত চেয়ে আনেন। ঠাকুর বলতেন, এর মানে আছে। যারা এখানে আসে তারা ঠিক ঠিক ভক্ত। তারা খেলে, তবে যারা এত টাকা খরচা করে এই দেবালয় করেছে তাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হবে। তাই এই সব তাঁর কাছে শিখেছিলাম। আমরা জানতাম না এ সব — ইংরেজী পড়া লোক।

শ্যামপুকুরের নূতন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, সাধুদের তো enough (যথেষ্ট) আছে। গরীবদের দিলেও হয়।

শ্রীম — হাঁ। তবে ঠাকুর বলতেন, সাধু ভক্তে বেশী প্রকাশ ভগবান। যেমন সূর্যের আলো জলে পড়ে, জমিতে পড়ে, ঘাস কাঠ নানা স্থানে পড়ে। কিন্তু কাঁচে যখন পড়ে তখন তার প্রকাশ হয় অধিক। তেমনি সাধুতে ভক্তে ভগবানের প্রকাশ বেশী। সর্ব জীবেই ঈশ্বর আছেন সত্য। কিন্তু সাধু সেটা জানেন। তাঁকে জাগ্রত করে তুলেছেন নিজেদের ভিতর। ঠিক ঠিক ভক্তও জানে সেটা। কিন্তু অন্যে জানে না।

তিনিই তো সব হয়ে রয়েছেন। কীট পতঙ্গ এসবকে খাওয়ালে

তাঁকেই খাওয়ান হয়।

তবে সাধুদের ভিতর তাঁর প্রকাশ বেশী। তাই তাঁদের খাওয়ালে তাঁকেই খাওয়ান হয়। গীতায় আছে, 'জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতং' (গীতা ৭:১৮)। জ্ঞানী আমার আত্মা, মানে স্বরূপ।

শ্যামপুকুরের ভক্ত — সাধুদের তো রয়েছে enough (যথেষ্ট)।

শ্রীম — থাকা না থাকার কথা হচ্ছে না। এখানে কথা হচ্ছে ভগবানকে নিয়ে। এখানে দয়ার কথা হচ্ছে না। পূজা করার কথা হচ্ছে, সেবা করার। সাধুদের ভিতর বেশী প্রকাশ ভগবান। তাই ভগবানকে পূজা করা, সেবা করা তাঁদের ভিতর দিয়ে। মাটির পুতুলে পূজা হয়, আর জ্যান্ত মানুষে পূজা হয় না?

একজন ভক্ত — ঠাকুর তো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলেন। সাধুকে তো খাওয়ান নাই তখন, সাধুর ভিতর নারায়ণ যদি বেশী প্রকাশ হয়?

শ্রীম — হাঁ। সে এক অবস্থায় খাইয়েছিলেন। তখন তিনি সবই ঈশ্বর দেখেছিলেন। কিন্তু জগতের দিকে মন যখন তাঁর নাবে, তখন সাধু ভক্তকে খাওয়াতেন। চৌদ্দ বছর ধরে সাধুসেবার জন্য স্বতন্ত্র ভাণ্ডার করেছিলেন মথুরবাবুকে বলে। তা থেকে সাধুরা যাঁরা আসতেন তাঁদের সব দিতেন কম্বল, বস্ত্র, জলপাত্রাদি। আবার কালীবাড়িতে যে পরিব্রাজক সাধু আসতেন ভক্তদের বলে তাঁদের সেবা করাতেন। একবার আমাদের দিয়ে সাধুসেবা করিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সাধুসেবা করা ভাল, কি বল? সাধুসেবা-মাহাত্ম্যের একটি গল্প বলেছিলেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ব্যাকুল হয়ে তিনি কাঁদছেন। ভগবান তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি কখনও সাধুসেবা করেছো? দ্রৌপদী বললেন, হাঁ। এক সাধু স্নান করছিলেন। জলে তাঁর কৌপীন ভেসে যায়। আমি তখন আমার বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়ে তাঁকে দিয়েছিলাম। ভগবান বললেন, তা হলে ভয় নাই। দুঃশাসন বস্ত্র যত টানছে ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই গল্পটি আবার আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন।

আমরা অর্থ দিলাম। সাধুরা আটা চাল ঘি আদি কিনে এনে রাঁধলেন। ঠাকুরও তাঁদের সঙ্গে বসে খেলেন।

আর একবার নরেন্দ্রাদি ভক্তরা চাঁদা তুলে পঞ্চবটীতে রান্না করলে, ডাল ভাত। সামান্য আয়োজন। সকলই বসেছে খেতে। ঠাকুরও বসেছেন। তখন একটি সাধুবেশধারী লোকও গিয়ে বসলো। কিন্তু ঠাকুর তাকে ঐ পঙ্গদে বসতে দিলেন না। বললেন, এখানে আঁটবে না। তাকে আলাদা দেওয়ালেন।

কেন? না, এঁদের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী। এঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ। জগদম্বাকে বিশ-বাইশ বছর ডেকে এঁদের এনেছেন। এঁরা জগদম্বার বিশিষ্ট লোক। শুদ্ধচিত্ত ভক্ত। এঁদের দিয়ে জগতে তাঁর ভাব প্রচার করবেন।

তাঁ'তে কি ত্যাজ্য গ্রাহ্য ছিল? নারায়ণের অধিষ্ঠান জেনে তিনি সকলকেই আগে প্রণাম করতেন। অপররা পরে প্রণাম করতো তাঁকে।

তা করবেন না? এখন যে ধর্মসংস্থাপন করতে এসেছেন। Relative plane-এ (অনুরূপ জগতে) ছোট বড় ভাল মন্দ সব আছে। আর থাকবেও। তা নইলে জগৎ থাকে না। বিচিত্রতা জগতের ধর্ম। এখানে নানা জীব, পশু পক্ষী, সাধু অসাধু, সব থাকবে। ভেদ দূর হয় সমাধিতে। নিচে নাবলেই ভেদ থাকবে — দরিদ্র, ধনী, অসাধু, সাধু আদি। এই ভেদের ভিতর যে অভেদকে জানতে পারে সেই জ্ঞানী, সেই ঠিক ভক্ত। অভেদ ভগবান, ব্রহ্ম। ভারতের ইতিহাসে এই দু'টো extreme pointsকে (চরম বিরুদ্ধ ভাবকে) প্রায় একত্র করতে পেরেছে এই বস্তুজগতে। তাই দরিদ্র নারায়ণ, দুঃখী নারায়ণ, রোগী নারায়ণের সেবা এখানে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী এখানে থাকবেই। তুমি যদি নারায়ণবুদ্ধিতে সেবা কর তা হলে একসঙ্গে দু'টি কাজ হয়ে যাবে। প্রথম, দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রাদি লাভ হবে। দুঃখ দূর হবে। আর তোমারও চিত্ত শুদ্ধ হবে, জ্ঞানলাভ হবে, ঈশ্বরদর্শন হবে। এইটেই তো মানুষের কাম্য। এটাই মুক্তি। এটাই ভারতের আদর্শ।

ঋষিরা বলছেন, সকলেরই মুক্তি হবে — আগে আর পরে। ঠাকুরও বলেছেন, নিমন্ত্রণ বাড়ি সকলেই খাবে। তবে আগে আর পরে। অভুক্ত কেউ থাকবে না।

জগৎও থাকবে, তার সুখদুঃখও থাকবে। আবার প্রতি জীব মুক্তির আনন্দও অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দও উপভোগ করবে। একসঙ্গে নয়। আগে পরে

হবে। একসঙ্গে সকলে মুক্ত হয়ে গেলে জগৎ থাকে না। জগৎ না থাকলে ঈশ্বরও থাকেন না। কারণ ঈশ্বরের definition (সংজ্ঞা) দিয়েছেন ঋষিরা, যিনি অনন্তকাল ধরে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন, তিনিই ঈশ্বর। জগৎ না থাকলে ঈশ্বরও নাই হয়ে পড়ে তা হলে। তা তো নয়। ঋষিদের মত, ঈশ্বর অনাদি। অনন্ত জগৎও অনাদি অনন্ত, কিন্তু প্রবাহাকারে। জীবের যখন মুক্তি হয় তখন জগৎ সান্ত হয়ে যায়। তার কাছে জগৎ থাকে না। থাকে কেবল ঈশ্বর — সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

ঠাকুর এই নাস্তিক যুগে সাধন করে ভক্তরূপে এই সব আপাতবিরুদ্ধ তত্ত্বের মীমাংসা করেছেন। উপনিষদে এ মীমাংসা অনন্তকাল রয়েছে। তাই এই মীমাংসার নাম বেদান্ত মীমাংসা।

বেদে আদি ও অন্ত, দুই ভাগ আছে। আদি ভাগে কর্মকাণ্ডের কথা। অন্ত ভাগে উপনিষদ্। তাই উপনিষদের অপর নাম, বেদান্ত বা জ্ঞানকাণ্ড। এতে জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব নির্ণয় হয়েছে।

এইসব ঠাকুর নিজের জীবনে সাধন করে বলে গেছেন অতি সহজ সরল ভাবে। নইলে, এসব তর্কের বিষয় হয়েই থাকতো। কেবল বুদ্ধি দিয়ে দেখতে গেলে শুধু তর্ক ওঠে। তাই ঠাকুর ও-পথে যান নাই। ঈশ্বরকে 'মা' বলে কেঁদে কেঁদে নির্জনে গোপনে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির জঙ্গলে ডেকে দর্শন করেন। তারপর মায়ের কাছ থেকে এসব তত্ত্ব জানেন। তাই বলতেন, মা আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন, বেদবেদান্ত পুরাণ তন্ত্রে কি আছে। তাই ঠাকুর বলতেন, বেদের সার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। পুরাণের সার সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। তন্ত্রের সার সচ্চিদানন্দ শিব।

শ্যামপুকুরের ভক্ত — স্বামীজী তো বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' আবার নিজেই 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবা প্রবর্তন করেছেন। আর ঠাকুরের কথা, সাধুসঙ্গ সাধুসেবা কর। কোনটা করা?

শ্রীম — বিরোধ নাই এতে। সাধুরা জেনেছেন, ঈশ্বরই দরিদ্র-নারায়ণ — জীবরূপে, আবার তিনিই সাধুনারায়ণ। সাধুদের সঙ্গ ও সেবা করা আগে। তা হলে দরিদ্রনারায়ণের সেবা ঠিক ঠিক চলবে। তা নইলে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে গিয়ে নিজের সেবা করবে। 'নারায়ণ' এ

ভাবটি সাধুদের ভিতর জাগ্রত। তাই আগে সাধুসেবা, পরে দরিদ্রনারায়ণের সেবা। তা না হলে নিজের সেবা হয়ে পড়বার খুবই সম্ভাবনা।

শ্যামপুকুরের ভক্ত — বিদ্যাসাগরমশায় কত সেবা করেছেন দীনদুঃখীর, কত দয়া তাঁর!

শ্রীম — হাঁ, দয়া সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য, ঠাকুর বলতেন। তাইতো নিজেই গিছলেন তাঁকে দেখতে। তাঁকে বলতে গিছলেন, এইসব কাজ যা তুমি করছো, ঈশ্বরবুদ্ধিতে যদি কর, তা হলে আরো ভাল হবে। তোমার হৃদয়ে যিনি আছেন সেই ঈশ্বরকে জানতে পারবে। সেইটাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি ধরতে পারলেন না। বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাবেন। কিন্তু যান নাই। গেলে হয়তো তাঁর শেষ জীবনটা অন্যরূপ হতো।

দয়ালাভ মানুষের কাম্য বটে, কিন্তু চরম উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বর-লাভই চরম উদ্দেশ্য। তখন জন্মমরণ-চক্রে পড়তে হয় না। পরমানন্দ লাভ হয়। ঈশ্বরদর্শন করতে হলে সাধুসঙ্গ-বৈ উপায় নাই। তাই ঠাকুর নিজে নানাভাবে ঈশ্বরদর্শন করে বলেছেন এই কথা — সাধুসঙ্গ কর, সাধুসেবা কর। তা হলে তুমিও সাধু হবে। আমরা তাঁরই কথা শুনবো। তিনি নিজে বলেছেন, আমি অবতার। তাঁর কথা সত্য।

মানুষ বিচার করে। এই বিচারের দৌড় কতটুকু। আমরা revelation (দৈব দর্শন) বিশ্বাস করি। উহাই বেদ। দয়া থেকে, সেবা থেকে, ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা বড়। সাধুসেবা তার চাইতেও বড়। সাধুর সেরা ঠাকুর। সাধুর স্রষ্টা ঠাকুর! তিনি যেকালে সাধু-সেবা নিজে হাতে ধরে করিয়েছেন আর করতে বলেছেন, তখন উহা বেদ। সাধুসেবা করা উচিত।

বড় জিতেন — ঠাকুর বলেছেন, গঙ্গাস্নান করা উচিত। তা বলে কি একজনকে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ডুবোতে হবে? সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করতে বলেছেন ঠাকুর। তা একজনকে করলেই তো হয়?

বড় জিতেনের ভাব — শ্রীম-র সঙ্গ, শ্রীম-র সেবা করা যাইতেছে, তিনিও শ্রেষ্ঠ সাধু। তাঁহার সঙ্গ করিয়া বহু লোক সাধু হইয়াছে। শ্রীম এই কথা উল্টাইয়া দিলেন।

শ্রীম — হাঁ। একজনকে ধরেছেন বলেই তো এইসব সন্ধান

পেয়েছেন। ঠাকুরকে ধরলে সব পাওয়া যায়।

অমৃত — হাঁ। এটা (শ্রীম) যেন enquiry office (অনুসন্ধান আফিস)।

শ্রীম কথাপ্রবাহ উলটাইয়া বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — দিন দিন, প্রসাদ দিন সকলকে। প্রসন্ন হয়ে ভগবান যা দেন তারই নাম প্রসাদ। এ মাথায় তুলে নিতে হয়।

প্রসাদ বিতরণ হইতেছে। শ্রীম দর্শন করিতেছেন। ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেছেন। বিনয় আজ কাষ্ঠমৌন। শ্রীম-র দৃষ্টি ঐখানে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি সহাস্য নয়নে ইঙ্গিত করিয়া) — ইনি (বিনয়) আজ provokingly reticent (বিরক্তিকর মৌনাবলম্বন করেছেন) (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি গদাধরকে ইঙ্গিত করিয়া) — এর সময় হলো না ওখানে (অদ্বৈতাশ্রমে) wait (অপেক্ষা) করতে। সাধুরা ধ্যান করছিলেন তখন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — সাধুদের দেখতে হয় এই সময়ে, at their best (যখন তাঁরা ধ্যানমগ্ন)। এইটে দেখা হলে আর কি বাকী রইল, ধ্যানের সময় সেই যে বাক্যমনাতীত ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে থাকেন সাধুরা, যোগে থাকেন। যতটা সম্ভব এই মন দিয়ে ঈশ্বরকে চিন্তা করবার ততটা ঐ সময়ে হয়।

তাই মঠে থাকতে হয়। তা হলে সকালে কিংবা রাত্রিতে যখন সাধুরা তাঁর সঙ্গে যোগে থাকেন, তা দেখা যায়। At their best (তাঁদের যোগাবস্থায়) দেখতে হয়। এ দেখবে না তো, কি দেখবে?

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। এখন রাত্রি নয়টা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন একাকী — দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ।

পুরাতন শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ভবন,
৭, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
১৬ই জুলাই ১৯২৫ খ্রীঃ, বৃহস্পতিবার।

নবম অধ্যায়

বিশ্রান্তির অন্বেষণে

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। পূর্ব প্রান্তে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে মুখোমুখী উত্তর ও দক্ষিণাস্য হইয়া বেঞ্চে বসা বড় জিতেন, কেষ্টবাবু ও তাঁহার সঙ্গী, সুখেন্দু, বলাই ও অমৃত, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন, কীর্তনীয়া ও শান্তি প্রভৃতি ভক্তগণ।

আজ ১৮ই জুলাই, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। এখন সন্ধ্যা। আলো আসিতেই শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তগণও একই সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন।

এখন বর্ষাকাল। গুমট গরমে শ্রীম-র কষ্ট হইতেছে। তাই তিনি গঙ্গাতীরে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তগণ নানাস্থানে উপযুক্ত বাসস্থানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীম-র মন এখানে থাকিতে চাহিতেছে না। প্রচুর বায়ুসংযুক্ত উন্মুক্ত গঙ্গাতটে তাই তিনি ছুটিয়া যান।

বিগত ১৫ই জুলাই বুধবার, অপরাহ্ন তিনটার সময় চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া ব্রহ্মচারী মণীন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, আপনারা ধন্য! আপনারা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছেন। আর সাধুসঙ্গে গদাধর আশ্রমে রয়েছেন আদিগঙ্গাতটে। আবার মহাতীর্থ কালীক্ষেত্রে। ঠাকুর নিজ চক্ষে মা কালীকে দেখেছিলেন, জীবন্ত, কুমারীর বেশে ফড়িং নিয়ে খেলা করছেন অপর বালিকাদের সঙ্গে। ফড়িং ধরছেন আর একটি অতি সূক্ষ্ম তৃণ তাহার পেছনে লগ্ন করে দিচ্ছেন। ফড়িংটা ঐ তৃণটি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর মা হাততালি দিয়ে আনন্দে নৃত্য করছেন।

শ্রীম আবার মণীন্দ্রকে বলিতেছেন, বুঝতে নিশ্চয় পারছেন যে আপনারা ধন্য। অপরের চাইতে উঁচুতে আছেন। চব্বিশ ঘন্টা ঠাকুরের

সেবা, পূজা পাঠ, জপ ধ্যান নিয়ে আছেন। আবার সাধুসেবা। অপর লোক কি নিয়ে রয়েছে? বিষয়, কামিনীকাঞ্চনের ভিতরে তাদের দিন কাটছে। আহার শয়ন মৈথুন ভয়, এ নিয়ে সব আছে। আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সেবা করে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে। আর আপনারা ঠাকুরের সেবা, তাঁর চিন্তা, তাঁর কাজ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আকাশ পাতাল তফাৎ সাধুর জীবন আর সংসারীর জীবনে। যোগোপনিষদে তাই বলা হয়েছে — সাধুর জীবন আর সংসারীর জীবন, যেন সুমেরু পর্বত আর সরষেদানা। অথবা মহাসাগর আর গোষ্পদে জল, এতো তফাৎ।

শ্রীম আবার বলিলেন, তা ছাড়া এখন যে ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন, আমি অবতার। বলেছেন, আমার ধ্যান করলেই হবে। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্যাদি আমার ঐশ্বর্য। আপনারা তাঁর চিন্তা করছেন, তাঁর সেবা করছেন। তাই তাঁর ঐ দৈব সম্পদের অধিকারী।

সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা। ডাক্তার বক্সী ও বিনয় আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মোটর গাড়ী। শ্রীম-র মন আজকাল একান্ত গঙ্গাতটে বিচরণ করিতেছে। অথবা বেলুড় মঠে ও ঠাকুরের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীম বলিলেন, দক্ষিণেশ্বর গেলে হয়। তাই ডাক্তার ও বিনয় তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। তাঁহারা ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়। আজ আর ভক্তসভায় বসিতে পারেন নাই, খুব ক্লান্ত। ভক্তগণ প্রায় সকলে চলিয়া গিয়াছেন। অন্তেবাসী বলাই আদি কয়েকজন শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

শনিবার, আজ ১৮ই জুলাই। আফিসের ফেরৎ শনিবারের ভক্তগণ — ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। গুমট গরমে শ্রীম-র শরীর ক্লান্ত থাকায় বিশেষ কথাবার্তা হয় নাই।

সন্ধ্যার ধ্যানের পরই শান্তিকে বলিলেন, তুমি ঠাকুরের কথামৃত পড়ে

একটু শোনাও। এই নাও আষাঢ়ের ভারতবর্ষ। এতে বের হয়েছে।

শান্তি পড়িতেছেন। শ্রীম বলিলেন, যে পড়ে তার আনন্দ হয়। আবার যারা শোনে তাদেরও আনন্দ হয়। তাই যারা উত্তম লোক তারা জোর করে শুনিয়ে দেয় ভগবানের কথা। এখানে তা নয়। জোর করে শোনাতে হবে না। শ্রোতারা নিজেরাই শুনতে উদ্‌গ্রীব।

পাঠ আর হইল না। কারণ ডাক্তার ও বিনয় উত্তরপাড়া হইতে ফিরিয়াছেন দেখিয়া শ্রীম তাঁহাদের সঙ্গে আগ্রহে কথা বলিতে লাগিলেন। উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতীরে একটি বাড়ি দেখিতে তাঁহারা গিয়াছিলেন। শ্রীম-র গঙ্গাতীরে বাস করার ইচ্ছা। যে বাড়ি দেখিয়া আসিয়াছেন ডাক্তার ও বিনয়ের তাহা পছন্দ হয় নাই। বাড়িটা ছোট আর গঙ্গার তটে নয়, একটু ভিতরে।

শ্রীম ক্লান্ত থাকিলে শাস্ত্র পাঠ করিতে বলেন — কখনও ভাগবত, কখনও অন্য পুরাণ, কখনও কথামৃত। শ্রীম-র ইচ্ছায় একজন ভক্ত কথামৃত পড়িতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জ্জীর শ্যামপুকুরের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে ভোজন করিয়াছেন। তারপর দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া আনন্দ করিতেছেন। সঙ্গে রাম ও কেদার, বলরাম ও মাস্টার, রাখাল, সুরেন্দ্র ও মনমোহন আদি। আজ ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ, ৯ই এপ্রিল, রবিবার। ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েকজন লোক দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন। পাঠ চলিতেছে। সংসার গোলকধাঁধা। বাহির হইবার উপায় ঠাকুর বলিতেছেন, সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুর মণি মল্লিককে বললেন, উপায় — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। পরন্তু এখানে শোনা গেছে, উপায় — সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা। আজ ঠাকুর বললেন, উপায় — সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। অত শুনে সব গুলিয়ে যায়। সোজা একটা উপায় বলে দিলে কাজ হয় ভাল। কোনটা নেওয়া?

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — সাধুসঙ্গ। এটা ধরলে বাকী সব এসে যাবে। সাধুসঙ্গ করলে সাধুরা যা করেন তা করতে ইচ্ছে হবে। সাধুরা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করেন। বাড়িঘর সব ছেড়ে এসেছেন আর গুরুর আশ্রয়

নিয়েছেন। গুরু যা বলেন, তা পালন করতে চেষ্টা করেন। না পারলে, বলেন। তখন গুরু সহায়তা করেন। সব ছেড়ে আসা বড় কঠিন। অন্যরা যা কামড় দিয়ে ধরে রয়েছে, সাধুরা তা কাকবিষ্টার মত ছেড়ে এসেছেন। তাঁদের তো বিদ্যা বুদ্ধি সবই ছিল। এক একজন কত বড় বিদ্বান! কি না করতে পারতেন সংসারে! কিন্তু সব পরিত্যাগ করেছেন। আবার স্নেহ কেটে এসেছেন। মানুষ একবেলা ছেলের চাঁদবদন না দেখলে পাগল হয়ে যায়, তাঁরা সেই পিতামাতাকে ছেড়ে এসেছেন। কেহ কেহ পুত্রকন্যাকেও ছেড়ে এসেছেন। ছেলেখেলা নয় এসব।

অত সব ছেড়ে এসেছেন সাধুরা, তাই তাঁরা অত ব্যাকুল ঈশ্বরলাভের জন্য। গুরু যা বলেন তাই করেন প্রাণপণ ক'রে। ঠাকুর কি সাধুসঙ্গ করতেই বলেছেন? সাধু তৈরী করে দিয়েছেন। এঁদের সঙ্গ করলে ওঁদের মত ব্যাকুলতা আসবে। ওঁরা সব মঠে থাকেন।

এই সাধুরা নির্জনে গোপনে কত কাঁদছেন তাঁর দর্শনের জন্য। কত ব্যাকুল প্রার্থনা করছেন। কত অনাহার অনিদ্রা তাঁদের। সাধু সেবা, এটাও সাধুদের কাছ থেকেই শেখা যায়। মঠের সাধুরা নিজে না খেয়ে সকলের সেবা করেন। এই দেখে ভক্তরা শিখবে সেবা কাকে বলে! বাবুরাম মহারাজ শশীমহারাজ এঁরা সেবার মূর্তি। এঁদের সেবা দেখে সংসারীরা নির্বাক হয়ে যেতো। তারপর যাঁরা মঠ মিশন চালাচ্ছেন ঠাকুরের ছেলেরা, ওপরের এঁরা, তাঁদের জীবনই কি কম? নিষ্কাম সেবা করতে করতে এক একজন প্রাণপাত করে দিচ্ছেন। কোন দিকটা শিক্ষা না দেয় তাঁদের জীবনের? তাঁদের সঙ্গ করলে, সেবা করতে ইচ্ছা হবে। দেখ না, এক সাধুসঙ্গে সব এসে যাচ্ছে — গুরুবাক্যে বিশ্বাস, সাধুসেবা, প্রার্থনা — সবই ওর ভিতর ঢুকে আছে — সাধুসঙ্গের ভিতর। ধর্মপথের যা দরকার সব ঐ সাধুসঙ্গ থেকে পাওয়া যায়।

অনেকে খালি কথা বলে, কাজ করে না। মণি মল্লিক ছিলেন বয়স্ক ব্রাহ্ম ভক্ত। যাকে পান তাকে জিজ্ঞেস করেন, উপায় কি? ঠাকুর বহুবার বলে দিয়েছেন, উপায় — সাধুসঙ্গ। কিন্তু তা করবে না। একদিন শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে বিচার করছিল। ঠাকুর শশধরকে বললেন, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ো না। নিতে পারবে না। তার যা মত তাই নিয়ে চলুক। কথায়

বলে, কাঠি উঠে গেলে পাখী বুলি নেয় না।

এই অত কাছে মঠ। কিন্তু যায় কই লোক? খালি বক্ বক্ করে। ঠাকুর কি কেবল সাধুসঙ্গের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন? তা নয়। উত্তম সব সাধু সৃষ্টি করে গেছেন। এদের সঙ্গ করলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। কারণ ওঁরা যে সর্বত্যাগী! ঠাকুরের স্পর্শে সব দেবতা হয়ে গেছেন!

সাধুসঙ্গ করলে আর একটা বিশেষ উপকার। কে সত্যিকার আপন, কে পর, তা জানা যায়। যে ভগবানের পথে নিয়ে যায় সে-ই সত্যিকার আপন। আর সব পর। এতে বোঝা যায় যাদের আমরা আপনার বলছি তারা সত্যিকার পর। আর যে পর, সে যদি ভক্ত হয়, সে সত্যিকার আপন। এতে ঘোরাফেরা, ধোঁকা থেকে বেঁচে যায়। বোঝা যায় যথার্থ বন্ধু সাধু।

সাধুর definition-ও (সংজ্ঞা) ঠাকুর দিয়েছেন। বলেছেন, যার কাছে বসলে আপনি মনে ওঠে — ঈশ্বরই কেবল আপনার, সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য — তিনিই সাধু। দেখ, কত উদার মত। এই সব সাধু বেলুড় মঠে থাকেন।

একজন ভক্ত — আর এক পথ আছে, ঠাকুর বললেন। সেটা কি?

শ্রীম — ঠাকুরই তার উত্তর দিয়েছেন। সে-টি প্রার্থনা, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলা — প্রভো, তুমি দর্শন দাও। ঠাকুর এই বলে গিছলেন। এটা কলির পক্ষে সহজ পথ। কেঁদে বললে তিনি তার ভার নেন।

কেঁদে বলা, আগে চেষ্টা করে না পারলে। তাই আগে চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা করে যখন পাখী কিনারা পেলো না, তখন এসে আবার মাস্তুলে বসলো। বলে, আহার মিললো না। তাই প্রার্থনা — বাপ, বাঁচাও। জল-আহার দাও। আন্তরিক প্রার্থনা করতে পারলে এ যুগে শীগ্‌গীর হয়ে যায় কাজ।

পাঠ চলিতেছে। শ্রীম নীরবে শুনিতেছেন। আর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখ, এই কয়টা কথা দিয়ে কেমন সহজে মানুষের জীবনে সকল সমস্যা পূরণ করে দিয়েছেন। বলছেন, সংসারে থেকে মুক্তি লাভ হতে পারে। আর সকলেরই মুক্তি হবে। আবার বললেন,

আমি কর্তা, এটা অজ্ঞান। ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা এর নাম জ্ঞান।

একজন ভক্ত — তা হলে কোন কাজ হবে না। অহংকার না থাকলে কে করবে কাজ?

শ্রীম — এই অহংকারটাকে তাঁর বিরাট অহংকারের সঙ্গে বেঁধে দিতে বলেছেন — যেমন আম গাছের কলম বাধে। 'আমি ঈশ্বরের দাস' — এই ভাব নিয়ে সব কাজ করলে — যেমন বড় ঘরের দাসী করে, তা থেকে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তারপর তাঁর ইচ্ছায় তাঁর দর্শন হয়।

কেমন জান, যেমন মনিবের মুন্‌সী। সব কাজ করছে যত্ন করে। কিন্তু লাভ বা লোকসানে বিচলিত হয় না। লাভ লোকসান দুই-ই মনিবের। এই ভাবে সংসারে থাকা। কিন্তু সাধুসঙ্গ চাই নিত্য।

২

পরের দিন রবিবার। শ্রীম ডাক্তারের গাড়ীতে উত্তরপাড়া, বালি হইয়া বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। জগবন্ধু, সুখেন্দু প্রভৃতি ভক্তরা কেহ কেহ দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। সাধুদের সঙ্গে মঠবাড়ির রোয়াকে বসিয়া আছেন। বাম দিকে গঙ্গা। আর সম্মুখে চন্দন বৃক্ষ। বর্ষাকাল, গঙ্গা জলে পরিপূর্ণ। ভক্তরা দেখিলেন, শ্রীম মোটর হইতে নামিতেছেন প্রেমানন্দ মেমোরিয়েলের কাছে। তাঁহারা দ্রুতবেগে ওখানে যাইয়া দেখিলেন, সঙ্গে অমৃত, বিনয়, ডাক্তার আর শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস।

শ্রীম স্বামীজীর মন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন বেলতলায়। তারপর বিল্ববেদিকার পূর্ব দিক হইতে বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত কপালে লাগাইলেন। গদ্‌গদ্‌ভাবে কহিতেছেন এখানে কত কাণ্ড হয়ে গেছে — কত ধ্যান, কত সমাধি!

স্বামীজীর মন্দিরের উপর উঠিয়া ওঁ-কার মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তগণ সঙ্গে আছেন। ইতিমধ্যে সাধুরা কেহ কেহ আসিয়া শ্রীম-র সঙ্গে দেখা করিলেন।

শ্রীম মন্দিরের দ্বিতলের উত্তর-পূর্ব কোণে দাঁড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরের ঝাউবৃক্ষ দর্শন করিলেন, আর গঙ্গা। মঠের অপর পারে কাশীপুর শ্মশানও

যুক্ত করে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঐখানে ঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ দাহ করা হইয়াছিল।

এবার নিচে নামিয়া স্বামীজীর সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে স্বামীজীর সমাধিপীঠ ও দেয়ালের গায়ে খচিত স্বামীজীর শ্বেত পাথরের ধ্যানমূর্তি দর্শন করিতে আসিলেন। কিন্তু দর্শন হইল না। দরজার সম্মুখে একজন মেমসাহেব ও তাঁহার পুত্র দাঁড়াইয়া সমাধিবেদী দর্শন করিতেছেন। মায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ আর ছেলের বয়স পঁচিশ। পশুপতি (স্বামী বিজয়ানন্দ) তাঁহাদিগকে স্বামীজীর জীবনের কথা বলিতেছেন। অনঙ্গ (স্বামী ওঁকারানন্দ) শ্রীমকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া দ্রুতবেগে আসিয়া উঁহাদের বলিলেন তোমার সরে যাও। উনি দর্শন করবেন। স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া মায়ের মন্দিরে যাইতেছেন। পশুপতি ও অনঙ্গ আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীম কথা কহিতে কহিতেই মায়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুক্ত করে মাকে দর্শন করিতেছেন। এখানে মায়ের সমাধিবেদিকার উপর সিংহাসনে মায়ের সুবৃহৎ চিত্র। তারপর শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া গলবস্ত্রে মাকে প্রণাম করিতেছেন, মাকে ডান হাতে রাখিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া।

মা পূর্বমুখী। গঙ্গা তাঁর অতি প্রিয় ছিলেন। তাই মন্দিরটি পূর্বমুখী। চিত্তময়ী মা সিংহাসনে বসিয়া সর্বদা গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। তারপর করজোড়ে প্রার্থনা ও প্রদক্ষিণ করিলেন বারান্দায়। অর্ধনিমীলিত নেত্রে কি প্রার্থনা করিলেন? হয় তো জগতের সকল জীবের কল্যাণ, আর মায়ের সাধু ও ভক্তগণের কল্যাণ চাহিলেন কি?

ব্রহ্মানন্দ মন্দির। শ্রীম বারান্দায় উঠিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন — সঙ্গে অমৃত ও প্রভাস, ডাক্তার ও বিনয়, জগবন্ধু ও সুখেন্দু প্রভৃতি। মন্দিরের পূজারী বসন্ত মহারাজ। দ্বিতলে গিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া পূর্ব-উত্তর কোণে দাঁড়াইয়া শ্রীম-র সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। শ্রীম নামিয়া আসিলেন। নিচে মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন স্বামী ধর্মানন্দ, নির্গুণানন্দ, ওঁকারানন্দ ও জ্ঞানদানন্দ (নীলকণ্ঠ মহারাজ)। শ্রীম তাঁহাদিগের নিকটে গেলে তাঁহারা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা

করিলেন।

অতঃপর শ্রীম সকলকে লইয়া মঠবাড়ির দক্ষিণের রোয়াকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রোয়াকে গঙ্গার দিকে বসা জ্ঞানমহারাজ আর পশ্চিমের দিকে বসা বড়দা। জ্ঞান মহারাজ মঠে যোগদানের পূর্ব হইতে শ্রীম-র পরিচিত ও বিশেষ স্নেহভাজন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, অভিনব বুদ্ধিসম্পন্ন লোক — নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। জ্ঞান মহারাজ উঠিয়া শ্রীম-র নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনছি আপনি নাকি উত্তরপাড়ায় বাস করবেন গঙ্গাতীরে? শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, দেখ কি হয়। তাঁর ইচ্ছা না হলে হবে কি? জ্ঞান মহারাজের কুশল প্রশ্ন করিয়া বড়দার কাছে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছেন তো বড়দা?

মঠবাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় বসা আছেন মহাপুরুষ মহারাজ, মঠের প্রেসিডেণ্ট, ঠেস-দেওয়া বেঞ্চে। আর নিচে মেঝেতে বসা অনেকগুলি ভক্ত। শ্রীমকে দেখিয়াই মহাপুরুষ মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অতি আহ্লাদে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আসুন মাস্টার মশায়, বসুন। ভাল আছেন তো? কুশল প্রশ্নের পর মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, ঠাকুরকে দর্শন করে এসে বসবেন কি? আপনাকে কত ভালবাসতেন!

শ্রীম সহাস্য বদনে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর-মন্দিরের দ্বিতলে উঠিয়া পূর্ব বারান্দায় ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। বারান্দার উত্তর দিকে মেঝেতে চরণামৃত ও প্রসাদী চন্দন রহিয়াছে দেখিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিলেন, আর রক্তচন্দনের তিলক ললাটে ধারণ করিলেন অতি সম্ভ্রমে। এবার দরজার উত্তর পাশে বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতেছেন, সম্মুখে ঠাকুর বেদীর উপর সিংহাসনে বসা, পূর্বাস্য। নিম্নে বেদীর অভ্যন্তরে আত্মারাম। ভক্তগণও সকলে শ্রীম-র পিছনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া বারান্দায় যাইবার দরজা খুলিয়া দিলেন। শ্রীম উঠিয়া দক্ষিণের বারান্দা দিয়া ধ্যানঘরের পাশের খোলা ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ওখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকের বৃক্ষাদি সব দর্শন করিতেছেন। পুনরায় দক্ষিণের বারান্দা দিয়া পূর্বমুখী আসিতেছেন। ধ্যানঘর দর্শনের ইচ্ছা। এখানে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রত ধারণ করেন সাধুগণ। ব্রহ্মচারী ধ্যানঘর

খুলিয়া দিলে শ্রীম ভিতরে গিয়া মেঝেতে হাত রাখিয়া অতি শ্রদ্ধাসহকারে সেই হাত মস্তকে ধারণ করিলেন। এই স্থান অতি পবিত্র। শত শত সাধু ব্রহ্মচারী সংসার অনিত্য জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তু শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারী আগে চলিতেছেন, পিছনে শ্রীম। তাঁহার পিছনে ভক্ত ও সাধুর দল। ব্রহ্মচারী ঠাকুরের সিংহাসনের পাশের দরজা খুলিয়া দিলে উঁকি দিয়া ঠাকুরের পাদুকা দর্শন করিলেন। আবার উত্তরাস্য ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদুকাকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদের উপর দিয়া মঠবাড়িতে আসিতে চাহিলেন। কিন্তু এই রাস্তা তালাবন্ধ দেখিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেলেন। এইবার ঠাকুর-ভাঁড়ার, ভোগ-ভাঁড়ার, রন্ধনশালা আদি দর্শন করিয়া প্রশস্ত অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খোকামহারাজ পূর্ব দিকের আমতলা হইতে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া অতি আগ্রহানন্দে প্রণাম করিয়া সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস্টারমশায়, কেমন আছেন? শ্রীম স্মিত হাস্যে উত্তর করিলেন, ভাল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ বল। ভাল তো? বর্ষাকাল এখন। খোকামহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোত্থেকে এলেন? শ্রীমও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, এখন তো এইখানেই।

খোকামহারাজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত, শ্রীম-র প্রিয় ছাত্র। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোদের পাড়ায় মাস্টারের ঘর। ওখানে যাবি। গেলে এখানকার (ঠাকুরের) কথা শুনতে পাবি। এখন তিনি বৃদ্ধ। তবুও মঠ হইতে মাঝে মাঝে শ্রীমকে দর্শন করিতে কলিকাতায় যান।

কখনও বালকের ন্যায় চাদরের নিচে করিয়া মঠের বাগানের কোন ফল বা তরকারী লইয়া আসেন। শ্রীম ঠাকুরের পরম পবিত্র নির্মাল্য মনে করিয়া জুতা ছাড়িয়া ঐ সব ক্ষুদ্র বস্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তকে ধারণ করেন।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম অত তন্ন তন্ন করে মঠের সব কেন দেখেন? আর অত প্রণামই বা কেন? একবার একস্থানে করলেই তো হয়? ভক্তদের শিক্ষার জন্য কি? ভক্তরা সকলেই 'ইংলিশ ম্যান'। তারা এসব অত মানে না, আর শিক্ষাও পায় নাই। ঠাকুরও এই 'ইংলিশম্যান'দের

সঙ্গে এরূপ আচরণ করতেন কথামৃতে দেখতে পাই। এইসব বুঝি ভক্তির অঙ্গ! এসব করতে করতে ভক্তিলাভ হয় নিশ্চয়। এর আর একটা লাভ আছে। শ্রীমকে বলতে শুনেছি, মঠের সব ভাল করে দেখা থাকলে এতে ধ্যানের কাজ হয়। একটি ফুলগাছের কথা স্মরণ হলে ঠাকুরের কথা স্মরণ হতে পারে। তাতে ধ্যানের সহায় হয়। মহাপুরুষ হওয়ার ট্যাক্স বড় বেশী দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীম এবার দর্শন ও পরিক্রমা শেষ করিয়া মঠের পশ্চিমের বারান্দায় মহাপুরুষ মহারাজের পাশে গিয়া বসিলেন। খোকা মহারাজও আসিয়া পাশে বেঞ্চে বসিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, একটু তাঁর কথা আপনি বলুন। শ্রীম ঠাকুরের কথা না বলিয়া মঠের ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্যের কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম (মহাপুরুষমহারাজের প্রতি) — Night patrol (রাত্রিতে পাহারা) দিচ্ছেন এঁরা, এ খুব ভাল। মিশনের সব কাজই খুব ভাল হচ্ছে।

মহাপুরুষ — কত কাজ বেড়ে গেছে। এই গাদা গাদা চিঠি আসছে। তার জবাব লেখা — কত কাজ করতে হচ্ছে। আমরা কি এসব ভাবতুম পূর্বে? আমাদের এসব dream (স্বপ্ন) ছিলই না। স্বামীজী বলতেন, আমরা হিমালয়ে থাকবো। একটা rich library (উচ্চ শ্রেণীর লাইব্রেরী) থাকবে। তাতে পড়াশোনা আর সাধন ভজন, এই সব নিয়ে থাকা যাবে। তাই রয়েছে বটে লাইব্রেরী মায়াবতীতে। কিন্তু তিনি নেই। ঠাকুরের ইচ্ছা নয় তাঁকে এখানে রাখা।

শ্রীম — স্বামীজী এই কথাই আলমোড়া address-এর (অভ্যর্থনাপত্রের) answer-এ (প্রত্যুত্তরে) বলেছিলেন, এই হিমালয় দর্শন করলে আমার সকল কর্ম-প্রবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়। মনে হয়, ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকি।

মহাপুরুষ — ঠিক কথা। হিমালয় দেখলে মন স্থির হয়ে যায়। অন্য সব ভুল হয়ে যায়।

শ্রীম — তিনি (ঠাকুর) এসেছিলেন বলে এইসব দেখা যাচ্ছে। তাঁর কথা সব মূর্তিমান হয়েছে।

মহাপুরুষ (সহাস্যে) — এই দেখুন তাঁর (ঠাকুরের) ঘর। এতে

গেরুয়া রং দেওয়া হয়েছে (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁকে ধর। এই ছিল তাঁর এক কথা। আপনারা যে ঐ কথার মূর্তি!

মহাপুরুষ — হাঁ, তা বটে। তিনি সঙ্গে করে নারদ, বেদব্যাসকে এনেছেন (সকলের পুনরায় হাস্য)। নইলে কে শুনাবে, তাঁর সব মহাবাক্য? কে-ই বা অত কষ্ট করে লিখবে তাঁর কথামৃত? স্বামীজীও তাই বলেছিলেন, এ কাজটা (কথামৃত) আপনার (শ্রীম-র) জন্য রাখা ছিল পূর্ব থেকে। ঠাকুর সঙ্গে থেকে নিজে করিয়ে নিচ্ছেন এ কাজ (কথামৃত লেখা)। আর নারদ (শ্রীম) ছাড়া কে-ই বা দিবানিশি হরিগুণ কীর্তন করে? হাঁ, পূর্ব থেকেই ঠিক ছিল এসব 'ভাগবতের পণ্ডিত'কে (শ্রীমকে) ঘরে রাখা। নইলে কে শোনাত অত কষ্ট করে?

গুরুভাইদের এই আনন্দময় বাগ্‌বিলাস চলিতেছে। আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ঠাকুরঘরে গিয়া আরতি দর্শন করিলেন ঠাকুরের সামনে বসিয়া।

পঞ্চ উপচারে পূজা করিয়া পূজারী চামর দুলাইতেছেন। স্টিমার কুঠিঘাটা ছাড়িয়া দিয়াছে দেখিয়া জগবন্ধু ও সুখেন্দু দৌড়িয়া গিয়া বেলুড়ে জাহাজে উঠিলেন। বড়বাজারে নামিয়া সুখেন্দু তাঁহার বাসায় গেলেন। জগবন্ধু গেলেন মর্টন স্কুলে।

তাঁহাদের কানে বাজিতেছে — 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়। নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।'

শ্রীম আরতি দর্শন করিতেছেন। শেষ হইলে ডাক্তারের মোটরে মর্টন স্কুলে আসিলেন। ভক্তগণ এখানে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৯শে জুলাই, ১৯২৫ খ্রীঃ, রবিবার।

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তিমান বিগ্রহ ঠাকুর

১

মর্টন স্কুল। চারতলার শ্রীম-র শয়নকক্ষ। এখন সকাল সাতটা। কখনও বৃষ্টি, কখনও রৌদ্র। শরীর ঘর্মাক্ত। শ্রীম-র শরীর তাই আজকাল খারাপ চলিতেছে। কখনও ভিজা গরমে সর্দিকাশি হইতেছে। Change-এর (বায়ু পরিবর্তনের) জন্য শ্রীম-র ইচ্ছা গঙ্গাতীরে বায়ুবহুল স্থানে যাইতে। ভক্তগণ স্থানে স্থানে যাইতেছেন অনুকূল স্থানের সন্ধানে। গতকাল শ্রীম স্বয়ং উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলেন বাড়ি দেখিতে। তখন বেলুড় মঠেও গিয়াছিলেন। মঠের অধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। গতকালের যাতায়াতের জন্য আজও শরীর ক্লান্ত। তাই নিজ কক্ষে বিছানার উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ পাশে লম্বা বেঞ্চে বসা জগবন্ধু, বিনয় ও শান্তি। একথা-সেকথা হইতেছে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — কাল আপনারা (বেলুড়) মঠে কখন গিছলেন?

জগবন্ধু — বিকাল তিনটায়।

শ্রীম — তখন মঠে কি হচ্ছিল?

জগবন্ধু — তখন ভিজিটারস্ রুমে পাঠ হচ্ছিল স্বামীজীর 'পত্রাবলী'। 'ভারতী'-সম্পাদিকাকে স্বামীজী পত্র লিখেছেন ভারতের সমস্যা সম্পর্কে। তাছাড়া আরও কয়েকটা পত্র পড়া হচ্ছিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — স্বামীজী বলেছিলেন, যা করে গেলাম তাতে এখন দাগা বুলুক। তা হলেই হবে। কোনও সমস্যাই বাদ রাখেন নাই। ভারতের স্বাধীনতা কবে হবে এবং কিরূপে হবে তা বলে গিছলেন। বালগঙ্গাধর তিলককে বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছর পরে ভারত স্বাধীন হবে। তখন আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন চার বছর পর ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে।

তিলক বুঝি বলেছিলেন — ভারত, ঋষি মহাপুরুষ অবতার-রক্ষিত দেশ। আপনি মহাযোগী মহাপুরুষ। আপনার যোগশক্তি দিয়ে ভারত স্বাধীন করে দিন। তখন স্বামীজী বুঝি বলেছিলেন, হাঁ তা পারি। কিন্তু কার স্কন্ধের উপর সেই স্বাধীন দেশ রাখবো? দেশ যে তমোতে ডুবে আছে। রজো আসবে। পঞ্চাশ বছর পরে ভারত স্বাধীন হবে।

স্বামীজী যে বললেন, পারি স্বাধীন করতে। এর মানে হচ্ছে, ঠাকুর তাঁকে যোগ বিভূতি দিয়েছিলেন — অষ্টসিদ্ধি! এ শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব হয়। ব্রহ্মদ্রষ্টা মহাপুরুষ আচার্যদের এ শক্তি থাকে। ব্রহ্মদর্শনের পূর্বে এ শক্তি প্রয়োগ করলে পতন হয়। নিষ্কামভাবে করতে পারলে তাই অসম্ভব সম্ভব হয়। সত্যিকার নিষ্কাম হয় ঈশ্বর দর্শনের পর।

শোনা যায়, স্বামীজীর উত্তর শুনে তিলক হতাশ হয়ে যান। তখন স্বামীজী বলেন, ভারত স্বাধীন হবে পঞ্চাশ বছর পরে। তিলক বললেন, পাঁচশ' বছরেও হয় কিনা সন্দেহ। ব্রিটিশ যে কঠোর বন্ধনে বেঁধেছে। স্বামীজী বুঝি তখন বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছর পরেই স্বাধীন হবে — অলৌকিক উপায়ে।

এক একবার উত্তেজনায় পূর্ণ হতেন ভারতের দুর্দশা দেখে। কখনও অশ্রু বিসর্জন করতেন। শুনেছি, আমেরিকায় ধর্মমহাসভাতে বিজয়ের পর যখন ভক্তদের বাড়িতে থাকতেন তখন তাঁদের ঐশ্বর্য দেখে রাত্রে বসে কাঁদতেন দুঃখে। জগদম্বার সঙ্গে অভিমান করে বলতেন, মা, এ কিসের বিচার? এখানে অত ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, আর ভারতের লোক দু'মুঠো খেতে পায় না দু'বেলা। পরবার বস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, গৃহ নাই। কখনও ক্রোধে অধীর হয়ে যেতেন ব্রিটিশের উপর। বলতেন, হায়, কি দুরবস্থায় ফেলেছ তোমরা — এরা নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে পারছে না — যেন next door neighbours to brutes.

শ্রীম কি স্মরণ করিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, স্বাধীন হওয়ার পর আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে উঠতে। আর তখন উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহন করবে ভারত। কারণ ভারতের ইতিহাসে অত গভীর পতনের কথা আর নাই এখন যেমন

হয়েছে। তাই পতন যেমন গভীর, উত্থানও তেমনি অতি উচ্চ হবে। প্রকৃতির নিয়ম। ভারতই জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এসব স্বামীজীর ভবিষ্যৎ-বাণী। ঠাকুর কখনও আমাদের বলতেন, ভারত জগৎগুরু ধর্মে। ঠাকুর আর একদিন বলেছিলেন, মা এখানে একদিন নানা দেশের লোক নিয়ে এলেন। নানা পোষাক, নানা ভাষা, নানা রং। আমি ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, মা এদের কেন এখানে আনলে? মা বললেন, কলিতে এরূপ হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই তো এখন দেখা যাচ্ছে জগতের সব লোক শান্তিসুখের জন্য ঠাকুরের আশ্রয় নিচ্ছে। 'ঠাকুরের আশ্রয়' মানে, ভারতের আশ্রয়। মঠে সব দেশের লোক আসছে।

ভারতের সম্পর্কে স্বামীজীর কথা শেষ কথা। ভারতের স্বাধীনতা, নানা দিকের উন্নতি, বিদ্যা, ধন আদি সর্ব বিষয়ের directive (নির্দেশ) তিনি দিয়ে গেছেন। স্বামীজী নিজেকে নিজে জানতেন। তাই অত জোরে বলতেন, এখন দাগা বুলুক যা করে গেলাম তাতে। ঠাকুর এসেছেন ভারতকে তুলতে। ভারতের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে গেছেন। স্বামীজী অগ্রদূত। তাই তিনি ওয়েস্টে গিয়ে ভারতের শান্তিসুখের মহাবাণী ওয়েস্টকে দিয়ে এলেন। ওয়েস্ট আসবে ভারতের কাছে — একটু পরে। ওয়েস্টে শান্তি নাই। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে। ঠাকুরের আগমন তাই ভারতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — স্বামীজীর কথার যত আলোচনা হবে দেশের ততই কল্যাণ। বিদেশেরও কল্যাণ। দীর্ঘ বহুকাল ধরে পরাধীন, থাকায় ভারত নিজের পরিচয় ভুলে গিছলো। ঠাকুর এসে সেটি জাগ্রত করেছেন। তুমি ঈশ্বরের সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', এ সম্পর্ক ধরে সংসারে থাক। তা হলে সর্বাবস্থায় মনের সাম্য ঠিক থাকবে। নইলে আপদবিপদে প্রলোভনে মানুষ ভুলে যায় সব। স্বামীজী, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান — এটাকে আরো জোরে প্রচার করলেন। বলেছিলেন, তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর আপনার জন, এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর অপরকে সহায়তা কর এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে। শুধু কি দেশের লোককেই বলবে এ কথা? না, তা নয়। বিদেশের লোককে বলবে। স্বামীজী তাই আমেরিকা ও ইউরোপের ওদেরও বলেছিলেন এই কথা।

আমেরিকানদের বলেছিলেন সাবধান করে — তোমরা ঈশ্বরকে ধর। নইলে ধ্বংস হবে।

স্বামীজী ভারতকে ওঠাবার কেন অত চেষ্টা করলেন? কারণ ভারত উঠলে জগৎ উঠবে। আর ব্যক্তিগত হোক, কি জাতিগতভাবে, কিংবা জাগতিকভাবেই হোক, উঠতে হলে নিজের আত্মশক্তি উদ্বোধন করতে হবে — মানুষ অমৃতের পুত্র, এই ভাবটা জাগ্রত করতে হবে। তবেই স্থায়ী হয় জাগরণ। এ বিষয়ের experiment (পরীক্ষা) ভারতে অনন্তকাল ধরে। এটা এখানকার সাধারণ সম্পদ — একেই বলে ধর্ম ঠিক ঠিক।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ধরনের কিনা। শুধু জাগতিক অভ্যুদয়ে ভারত সন্তুষ্ট নয়। নিঃশ্রেয়সও চাই। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও চাই। এটা প্রথমে, পরে জগৎ। আত্মা, ঈশ্বর আগে — জগৎ পরে। আগে ঈশ্বরদর্শন ক'রে সকল দুঃখের নিবৃত্তি কর। তারপর সংসার কর। তখন সংসারের জালে আবদ্ধ হবে না। অথচ সংসার করতে পারবে ভাল। যদি সংসারভোগ চাও তা হলেও ভগবানকে ধরে কর। তা হলে ভোগও বেশী করতে পারবে আর সঙ্গে সঙ্গে — আমি ঈশ্বরের সন্তান — এ জ্ঞান থাকবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারটে ভারতের ঋষিগণ শিক্ষা দিয়েছেন।

'ধর্ম'কে ধরে অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, ঋষিদের উপদেশ অনুসারে — 'অর্থ' অর্থাৎ জাগতিক ভোগের সাধন উপার্জন কর। এইভাবে 'কাম'-ভোগের সময়ও 'মোক্ষ' অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবে। 'ধর্ম' যদি ছেড়ে দাও 'মোক্ষ'ও ছেড়ে দেওয়া হল। তখন থাকে কেবল 'অর্থ' ও 'কাম'। ওয়েস্টের শিক্ষায় এটা বেড়ে যাচ্ছে। তাই তো অত অশান্তি বেড়ে গেছে। ঠাকুর তাই বলেছেন, 'আমায় ধর। আমি সব করে দিব তুমি নিজে না পারলে। যেমন অসমর্থ সন্তানকে পিতা করে দেয়।'

ভারতের সংস্কৃতির মূর্তিমান বিগ্রহ ঠাকুর। তাই ঠাকুর বলেছেন, আগে ঈশ্বরকে ধরে ঈশ্বর হও মনে। তারপর বাইরে কাজ কর। তখন অপরের ভিতর ঈশ্বরজ্ঞান সঞ্চারিত হবে তোমার সঙ্গের প্রভাবে। আগে নিজে দেবতা হও, পরে অপরকে দেবতা কর। এই উপায়ে হিংসা দ্বেষও দূর হয়ে যায়। ভয়ও দূর হয়। মানুষে মানুষে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়ে।

কেবল আহার বিহারের শান্তি, শান্তি নয়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের শান্তি প্রতিষ্ঠা কর। তা হলে ধনী বা দরিদ্র, যে অবস্থায়ই থাক ঈশ্বরকে ভুলবে না। তা হলে সর্বাবস্থায় শান্তি থাকবে। তাই, আগে ঈশ্বর-জ্ঞান, পরে জগতের জ্ঞান। এটাই ভারতের সংস্কৃতি। ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এটি। নিজে দেবতা হও, অপরকে দেবতা কর। সমাজনীতি, অর্থনীতি-বিদ্যা — এসব পরে। এসব আত্মনীতির, ব্রহ্মনীতির নিচে।

বর্তমান ওয়েস্টের এ আদর্শ নয়। তাই ঐ দেশ অত বেশী অশান্ত। ভারত মূলতঃ শান্ত চিরকাল। এখন একটু অশান্ত। ভারত শান্ত হলে জগৎও শান্ত হবে।

শ্রীম কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন। শ্রীম-র শরীর অসুস্থ থাকিলে তিনি নিজের অতীত জীবনের চিত্র মনে জাগ্রত করেন — বাল্য, বিদ্যালাভ, ঠাকুরের সঙ্গে মিলন ইত্যাদি। আজও তাহাই হইল। তিনি বাল্যের আলেখ্য ভক্তদের সম্মুখে প্রকাশিত করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গতকাল উত্তরপাড়া থেকে আসার সময় ঐ বাড়ি, ঐ কথা মনে উঠলো। বাড়িতে দুর্গাপূজা হচ্ছে। শিশির তুলতে যাচ্ছি পাঁচ সাতজন দল বেঁধে। সেই রাস্তাটি মনে পড়ছে। যা সব দেখেছি, মনে তার ছাপ লেগে রয়েছে।

সেই বাড়ি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু আমার মনে সব লেখা রয়েছে। কি 'ইয়ে' (স্মৃতিশক্তি)! যা-ই দেখতাম যেন ছাপ লেগে থাকতো।

বড়রা বলতেন, যা রে শিশির আন গে। অমনি চার পাঁচজন, কখনও বেশী, দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। দুর্গাপূজায় শিশির লাগে কিনা।

ফল ছাড়ানোর ঘর। তাতে টাঙ্গান রয়েছে ল্যাম্প — এ সবই মনে পড়ছে। দেখছি, যেন কাল দেখেছি।

অন্তেবাসী — কোথায়, উত্তরপাড়ায়?

শ্রীম — না, বালীতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দুর্গাপূজায় অনেক দুর্লভ বস্তুর দরকার হয়। এর মানে, কষ্ট করে সংগ্রহ করলে মনে থাকে — এও এক রকম তপস্যা।

নানা তীর্থের জল। বৃষ্টির জল। শিশিরের জল। কত কি সংগ্রহের

ব্যবস্থা দিয়েছেন। অর্থাৎ, যা কিছু ভাল সব ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত। এটি ভারতের ভাব। শুধু তা নয়। ভাল মন্দ সবই আবার তাঁকে দিতে হয় এক অবস্থায়।

একজন ভক্ত — মন কি দেওয়া যায় ঈশ্বরকে? কাকে ঠোকরান আম কি করে তাঁকে দেওয়া যায়?

শ্রীম — এক অবস্থায় এর দরকার — সাধনের প্রথম অবস্থায়। তখন সঙ্কোচ হয়ে মনে। তাই ভাল দেয়। ভাল ফলফুল, ভাল খাদ্য, ভাল উপহার, সব ভাল দেয়। এ করে করে শেষে দেখে যে আর পেরে উঠছে না। হয় তো শরীর অসুস্থ, বা অর্থহীন, জরাগ্রস্ত। এ সব অবস্থাতে ভাল বা শুচি দ্রব্য, শৌচের সহিত আর দিতে পারা যায় না। পুরুষকার, আমি কর্তা, এই অহংকার শিথিল হয়ে যায়। তখন ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে পড়ে। তখন বলে, এই শরীর মন বুদ্ধি সব তোমার। আমি আর পেরে উঠছি না। তখন আন্তরিক প্রীতি। সে অবস্থায় ভাল মন্দ, সব তাঁর।

প্রথম প্রথম কঠোর নীতিতে বাছবিচার করা চাই। শুচি অশুচি ভাল মন্দ সব পালন করা চাই। তারপর সব তাঁর। ঠাকুরের যে অবস্থা, বালকের অবস্থা। মা ছাড়া তাঁর চলে না। তখন মা-ই সব করেন। এটা সিদ্ধাবস্থা।

সাধকের একটা অবস্থা আছে। পেরে ওঠে না সব ভাল দিতে, ভাল করতে। হয় তো শরীর অপটু, অর্থের অভাব। এ অবস্থায় শরণাগত হয় লোক। কায়মনোবাক্যে শরণাগত হলে সব ভার ঈশ্বরের উপর।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কাল মঠ খুব ভাল লাগলো। জঙ্গল ডোবা সব পরিষ্কার দেখলাম। তাতে ম্যালেরিয়া কমে যাবে।

একজন ভক্ত — মিস্ ম্যাকলাউডের প্রেরণায় ওখানে সব স্বেচ্ছাসেবক দল সৃষ্টি। মঠের ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য লীডার।

শ্রীম — হাঁ, দেখলুম বেশ instruction (শিক্ষা) দিচ্ছেন। আর সকলে কান পেতে শুনছে। পেট্রল (পাহারা) এ খুব ভাল। এতে চুরি কমবে। আর সকলের খবর নেওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো কেউ রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। কিম্বা কারও বিপদ হয়েছে। সে সব ধরা পড়বে, আর প্রতিকার হবে। এ সবই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত।

জীব শিব মুখে বললে হয় না। শিবের সেবা চাই জীবের ভিতর। পাশে অসুখ করে লোক পড়ে আছে। আর এই দিকে ভক্তিযোগ করা। তা কি হয়? এখন চাই কর্মযোগ। একেই স্বামীজী প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত বলেছেন। হাতেনাতে নারায়ণসেবা ব্রহ্মের সেবা।

বেদ বলছেন কিনা — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সবই ব্রহ্ম। ঠাকুর নিজ চক্ষে দেখেছেন — সব মা। জীব, জন্তু, মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা — সব ব্রহ্ম, সব মা। (একজন ভক্তের প্রতি) কি সে কথা স্বামীজীর?

ভক্ত — ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবের পায়॥
বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

শ্রীম — শশী মহারাজকে স্বামীজী লিখেছিলেন এটা। (শান্তির প্রতি) এই যে ডাক্তারী পড়ছো, এতে লোকের উপকার করতে পারবে। তবে পাড়া বেড়িয়ে নয়। সামনে পড়লো, তাকে দেখবে না তো কি? এইসব করতে করতে তবেই ভক্তিলাভ হয়।

২

মর্টন স্কুলের দ্বিতলের লম্বা বারান্দা। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। আজ এখানেই নৈশ ভক্তমজলিশ বসিয়াছে। শ্রীম পূর্ব প্রান্তে চেয়ারে পশ্চিমাস্য বসিয়া আছেন। শ্রীম-র ডান ও বামদিকে বেঞ্চে ভক্তগণ বসিয়াছেন। যাঁহারা পরে আসিলেন তাঁহারা সম্মুখে দূরে বেঞ্চে বসা। নিত্যকার ভক্তগণ সকলে উপস্থিত আছেন — বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, শুকলাল, মনোরঞ্জন, বলাই, জগবন্ধু প্রভৃতি অনেক ভক্ত। সন্ধ্যা হইতেই শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

এখন সাড়ে আটটা। শ্রীম আজকালের গুমট গরমে ক্লান্ত থাকেন। তাই পাঠ বা ভজন হয়। আজ শ্রীম বলিলেন, একটু কথামৃত পাঠ হোক না। অন্তেবাসী চারতলা হইতে একসঙ্গে বাঁধান চার ভাগ কথামৃত লইয়া আসিলেন। 'ঠাকুরের জন্মোৎসব' পাঠ হইতেছে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ, ১১ই মার্চ, রবিবার। একজন গোস্বামী আসিয়াছেন। নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতেছে।

একজন ভক্ত — লোক অত নামজপ করে, অত কীর্তন করে, তবুও তাদের চরিত্র বদলায় না কেন?

শ্রীম — কি করে বদলাবে? বদলানো অত সহজ কথা! মন বদলালে তো বদলাবে? নাম করে, তাতে আনন্দ হয়। কিন্তু যেই জপ বা কীর্তন বন্ধ হয়ে যায় অমনি মনে এসে সংসার দাঁড়ায়, কামিনী কাঞ্চন। ঘরবাড়ি পয়সাকড়ি স্ত্রী পুত্র কন্যা এসব সামনে এসে যায়। যেমন একটা ভাণ্ড। তাতে চাল রয়েছে। তাতে ঘি রাখতে হবে। চাল বের করে ঘি রাখতে হবে। তেমনি মনে থাকে মানুষের বিষয়চিন্তা — বাড়িঘর স্ত্রী পুত্র কন্যা এসব। এগুলি সরালে তবে তো আসবে ঈশ্বরচিন্তা? ঈশ্বর আসতে চান, বসতে চান হৃদয়ে। কিন্তু বসবার স্থান কোথায়?

এখন এসব বিষয়চিন্তা খালি হয় কি করে? ঠাকুর বলতেন, সাধুসঙ্গ চাই। সাধুসঙ্গ করলে বিষয়চিন্তাও দূর হয়ে যায়। কারণ সাধুদের দেখে তাদের মত করতে ইচ্ছা হয়। সাধুদের মনে এক চিন্তা — ঈশ্বর কিসে দর্শন হয়। এঁদের সঙ্গ করলে, সেবা করলে ক্রমে এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন তাঁদের ভালবাসায় মন থেকে বিষয়-চিন্তা চলে যায়। যখন সাধুকে বুঝবে, তাঁর জীবনচরিত্র দেখবে, তখন মনে রাখতে চেষ্টা করবে ঈশ্বরকে সাধুদের মত।

কথাটা হচ্ছে, তপস্যা চাই। তপস্যা মানে, তাঁকে হৃদয়ে বসাবার দৃঢ় সংকল্প প্রথমে চাই। তারপর মনে যারা বসে আছে — পুত্রকন্যা বিত্তাদি, তাদের ঈশ্বরভাবে মণ্ডিত করতে হয়ে — spiritualised করা। তাদের ঈশ্বরের রূপ বলে চিন্তা করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করা — হে ঈশ্বর, এদের ভিতর তোমাকে দেখার শক্তি দাও। আর নিজের বিত্ত, সময়, চেষ্টা দান করতে হয়। সাধুসেবায় লাগাতে হয়। এসব করতে না পারলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হয় — প্রভো, করে দাও মন শুদ্ধ। আমি পারছি না। ব্যাকুল হয়ে বললে তিনি করেন।

এসব করে কই লোক, তাঁকে আন্তরিক বলে কই লোক? ভাবে কুটুম্বরা রেগে যাবে। কাজেই যেমন মন ছিল তেমনি থাকে। পাথরের নিচে জল আছে। কষ্ট করে পাথরটা সরালে তো জল আসবে। মনের দরজা বন্ধ রেখে, মুখে নাম করলে কি হবে? মনে দুর্গন্ধ, সেখানে ভগবান

যান কি করে?

সৎসঙ্গ করা। আবার যা বলেছেন অবতার, তা পালন করা চাই। দেবসেবা, সাধুসেবা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা চাই।

ঠাকুর বলেছেন, যদি এসব কিছুই না পার, তবে আমায় ধর। আমি করে দিব সব। অন্তরের সঙ্গে বলে কোথায় লোক? খালি মুখে বলে। মন, মুখ, কাজ — এ তিনটা এক হলে তখন হয়। তখন একবার নাম করলে মানুষ বিহ্বল হয়ে যায়।

কলসী একস্থানে, গ্লাস একস্থানে। কলসীর জল ঢালছে। কলসী খালি। কিন্তু গ্লাসে এক ফোঁটাও নাই। কলসীর নীচে গ্লাসরূপী মনকে বসাও। কলসীর জল গ্লাসে পড়বে। এক ফোঁটাও নষ্ট হবে না। তখন পান কর, তৃষ্ণা মিটবে।

মনে একটা, মুখে আর একটা, কাজে আর একটা — এই ত্রিভূজ হলে হবে না। এক লাইনে তিনটে আনতে হবে চেষ্টা করে। তবে ঈশ্বর হৃদয়ে বসবেন। একডাকে এসে পড়বেন। চেষ্টা আর প্রার্থনা চাই।

বড় জিতেন — তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হচ্ছে না।

শ্রীম — তাঁর কৃপা হয়েছে বলেই তো এসব কথা শুনতে পারছেন। আবার শুনতে ভাল লাগছে। এখন তিনি যা বলেছেন, তা করার চেষ্টা করা। বলেছেন তো — গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা কর। এসব করলে আর এক কিস্তি কৃপা আসবে।

এদিকে সংসারের সব কাজ করছে। কত খাটুনী আফিসে। এসব চেষ্টা করা চলে। কেন? না পুত্র কন্যাকে ভাল খাওয়াতে পরাতে পারবে। স্নেহটি হলো এসব করার মূল উৎসাহ। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কর কিছু বললে বলে সময় নাই। চেষ্টা আসছে না। একজন ম্যাট্রিক পাশ না করে যদি বলে, আমি বি-এ পড়বো, অথবা যদি বলে, আমি পড়বো না, কিন্তু সার্টিফিকেট দাও — তা হলে হয় কি?

ডাক্তার — কেন তিনি আমাদের ফেলেছেন সংসারের এসব নানান্ ঝঞ্ঝাটে?

শ্রীম — ফেলেছেনও তিনি আবার বের হবার পথও বলে দিচ্ছেন তিনি। তুমি করবে না, আবার বলবেও না, তা হলে কি করে হয়?

মোহন — একজন বলছিল, আমি কথামৃত রোজ পড়ি। অনেকবার বইগুলি শেষ করেছি। রোজই রাত্রে শোবার আগে পড়ে শুই। খুব ভাল লাগে। কিন্তু কিছু করতে বললে তা ভাল লাগে না।

শ্রীম — এ যেন বাজনার বোল মুখস্থ করা। হাতে আনতে চায় না।

মোহন — কথামৃত পড়তে তো ভাল লাগে। নইলে পড়বে কেন?

শ্রীম - পণ্ডিতরাও শাস্ত্র পড়তে ভালবাসে, শ্লোক আবৃত্তি করে। লোককে লেকচার দিয়ে বোঝায় — এতে যেমন ভাল লাগে। ঐরূপ নিত্য-পড়া কথামৃত পড়ায় ভাল লাগছে।

Day labourer (দিনমজুর) যেমন। রোজ দু'টাকা কামাচ্ছে, দু'টাকাই খরচ হয়ে যাচ্ছে। একটু পড়লো, একটু সৎসঙ্গ করলো, একটু নাম করলো। এতে যে আনন্দ হয় একটু পরেই সে আনন্দ বিলীন হয়ে যায়। হৃদয়ে ধরে রাখতে পারে না। হৃদয় মন আবর্জনায় পূর্ণ।

এই নামকীর্তন, নামজপও সেইরূপ। আনন্দ হচ্ছে আবার সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যাচ্ছে জমছে না কিছু। তাই মনের সঞ্চিত সংস্কার শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না। ফলে ঐ সংস্কারের দাস হয়ে অবশ হয়ে কাজ করে। অর্জুনকে তাই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ — 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। এটা জয় করতে হলে ভগবানের ব্যবস্থা নিতে হয়। চেষ্টা করতে হবে, কাজ করতে হবে। কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে হবে।

ঠাকুর এবার কত সহজ পথ বলে দিয়েছেন। কেঁদে কেঁদে বল, তিনি করে দেবেন সব। শিশুর মত বল। লোক করবে না কিছু। খালি জ্যাঠামী করে।

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় সমবেত ভক্তগণের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেন এই সংসারে ফেলেছেন, তার উত্তর ঋষিরা দিয়েছেন। বলেছেন, এ তাঁর খেলা। আমরা এই বুঝেছি — তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেছেন। তিনি নিজেই তাঁর মায়ার সাহায্যে এই বিশ্ব হয়েছেন। তিনিই নিমিত্ত-কারণ, আবার উপাদান-কারণ। তিনিই জীব, আবার তিনিই হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী। যতদিন এটা না বোঝা যায় ততদিনই জীবত্ব। জীবের সুখ, দুঃখ। যখন বোঝা যায়, তিনিই কর্তা জীব অকর্তা,

তখনই জীবের জীবত্ব নাশ হয়ে যায়, শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন শত দুঃখকষ্টেও জীব বিচলিত হয় না। এটাই মোক্ষ।

তিনিই এই সেদিন মানুষ হয়ে এসে মুক্তির পথ বলে দিয়ে গেছেন। বলেছেন সংসারে থাক বড় ঘরের দাসীর মত। সব কাজ করে ঘরের, কিন্তু মন থাকে গ্রামে পুত্রকন্যার উপর। আর গৃহিণী যা দেয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। ঠাকুর বলেছিলেন, নিজেকে অকর্তা জেনে কর্তার মত থাক। আর বলেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে একটা প্রীতি-সম্পর্ক বানিয়ে থাক। আরও বলেছিলেন, যাঁরা এভাবে সংসারে থাকেন তাঁদের সঙ্গ কর, সেবা কর। তাঁরা সাধু — তাঁরা ওয়ার্কশপে নেমে কাজ করছেন। তাঁরা বুঝেছেন, ঠাকুরের পথই মুক্তির পথ। জন্মমরণ-চক্রের হাত থেকে রেহাই পেলে তখন কেবল আনন্দ। আর জন্মমরণ চক্রের ভিতর থেকে নিজেকে তাঁর দাস মনে করে যিনি কর্ম করেন তার ফল তাঁকে দিয়ে দিলেন — এই জন্মই শেষ জন্ম হয়ে যায়। যেমন বড়লোকের গোমস্তা। সে সব কাজ করে মালিকের জন্য, লাভ লোকসান সব মালিকের। তার কর্তব্য, কাজ করে যাওয়া — ফল মালিকের।

কোন কথাটা বাকী রেখেছেন? জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত যত সমস্যা আছে সব নিজে সমাধান করে গেছেন। তাঁর ভক্তদের জীবনগুলি সব commentary (ভাষ্য)। ভক্তরা কেহ কেহ সাধু, আবার গৃহী। উভয়কে পথ দেখিয়ে গেছেন। এই পথে চললে সহজেই এই গোলকধাঁধার হাত থেকে রেহাই পায়।

তা ছাড়া সকলেই যদি রেহাই পায় তবে তাঁর জগৎলীলা চলে কি করে? দুই-ই থাকবে — মুক্তি ও বদ্ধ। যার যা খুশি সে তাই নেয়। বদ্ধ মোক্ষ দুইয়ের কর্তা ঈশ্বর। যে যা চাও তাই নাও। তবে বলেছেন, যদি স্থায়ী শান্তিসুখ চাও তবে আমার চিন্তা কর। আমি তোমাদের মুক্তি দিব। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি আমার ঐশ্বর্য। 'সমাধি' মানেই মোক্ষ।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — এই যারা দিনরাত ঘ্যান ঘ্যান

করে তারা তাঁর কথা নেয় না কেন, বলতে পারেন?

সাধুসঙ্গ করুক, সাধুসেবা করুক না দেখি — কেমন ফল না হয়! আর তিনি যা বলেছেন তা পালন করতে চেষ্টা করুক। বলেছেন তো, যারা বিয়ে করে নাই তারা যেন আর বিয়ে না করে। আর যারা বিয়ে করেছে, দুই একটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেলে ভাইবোনের মত থাকুক। ছেলে লায়েক হলে কামাই করে খাক। মেয়ের বিয়ে দাও সৎ পাত্রে। পিতামাতার সেবা কর। স্ত্রীর জন্যে বাসস্থান ও মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা কর। এইগুলি moral duties (ঈশ্বরের তরফ থেকে কর্তব্য)। তা করবেন না কিছু, খালি ঘ্যান ঘ্যান করলে কি হবে? রোগ হয়েছে বলে চীৎকার করলে কী হবে? ডাক্তারের ঔষধ খাও। ডাক্তার ঠাকুর। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ ফিরে যায় না। না চাইতেই কত দিচ্ছেন। কর কর, কিছু কর। না পারলে কেঁদে বল, তিনি সব করে দিবেন। হাতে অমৃতভাণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁদ কাঁদ, বল — করে দাও। নিশ্চয় করে দিবেন। তাঁর ভক্তদের সব করে দিয়েছেন। তিনি যে আপনার মা বাপ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২০শে জুলাই, ১৯২৫ খ্রীঃ, সোমবার।

একাদশ অধ্যায়

গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন — তাঁর এক একটি স্ফুলিঙ্গ

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের লম্বা বারান্দা। পূর্ব প্রান্তে শ্রীম বসিয়া আছেন জোড়া বেঞ্চে। শ্রীম-র সম্মুখে হাই বেঞ্চ। শ্রীম-র পিছনে ডান হাতে উত্তরের দরজা। এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। আজ ২৫শে জুলাই, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

শনিবারের ভক্তগণ অনেকক্ষণ যাবৎ বসিয়া আছেন শ্রীম-র অপেক্ষায় — ভাটপাড়ার ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী ও সঙ্গী, একটি সুপুরুষ নূতন ভক্ত, হরিপদ, সতীশ ও অমূল্য। অমূল্য কখনও কখনও আসেন।

শ্রীম চারতলার নিজের কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। কখন একান্তে ধ্যান করেন, কখনও বিশ্রাম করেন। অন্তেবাসী এতক্ষণ ধরিয়া ভক্তদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন করিতেছিলেন। বিনয় এবং বলাইও আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ডাক্তার বামনদাস মুখার্জী ও চন্দ্রবাবু আসিয়াছেন। সাঁতরাগাছির একজন ভট্টাচার্য আসিয়াছেন শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিতে উৎসবে।

শ্রীম এইমাত্র নিচে নামিয়াছেন। ভক্তগণ সকলে দাঁড়াইয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা ও প্রণাম করিলেন। শ্রীম সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সাঁতগাছির ভট্টাচার্য দাঁড়াইয়া করজোড়ে শ্রীমকে নিবেদন করিতেছেন, আগামী শনিবার সাঁতরাগাছি শংকর মঠে উৎসব হবে। দয়া করে কষ্ট করে গেলে সকলে বড়ই কৃতার্থ হবে। শ্রীম উত্তর করিলেন thanks (ধন্যবাদ)। কিন্তু বুড়োদের নড়াচড়ায় বড় বাধা। ইচ্ছা করলেই হয়ে ওঠে না। শরীর বাধা দেয়।

এইবার কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ডাক্তার বামনদাসের প্রতি) — বাবা, অত বড় সাহেব আর কত লক্ষ টাকা বৎসরে আয়! কিন্তু (বেলুড়) মঠে গিয়ে রাত্রিবাস করছেন। (সি. আর) দাশমশায় মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করতেন।

তা হলে কি বুঝতে হবে? না, ভিতরে বৈরাগ্য রয়েছে। সেটা মাঝে মাঝে বের হতে চায়। উপরে একটা আবরণ রয়েছে। তাতেই বাধা হচ্ছে। সে আবরণটা সরে গেলে একেবারে সর্বস্ব ত্যাগ। শেষে এঁর তাই হলো। কাগজে বের হয়েছে যখন ছাড়েন সব, তখন নাকি বার লক্ষ টাকা আয় ছিল ব্যারিষ্টারীতে। সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে একেবারে ফকির হয়ে গেলেন। এ যেন দ্বিতীয় বুদ্ধের ত্যাগ!

এসব ভারতের ইতিহাস। সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয় এদেশে। তারপর সেবা। গান্ধীমহারাজও তাই করেছেন।

তাই, স্বামীজী বলেছেন, Renunciation and service — this is the national ideal of India. Intensify it, and the rest will take care of itself. সর্বস্বত্যাগ ও সেবা। এটাই ভারতের জাতীয় সনাতন আদর্শ। ত্যাগ যত বাড়বে সেবাও ততই বাড়বে। আর তা নির্মল ও নিঃস্বার্থ হবে। তা হলেই জাতীয় সকল সমস্যার আপনিই সমাধান হবে। স্বামীজীর নিজের জীবনেও এই সত্য পরিস্ফুট।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাস এই। ঋষিরা সব সর্বত্যাগী ছিলেন। তাঁরাই ভারতের সমাজ সংরক্ষক ও সেবক। তাই ভারতের রাজা সব রাজর্ষি। মানে ঋষি ও রাজা। 'ঋষি' মানে ঈশ্বরদ্রষ্টা। 'রাজা' মানে, শাসনসমর্থ অধিপতি। এঁরাই সর্বত্যাগী ঋষিদের অনুজ্ঞার অধীন হয়ে রাজ্য শাসন করতেন। এতে ভোগ আছে। ঈশ্বরদ্রষ্টা হলেও ভোগে আটকে যেতে পারেন। তাই তাঁদের পেছনে একজন সর্বত্যাগী ঋষি dictator (পরামর্শদাতা) থাকতেন। রামের পরামর্শদাতা বশিষ্ঠ, আর জনকের যাজ্ঞবল্ক্য।

ঠিক ঠিক সেবা সম্পূর্ণ ত্যাগ না করলে হয় না। ঘরে থেকে সেবাতে ত্রুটি আসতে পারে। তাই ব্যবস্থা, রাজর্ষিদের উপর সর্বত্যাগী ঋষি।

ওয়েস্টে কোথায় পাবে এ আদর্শ? কে কোথায় শুনেছে এ কথা? আগে সর্বস্ব ত্যাগ কর, তারপর সেবা কর। দেখ না, ভারতের প্রাচীন

সনাতন ইতিহাস কেমন নূতন মূর্তি ধারণ করছে। ভারতের রাজনীতির পরিচালক সর্বত্যাগী গান্ধীমহারাজ, দাশমশায়, এঁরা। ওয়েস্টের লোকেরা কল্পনাও করতে পারবে না এ আদর্শের কথা। সর্বত্যাগ কর আগে, পরে যাও জনসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি সৎ কাজ করতে।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় দাশমশায়ের গুণগান করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বাবা, কত বড় ব্রাহ্মর ছেলে! আর একেবারে সব উল্টে দিলেন। দাশমশায়ের পিতা ভুবনবাবু খুব আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। আর বড় এটর্ণি। কিন্তু ছেলে শেষে সবেতে অন্যরকম হয়ে গেলেন। শুনছি, দাশমশায়ের 'ট্রাস্ট ডিডে' লেখা আছে, নিত্য বিগ্রহসেবা করতে হবে। (মৃত্যুর পর হিন্দুমতে তাঁর দানসাগর শ্রাদ্ধ হয়)।

দাশমশায়ের বাবাকে আমি একবার দর্শন করেছিলাম তাঁর আফিসে। এ. এম. বোসের সঙ্গে গিছলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একটা সোসাইটি করেছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন আমার বয়স একুশ বছর। আমি ছিলাম তার সেক্রেটারী। আর এ.এম. বোস ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অবতারকে মানুষ কি চিনতে পারে? তিনি না বোঝালে কে তাঁকে বুঝতে পারে? (সহাস্যে) স্বামীজী তখন নূতন যান। আমরাও মাসতিনেক যাচ্ছি ঠাকুরের কাছে। স্বামীজী একদিন আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, খুব গোপনীয় একটা কথা আছে। কাউকে বলবেন না বলুন — খুব private (গোপনীয়) (হাস্য)। আমি বললাম বলতে। তখন স্বামীজী বলছেন, বলে কি লোকটা (ঠাকুর) — ন'দের গৌরাঙ্গের কথা শুনেছিস? আমি সেই। লোকটা পাগল হয়েছে নাকি? ও বলে কি?

আর একদিন ঠাকুর বললেন স্বামীজীকে, ওরা যে বলে, অর্থাৎ ঠাকুর অবতার — তোর কি মনে হয়? স্বামীজী বললেন, ওরা বলে বলুক। আমি যতদিন না বুঝবো, বলবো না।

এদিক দিয়ে শরীর যায় — এতো কষ্ট। তবুও স্বামীজী ভাবছেন, এখন যদি বলেন 'অবতার', তবে বুঝি। যেই মনে হওয়া, অমনি ঠাকুর

বললেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ'।

তিনিই আবার প্রচার করলেন অবতার বলে আমেরিকায়। আবার যত মঠ আশ্রম আছে তাতে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে নিত্য — তাঁরই স্বরচিত। তাতে বলেছেন, তুমিই নির্গুণ, তুমিই গুণময়। আবার প্রণাম করছেন — 'অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো' বলে। আবার আর একটা স্তবে আছে — আমি অজ্ঞান, কিছুই বুঝতে পারি নাই — 'তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো'!

রামচন্দ্রকে মাত্র ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি চিনেছিলেন অবতার বলে। অন্যরা বলতেন, তুমি দশরথের ছেলে। আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি। তুমি সুশীল ও জ্ঞানী। তাঁদের নিষ্ঠা নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্মে। তাই বলবেন না তো কি? কিন্তু ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষিকে চিনিয়েছিলেন — ঐ পরব্রহ্মই আমি — রাম।

একবার ভক্তরা ঋষিদের উপর কটাক্ষ করেছিলেন, অন্য ঋষিরা অবতার বলে রামকে গ্রহণ না করায়। অমনি, ঠাকুর protest (প্রতিবাদ) করে বললেন, আপনারা অমন বলো না। যার যাতে রুচি। তিনিই সাকার, তিনিই নির্গুণ নিরাকার। স্বামীজীর নিষ্ঠা ছিল নিরাকার নির্গুণে। ঠাকুর বলতেন, লরেন অখণ্ডের ঘরের। ঠাকুর তাঁকে তাই নির্বিকল্প সমাধি দেন প্রথমে। পরে বুঝেছিলেন, তিনিই ঐ। অর্থাৎ ঠাকুরই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। এখন নররূপী অবতার।

দেরীতে বুঝেছিলেন, ঠাকুর অবতার। তা হলেই বা। পদ্মফুল ফোটে দেরীতে। কিন্তু থাকে অনেকদিন। অন্য ফুল আজ ফুটছে, কাল ঝরছে। ঠাকুর বলতেন, নরেনকে দেখলে মন অখণ্ডে বিলীন হয়ে যায়। খণ্ড ভাব সব দূর হয়ে যায়। কখনও বলতেন, নরেন আমার শ্বশুরঘর। আবার কখন বলতেন, নরেন আমার মাথার মণি। কখনও বলতেন, নরেন সায়র দীঘি।

একজন ভক্ত — 'শ্বশুর ঘর' — মানে কি?

শ্রীম — ঠাকুরে ভক্ত ও ভগবান, দু'টি ভাবই রয়েছে একাধারে। ভক্তভাবে, তিনি ছিলেন মায়ের ছেলে হয়ে লোকশিক্ষার জন্য। স্বামীজীর সহজ ভাব নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্মে। এটা হলো শেষ কথা। ঠাকুর বলতেন, 'নী'। সকলকেই সেখানে যেতে হবে। এটাই জীবের অন্তিম গন্তব্যস্থল।

মেয়ের জন্ম বাপের বাড়িতে। বৃদ্ধি, শিক্ষাও বাপের বাড়িতে। কিন্তু এখানে তার স্থান অল্প দিন। বিয়ে হবে। তখন শ্বশুর বাড়িই তার বরাবরের স্থান। নরেন আমার শ্বশুর ঘর বলে ঐ 'নী'র ইঙ্গিত করতেন। শেষ স্থান ঐ। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরমব্রহ্মই চরম গম্যস্থল।

শ্রীম (ডাক্তার বামনদাসের প্রতি) — আপনি উঠুন। অনেকক্ষণ বসেছেন। উঠুন উঠুন। ওদিকও দেখতে হয়।

শ্রীম-র কথামৃতপানে বামনদাস মগ্ন। সংসার সাময়িক ভুল হইয়া গিয়াছে। শ্রীম সংসারের কর্তব্যে তাঁহার মনকে টানিয়া আনিয়াছেন। বামনদাস অভিভূতের মত প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কথামৃত যে 'তপ্তজীবনং'!

২

শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে দাশমশায়, গান্ধীমহারাজ, এঁরা সবাই তাঁর এক একটি স্ফুলিঙ্গ। এঁরা আবার তাই স্বীকার করে নিচ্ছেন।

গান্ধীমহারাজ মঠে গিছলেন। ঠাকুরের একটা life (জীবনী) বের হয়েছে। গান্ধীজী ভূমিকায় বলেছেন, His life enables us to see God face to face.' তাঁর জীবনচরিত ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেয় একেবারে আমাদের চোখের সামনে এনে, যেমন আমরা একজনকে আর একজন দেখি তেমনি করে। সত্যিই তা পড়লে মনে হয় যেন ঈশ্বরকে চোখের সামনে দেখছি।

দাশমশায়ও কখনও বলেছেন, এক একবার মনে হয়, সব ছেড়ে দি'। কিন্তু যখনই স্বামীজীর কথা মনে হয় তখনই ফিরে দাঁড়াই। বাংলার নববেদান্তের প্রচারের ভার স্বামীজী বঙ্গীয় যুবকদের উপর ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

এটা বাংলার নববেদান্ত — জীবশিবের সেবা। নরনারায়ণের সেবা। এসব দৈবী ভাব দাশমশায়ের ভিতরে ছিল। তাইতো সব ছেড়ে

সন্ন্যাসী হয়ে নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করলেন।

একজন ভক্ত — এঁরা তো মহাপুরুষ। কিন্তু সাধারণ লোকের উপায় কি — যে গৃহস্থ ফেঁসে গেছে?

শ্রীম — তাঁদের জন্যেই ঠাকুরের বেশী ভাবনা। তাদের উপায় — ঘরকে আশ্রম বানাতে চেষ্টা কর। পরিজনকে ভগবানের রূপ মনে করে তাদের ভিতর নারায়ণের সেবা কর। আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্যাগীর সঙ্গ কর নিত্য। আর সেবা কর। এঁদের দেখলে, এঁদের সেবা করলে মনে হবে, এঁরা সব ছেড়ে ঈশ্বরকে ধরে আছেন। তা হলে, নিজেরও তাঁকে ধরে সংসারে থাকার ইচ্ছা হবে, উদ্দীপন হবে।

ঠাকুর একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) তাঁর দ্বিতীয় দর্শনের দিনে বলেছিলেন, ঘরের সবাইকে ঈশ্বরের সেবা করছি, এইভাবে সেবা করবে। বাইরেও দেখাবে যেন তারা কত আপনার পরিজন। কিন্তু মনে মনে জানবে, এরা তোমার কেউ নয়, তুমিও তাদের কেউ নও। ঈশ্বরই তাদের ও তোমার আপনার।

সত্যই তো তিনি সকলের আপনার। মানুষ এটা ভুলে যায় তাঁর মোহিনী মায়ায়। মানুষ মনে করে বাপ মা ভাই বন্ধুই আপনার।

তাঁর কৃপা হলে তখন দেখে, — না, কেউ তো আপনার নয় ঈশ্বর ছাড়া। এই জন্মের আগে যারা আপনার ছিল তারা তো সঙ্গে আসে নাই। আবার এই শরীরের মৃত্যুর পরও যাদের আপনার বলা হয় তারা কেউ সঙ্গে যাবে না। ঈশ্বরই কেবল জন্মের সময় সঙ্গে থাকেন, আবার মৃত্যুর পর সঙ্গে যাবেন। কতদিন থাকেন? না, যাবৎ না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়, মানে, মুক্তি হয় জন্মমরণ-চক্র থেকে।

এ কেমন? না, ছেলে রাগ করে বের হয়ে গেছে — খাবে না। ভয় দেখাচ্ছে, জলে ডুবে মরে যাবে। মা তখন যেমন ছেলের পেছনে পেছনে দৌড়ায়, যাবৎ না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে। তেমনি ভগবান জীবের সঙ্গে সঙ্গে সকল যোনিতে ভ্রমণ করেন। কিন্তু unattached (নিঃসঙ্গ)।

বেদে বেশ একটা উপমা দিয়ে বলেছেন এ কথাটা। (ভক্তদের প্রতি) কারও মনে আছে কি, ঐ মন্ত্রটা?

একজন ভক্ত — দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে॥

তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

এর অর্থ এই — একই দেহবৃক্ষে দু'টি পাখী বাস করছে সখ্যভাবে। এদের একটি মিঠে তেতো ফল খাচ্ছে। অন্যটি কেবল সব দেখছে। মানে, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। জীবাত্মাই সুখ দুঃখ ভোগ করে কর্মফলে। পরমাত্মা সঙ্গে থেকেও উদাসীন — কিছুই খাচ্ছে না। এর অর্থ হলো — সংসারের ভোগ নিও না যেমন পরমাত্মা অন্তর্যামীরূপে জীবের হৃদয়ে থেকেও ভোগ নেন না। বড় ঘরের দাসীর মত সংসারে থাক — ঠাকুরের কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটি পক্ষী কিছুই খাবে না, উদাসীন। এটি হলো অন্তর্যামী, ঈশ্বর। আর একটি পক্ষী অম্লমধুর ফল খায়। এর মানে হলো — জীব। সে সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করে। আর তাতেই কর্মফল ভোগের জন্য নানা জন্ম নেয়।

যে এই রূপকের অর্থ বুঝে সে দ্বিতীয় পক্ষীর ন্যায় উদাসীন হয়ে সংসার করে — তা সে গৃহেই থাকুক আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই হোক। বড় ঘরের দাসীর মত সংসারে থাক। সব কাজকর্ম কর, কিন্তু ফলভোগ করো না। এরূপ থাকলে তারও আর জন্ম হবে না। মুক্ত হয়ে যাবে।

ডাক্তার — ঈশ্বর কেন থাকেন জীবের সঙ্গে সঙ্গে?

শ্রীম — ঈশ্বর থাকেন বলেই তো শরীরটা চলছে। তিনি যখন বের হয়ে যান জীবের সঙ্গে, তখনই তো মৃত্যু। এটা ছোঁয় না লোক। যে শরীরের জন্য অত যত্ন সেটা জ্বালিয়ে দেয়। পচে যায় না জ্বালালে।

ডাক্তার — ভক্ত বা জ্ঞানী কাকে বলে?

শ্রীম — যে ঈশ্বরের এই খেলাটা ঋষি-অবতারের মুখে শুনে বিশ্বাস করে, আর নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকে, তাকেই ভক্ত বলে, জ্ঞানী বলে। সংসারের সব কর কিন্তু benefit (লাভ) নিজে নিয়ো না, অর্জুনকে এই কথা কৃষ্ণ বলেছিলেন।

ডাক্তার — আগেই বলেছেন, ঈশ্বর জন্মের আগে জীবের সঙ্গে থাকেন। আবার মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যান নূতন জন্মে। তা হলে তো তিনিই আমাদের সঙ্গে এখনও আছেন, পরমাত্মীয়।

শ্রীম — হাঁ। এটা জেনে যে ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাঁকে আগে পূজা করে, সেবা করে — পরে করে সংসারের কুটুম্বের সেবা, তাকেই ভক্ত বলে, জ্ঞানী বলে।

কিন্তু তাঁর মহামায়ায় লোক এটা ভুলে যায়। যাকে কৃপা করে তিনি এটা স্মরণ রাখার শক্তি দেন সে-ই জ্ঞানী। জ্ঞানী মানে, যে জানে আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর কর্তা, এটা জানার নাম জ্ঞান। ঈশ্বর সত্য জগৎ মিথ্যা এটা জানার নামও জ্ঞান। আর ভক্তি, ঈশ্বরকে মনেপ্রাণে ভালবাসা। তাঁকে কেন ভালবাসা? তিনি যে জীবের অনন্তকালের বন্ধু, তাই। আপনার জন জেনে ভালবাসার নাম ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি একই জিনিস। ভাবনাভেদে ভিন্ন দেখায়। তাই দুই নাম, বস্তুতঃ এক।

ডাক্তার — মুক্তি মানে কি?

শ্রীম — জন্মমৃত্যুর আবর্তন থেকে ছুটি পাওয়া। জন্ম হলেই মৃত্যু হবে। আবার মৃত্যু হলেই নূতন জন্ম হবে। এই জন্মমরণ-চক্র থেকে রেহাই পাওয়ার নাম মুক্তি।

ডাক্তার — কি করে রেহাই পাওয়া যায়?

শ্রীম — এই চক্রের যে পরিচালক তাঁর শরণ নিলে। তিনি তাঁর মায়াশক্তি দিয়ে এই চক্র চালাচ্ছেন।

ডাক্তার — মুক্তির রূপ কি?

শ্রীম — সদাশান্তি-আনন্দ-সুখ প্রাপ্তি। অশান্তি-নিরানন্দ-দুঃখের হাত হতে নিষ্কৃতি।

শ্রীম নীরব। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, একটু গান হোক না? নিত্যকার ভক্তগণ এতক্ষণে সকলে আসিয়া একত্রিত হইলেন।

একজন ভক্ত গান গাহিতেছেন —

গান। চল গুরু দুজন যাই পারে,
আমার একলা যেতে ভয় করে।
এই দেহ ছিল শ্মশানের সমান,
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুলবাগান॥
তার সৌরভেতে আকুল করে,
মুনি ঋষির মন হরে।
চল গুরু দুজন যাই পারে॥

গান (সমবেত)। রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল রে আমার মন।
যুগ অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ॥ ইত্যাদি।

এখন রাত্রি আটটা। সাঁতরাগাছির ভক্ত করজোড়ে শ্রীমকে বলিতেছেন অতি দীনভাবে — কৃপা করে শনিবারে চরণধুলো দিলে সকলের আনন্দ হবে। শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, thanks, your invition is accepted on condition of fine weather and health. (আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হলো। দিন ও স্বাস্থ্য ভাল থাকলেই হবে)।

৩

দক্ষিণেশ্বর মন্দির। শ্রীম দক্ষিণাস্য দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম-র পশ্চাতে কুঠি। আর সম্মুখে মন্দিরাঙ্গন প্রবেশের উত্তর দ্বার।

শ্রীম-র পরণে সাদাপাড় ধুতি। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী। আর বাম স্কন্ধে ভাঁজ-করা খদ্দরের চাদর লম্বমান। পায়ে কাল বার্নিশকরা চটিজুতা। আবক্ষ শ্বেতশ্মশ্রু। বিরলকেশ শিরোদেশ ভক্তি ও ভাবেতে কিঞ্চিৎ সম্মুখে অবনত। সম্মুখঠেলা 'শালগ্রাম'-সদৃশ নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ।

শ্রীম এইমাত্র ডাক্তার বক্সীর মোটর হইতে নামিয়াছেন। তাঁহার দুই পাশে দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাস, অমৃত ও ডাক্তার। এখন অপরাহ্ন ছয়টা।

একটি ভক্ত মধ্যাহ্নে কাশীপুরে ডাক্তার বক্সীর গৃহে ভোজন করিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়াছেন। দর্শনাদি সমাপন করিয়া তিনি এখন ফিরিতেছেন। উত্তরের ফটক দিয়া তিনি বাহির হইলেন। সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীম। বিস্মিত হইয়া তিনি শ্রীমকে যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। শ্রীম স্মিতহাস্যে করজোড়ে প্রণাম গ্রহণ করিয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে ভক্তগণ।

শ্রীম ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ও অল্পক্ষণ মেঝেতে ধ্যান করিয়া পূর্বদক্ষিণ দরজা দিয়া বাহির হইলেন অঙ্গনে। দক্ষিণ দিতে চলিতেছেন। ডানহাতে উত্তরের সারির শিবমন্দিরে আরোহন করিবার সিঁড়ি। উত্তর দিক হইতে তৃতীয় সিঁড়ির আড়াই হাত দক্ষিণে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। এখানে ঠাকুর বসিতেন, কখন একা, কখন শ্রীম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। শ্রীম-র পঞ্চম দর্শনে ঠাকুর শ্রীম-র সহিত এইস্থানে

বসিয়াই ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন। আর ব্যথিত হইয়া জগদম্বার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। শ্রীম-র এইরূপ দৃশ্য দর্শন এই প্রথম। জগদম্বাকে বলিয়াছিলেন, মা, সকলেই বলে আমার ঘড়ি ঠিক। কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক নয়। তুমি যা বল, তাই ঠিক। আমি তোমার কথাই মানবো।

আর বলিয়াছিলেন, মা, তোমার খ্রীস্টান ভক্তরা কিরূপে তোমায় ডাকে তা দেখবো।

শ্রীম-র ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা। তিনি শুনিয়াছেন, ঈশ্বর অতি উচ্চে কোথাও থাকেন। আজ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দৃশ্য সত্য কি মিথ্যা — ঠাকুর কি সত্য সত্যই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন — তাঁহার মনে এই বিচার উপস্থিত হইল। ঠাকুরের এই 'কথা কওয়া' প্রলাপমাত্র, ইহাও তাঁহার মন লয় না। কারণ প্রথম দর্শনেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিমানব বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। আবার ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ কথা কয়, এই কথাও তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় কখনও শুনেন নাই। এই দ্বন্দ্ব মনে চলিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়, শ্রীরামকৃষ্ণের এই অতি মানবীয় আচরণ, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ বার্তালাপ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকাংশে প্রস্তুত। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও অসত্য আচরণ করিতে পারেন না। আর মস্তিষ্কের বিকার ইহা, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

এই স্থানটি শ্রীম-র নিকট অতি পবিত্র। তাঁহার জীবনের একটি অতি শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের স্থান। এই স্থানের এই দৃশ্য যেন শ্রীমকে দেবজীবনের সুউচ্চ ও উজ্জ্বল পথে জোর করিয়া আরোহণ করাইয়া দিয়াছে। তাই তিনি অতি শ্রদ্ধায় ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণস্পৃষ্ট স্থানকে সর্বদা প্রণাম করিয়া থাকেন।

এবার শ্রীম আসিয়া দাঁড়াইলেন রাধাকান্ত মন্দিরের সম্মুখে অঙ্গনে। সিঁড়িতে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া সেই রজঃ ললাটে ধারণ করিলেন। তারপর প্রতিমার সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া হাতে চরণামৃত গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর শ্রীম মা কালীর মন্দিরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মায়ের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এবার ন'বত। শ্রীম সিঁড়িতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। এখানে মায়ের অজস্র চরণরজঃ সমাকীর্ণ। গদাধর ও বুদ্ধিরাম আসিয়া এই স্থানে শ্রীম-র সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা এখানে সাধনভজন করেন।

এবার বকুলতলার ঘাটে প্রণাম করিয়া শ্রীম ঠাকুরের সাধনপীঠ পুরাতন বটবৃক্ষ-বেদিকার নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে বেদির উপর মস্তক সংলগ্ন করিয়া শ্রীম প্রণাম করিলেন। তারপর ধ্যানঘর ও ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটী প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া হাঁসপুকুরের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন উত্তরাস্য চাতালের উপর উত্তর পশ্চিম কোণে। শ্রীম-র ডান পকেটে গামছার কোণটা বাহির হইয়া আছে।

বিল্বতলে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও শ্রীম গেলেন না। ঐখানে দাঁড়াইয়াই দর্শন ও প্রণাম করিলেন। এখন বর্ষাকাল। ঐ স্থান জল ও কর্দমসিক্ত। এখন আবার ম্যালেরিয়ার সময়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আবার শ্রীম-র শরীর ইদানীং অসুস্থ চলিতেছে। শ্রীম-র সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন জগবন্ধু, গদাধর ও বুদ্ধিরাম। আর ডাক্তার, প্রভাস ও অমৃত গেলেন বিল্বতলদর্শনে। একটু পর হাঁসপুকুরের ঘাটে নামিয়া জল স্পর্শ করিলেন। এইজলে ঠাকুর নিত্য শৌচাদি কার্য সমাপন করিতেন। তাই অতি পবিত্র।

এবার ঘাটের উপর উঠিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন। শ্রীম-র বাম হাতে ধ্যানঘর ও পঞ্চবটী। শ্রীম এখন চাঁদনীর ঘাটে। বর্ষাকাল, তাই গঙ্গা পরিপূর্ণা। শ্রীম গঙ্গা স্পর্শ, আচমন ও প্রণাম করিয়া মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে চাতালে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। সকল মন্দিরেই আরতি। শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর বাজিতেছে। শ্রীম পূর্বাস্য দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তগণ এদিক ওদিক দাঁড়াইয়া মায়ের আরতি দর্শন করিতেছেন। এখানে এটর্নি বীরেন বোস আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন।

নাটমন্দিরের পূর্বধারে একটি লোক ধ্যানমগ্ন। শ্রীম নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বামহাতে একটি পিলারকে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর ভাবে একদিন এই পিলারকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। এখন রাত্রি নয়টা। এবার ফিরিবেন। শ্রীম বসিলেন বীরেনের মোটরে। প্রভাস, অমৃত, ডাক্তার ও জগবন্ধু বসিলেন ডাক্তারের মোটরে।

একটি ভক্ত ভাবিতেছেন — দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিলে শ্রীম

দেহজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে নগ্নপদে তিনঘন্টা ধরিয়া বর্ষার ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে ভূমির উপর দিয়া তিনি পরিক্রমা করিতেছেন। তাঁহার কোন কষ্ট বোধ নাই। ইদানীং তাঁহার শরীর অসুস্থ। কি করিয়া মানুষ এরূপ বিদেহী হন? অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অবতারলীলা করিয়াছেন। শ্রীমও লীলার একজন সহচর। শ্রীম কি এই লীলাভূমিকে লীলাময়তুল্য মনে করেন? ইহা কি ধরাধামে বৈকুণ্ঠ?

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
২৬শে জুলাই, ১৯২৫ খ্রীঃ, রবিবার।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীম ও শ্রীমহাপুরুষ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম চেয়ারে বসা দক্ষিণাস্য সিঁড়ির সম্মুখে। পাশে বেঞ্চে বসা বিনয়, ছোট জিতেন, অন্তেবাসী প্রভৃতি। এখন সকাল প্রায় আটটা।

আজ ৩রা আগস্ট, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। শ্রীম-র দ্বিতীয় পৌত্র অজয়ের টাইফয়েড হইয়াছে। চৌদ্দ বছরের বালক। শ্রীম তাই একটু চিন্তিত। ভক্তগণও সেবায় সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা পালা করিয়া রাত্রিতে সেবা করেন। বাড়ির লোক ইহাতে বিশ্রামের অবসর পান।

এই অসুখে শ্রীম-র চরিত্রের একটি নূতন দিক ভক্তদের নিকট উদ্ঘাটিত হইল। পৌত্রের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। সর্বদা ডাক্তারগণ, কুটুম্বগণ, বন্ধুগণ আসাযাওয়া করিতেছেন। শ্রীম যখন তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখন মনে হয় তিনি যেন আসন্ন বিপদে মুহ্যমান হইয়াছেন। চক্ষু ছলছল, কণ্ঠস্বর শোকার্ত, যেমন সাধারণ লোকের হইয়া থাকে বিপদে। কখন বলেন, এ বৃদ্ধ বয়সে এসব আঘাত অসহ্য। শ্রোতাগণ সমবেদনা-সমাকুল। তাঁহারা বলেন, হবে না শোক! কত বড় আঘাত। আত্মজ তো, বংশধর! আহা, নাতির জন্য কত ভাবিত, কত করছেন গো!

ইহারই মধ্যে যখন কোন সাধু ব্রহ্মচারী দর্শন করিতে আসেন তখন ঐ বিপদে বিষণ্ণ পরিবারমণ্ডলীর ভিতর বসিয়াই সাধুর কানে কানে বলিতেছেন, ঠাকুর বলেছিলেন, সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড এইজন্য। তাই ছোকরাদের বলতেন, বিয়ে করিস না। মা-ও বলতেন বিয়ে করলে শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না। আপনাদের তিনি এবার রক্ষা করেছেন। আপনাদের মুক্ত গা। কিন্তু মানুষজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। সংসারে পড়ে ভুলে যায় মানুষ। এইসব শোকতাপ অভাব নানা বিপদ ঠেলেঠুলে

মন ঈশ্বরে রাখা বড়ই কঠিন। তাই বলতেন, সংসারে ভক্তদের দু'খানা তরোয়াল ঘুরাতে হয় — জ্ঞানের ও কর্মের। দুর্বলচিত্ত হলে পড়ে যায়। কখন বলতেন, অযুত হস্তীর বল থাকে হৃদয়ে তবেই সংসারে থেকে তাঁকে স্মরণ রাখা সম্ভব।

ভক্তরা বিপদভূমিতে বসিয়া যুগপৎ পরিজনদের নিকট শোকার্ত, আবার দর্শনার্থী সাধু ব্রহ্মচারীর নিকট জাগ্রত — শ্রীম-র এই ভাববিনিময়, অবলোকন করিতেছেন।

আবার শ্রীম যখন ঐ বিপদভূমি ছাড়িয়া চারতলায় নিত্যকার ভক্তসংসদে বসিয়া আছেন তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন নিচে পরিবারে কোনও বিপদ নাই। আর থাকিলেও শ্রীম-র হৃদয় মন উহা অধিকার করিতে পারিতেছে না। হৃদয় মন নির্মল, নির্মুক্ত। তাহা যেন সংসারের ঊর্ধ্বে আনন্দময় স্থানে বিচরণ করিতেছে। সাধু ভক্তের নিকট শ্রীম যেন দাসানুদাস। কণ্ঠস্বর মধুর গম্ভীর। আর নির্ঝরের ন্যায় তিনি 'কথামৃত' অকাতরে পরিবেশন করিতেছেন। সাধু ভক্তগণও ঐ অমৃতস্বরূপ কথামৃত পানে জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেন পরমানন্দে সচ্চিদানন্দধামে বিরাজ করিতেছেন।

ভক্তরা কেহ কেহ শ্রীম-র এই সহজ ভাববিপর্যয় অনেকদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। ভক্তদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে কখনও মনে হইতেছে, এই ভাববিপর্যয় মেকী, নকল ও আয়াসসাধ্য। আবার পরমুহূর্তে মনে করিতেছেন তাহা কি করিয়া হয়? এই ভাব বিপর্যয়ের সুখময় উন্নত উজ্জ্বল দৈবী স্পর্শ যে আমাদের হৃদয়মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে! এই স্পর্শে যে সংসার জীবনহীন, অতি তুচ্ছ তৃণবৎ বলিয়া মনে উদয় করাইয়া দিতেছে। তাহা হইলে তো উহা নকল কষ্টসাধ্য লোকদেখান নয়। নিশ্চয়ই উহা সত্য সুন্দর সরল ও অকৃত্রিম।

ভক্তদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও বৃহৎ দৃষ্টির সংঘর্ষ উপস্থিত। তাঁহারা ভাবিতেছেন — কি করিয়া দুই ভিন্ন ভাব একসঙ্গে একাসনে থাকিতে পারে। তাই তাঁহারা মনে করিতেছেন অবতারের পার্ষদদের বুঝি এই অলৌকিক শক্তি থাকে যাহার বলে, আলো আঁধারের যেন একক্ষেত্রে একসঙ্গে মিলন সম্ভব। মানুষ-বুদ্ধিতে বলিতে গেলে বলা যায় বহুরূপী বিদ্যা ইহা। ইহার

উপর উঠিতে পারে না ভক্তদের বিচার।

বিচারের সংঘর্ষে উদ্বেলিত চিত্ত ভক্তগণ আশ্রয় লইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বেদতুল্য সহজ সরল সমর্থ শান্তিময় কথামৃতের। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, গৃহাশ্রমী জ্ঞানী হইবে — প্রশান্ত, নিরভিমান, কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য, রসরাজ রসিক আর সাধু ভক্তের নিকট দাসানুদাস। এই মহাবাক্যের সাহায্যে ভক্তরা বুঝিতে পারিলেন, অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের চরিত্রে আচরণে যুগপৎ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ ও বিপর্যয় সম্ভব। ইহা নকল নহে — আসল, সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক। তাই ইঁহারা অতিমানব — মানুষরূপের ভিতরে থাকিয়াও। ভক্তগণ বুঝিলেন, যেমন অনন্ত ভাবময় ঈশ্বর, তেমনি অনন্ত ভাবময় ঈশাবতার। প্রায় তদ্রূপ অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন 'ভাবসাগর', তাঁহার পার্ষদগণ সেই অকূল অতল 'ভাবসাগরের' একটি স্ফূটতর দৃশ্যমান বিশাল তরঙ্গ।

অবতারের ন্যায় অন্তরঙ্গ পার্ষদচরিত্রও দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তাঁহাদের কৃপা প্রত্যক্ষ, অনুভবযোগ্য, শোকতাপহারী, ভরসাপ্রদ, শান্তিময় ও আনন্দময়।

শ্রীম স্থির প্রশান্ত ও আনন্দময়, পারিবারিক দুর্যোগেও — 'ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে' (গীতা ৬:২২)। স্থিতপ্রজ্ঞ, 'তপ্তজীবন' 'কথামৃত' পরিবেশনে পর্বতবৎ অবিচলিত।

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — গতকাল মঠে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে যে সব ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল তার নোটটা একবার শোনান না আমাদের।

অন্তেবাসী — যেমন লিখেছি ঠিক তেমনি পড়ে শোনাব, কি মুখে মুখে বলবো?

শ্রীম — না, যেমন লিখেছেন ঠিক তাই শোনান।

২

বেলুড় মঠ। দ্বিতলের উত্তর-পশ্চিম প্রকোষ্ঠ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের বাসগৃহ। পশ্চিমমুখী জানালার কাছে দাঁড়াইলেই সম্মুখে দ্বিতলে অবস্থিত

ঠাকুরঘর দেখা যায়। নিম্নে ঠাকুর-ভাঁড়ার, ভোগ-ভাণ্ডার ও রন্ধন-গৃহ। জগজ্জয়ী স্বামী বিবেকানন্দ দিগ্বিজয়ের পর, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশানুসারে 'আত্মারাম'কে (ঠাকুরের পূতাস্থিভাণ্ড) এই দ্বিতল মন্দিরে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি ঠাকুর এই গৃহে নানা উপচারে পূজিত হইতেছেন — আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরাধিক কাল।

ঠাকুর সশরীরে বিদ্যমানাবস্থায় স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, তুই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেখানে বসাবি আমি সেখানেই থাকবো। ঠাকুরের সেই আদেশ পূর্ণ করেন স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গার পশ্চিম কূলে এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া। এই মঠের ভূমি ক্রয় করেন ভক্ত ব্রিটিশ মহিলা কুমারী মুলারের অর্থসাহায্যে। আর ঠাকুরমন্দির ও মঠবাড়ি হয় মার্কিন ভক্তগণের সাহায্যে। তাঁহাদেরই অর্থসাহায্যে ঠাকুরের নিত্য যথাবিধি পূজা, ভোগরাগাদির প্রবর্তন হয়। মার্কিন ভক্ত মহিলাগণই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইঁহারা স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত।

আজ ২রা আগস্ট, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। এখন অপরাহ্ণ চারিটা। আজ ভক্তদের অবসর বলিয়া কলিকাতা হইতে অনেকে আসিয়াছেন। মর্টন স্কুলের (শ্রীম-র) ভক্তরাও কেহ কেহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভবানীপুরের ভক্তরা — মোটা সুধীর, ভোলা দরজী প্রভৃতি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মঠের কলিকাতার শাখা-কেন্দ্র হইতেও সাধুরা আসিয়াছেন। সকলেই দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহার ঈশ্বরীয় কথা শুনিবার লালসায়।

মহাপুরুষ মহারাজ বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য, উত্তর-পশ্চিম দিকের জানালার পাশে। জানালা দিয়া ডান হাতে পশ্চিমে দৃষ্টি করিলে ঠাকুরমন্দির দেখা যায়। মহাপুরুষ মহারাজ এক একবার মন্দির দর্শন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে একটি টেবিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান। তাহাতে কিছু পুস্তক আর লিখিবার দোয়াত কলম। আর ভক্তদের অনেক চিঠি। বাম হাতে শয়নপালঙ্ক। তাহার উত্তরে ছাদে ও শৌচাগারে যাইবার দরজা। গৃহের দক্ষিণের দরজা দিয়া সকলে প্রবেশ করে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণেও আর একটি আছে। উহা দিয়া পাশের রাজামহারাজের ঘরে যাওয়া যায়। মহাপুরুষ মহারাজের গৃহটি উত্তর-দক্ষিণ

লম্বমান, পনের ফুট হইবে। আর প্রস্থে বার ফুট। একটি ভক্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার পর মহাপুরুষ মহারাজ কথা কহিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (ভক্তের প্রতি) — তুমি ভাল আছ? মাস্টার মশায় কেমন আছেন? তাঁকে আমার নমস্কার জানাবে।

ভক্ত — আজ্ঞে, আমি ভাল আছি। মাস্টারমশায়ের শরীরও চলনসই, কিন্তু মনে একটু উদ্বেগ। দ্বিতীয় পৌত্র বোঁচার খুব অসুখ। টাইফয়েড হয়েছে। সে এক অদ্ভুত রকমের রোগ। বাড়ির লোক, ভক্তগণ ও শ্রীম সকলে ব্যতিব্যস্ত। ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তী দেখছেন। তিনিও চিন্তিত।

স্কুলেও একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। অতি মেধাবী ছাত্র প্রণব প্রকাশ সেন মারা গেছে। ছেলেটি যেমনি পড়াশোনায় উত্তম, তেমনি সুশীল ছিল। আর ঠাকুরের ভক্ত। যেদিন মারা যায় সেদিনই সংবাদ পাওয়া যায় সে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছে।

সাহিত্য পরিষদে স্বামীজীর 'বীরবাণী'র আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হয়। 'সন্ন্যাসীর গীতি' যখন আবৃত্তি করে সকলে মনে করেন — যেন একটি সত্যিকার সন্ন্যাসী তার ভিতর থেকে কথা বলছেন। আবার 'সখার প্রতি উক্তি'তে যেন তার প্রাণ গলে বেরোচ্ছিল। প্রকাণ্ড হল ভর্তি লোক তার সাধুবাদ করে। জ্ঞান মহারাজ, কেষ্টলাল মহারাজরা ছিলেন। তাঁরা মুগ্ধ হয়ে তাঁদের গলার গড়েফুলের মালা প্রণবের গলায় পরিয়ে দেন। আর জামায় মেডেল এঁটে দেন। মর্টন স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ তার নামে একটা সোনার মেডেল উৎসর্গ করেছেন। কারণ, যে ম্যাট্রিকে এই স্কুল থেকে প্রথম হয়ে স্কলারশিপ পাবে সে ঐটি পাবে।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (আর্তস্বরে) — এর-ই নাম সংসার! আজ ভাল, কাল মন্দ। আজ জন্ম, কাল মৃত্যু। আজ ধনী, কাল দরিদ্র। আজ স্বাস্থ্যবান, কাল পঙ্গু। এইভাবে চলছে সংসার। কি করবে মানুষ তাঁর ইচ্ছার কাছে! মাথা নত করে চলা। তা হলেই শান্তিতে থাকতে পারে — অনেকটা শান্তিসুখ লাভ হয়।

তবে যাতে অন্যের অনিষ্ট না হয়, মিথ্যা কথা বলে অর্থ উপার্জন না হয় তাই করবে। মানুষ আর কি করবে? এই ভাবে থেকে একদিন চলে যাওয়া। সুখদুঃখ, ভালমন্দ সইতেই হবে! এর হাত থেকে নিষ্কৃতি

নাই। তা সওয়া, ঐ করা। একান্ত অসহ্য হলে কেঁদে বলা তাঁকে যাঁর ইচ্ছায় এসব হচ্ছে, এ বিশ্ব চলছে। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা। আর পথ নাই। শরণাগত, শরণাগত।

অনাথের প্রবেশ। ইনি সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক। প্রণামান্তর অনাথ কথা কহিতেছেন।

অনাথ (মহাপুরুষের প্রতি) — মহাত্মা গান্ধী এখন রাজনীতি ছেড়ে সি.আর. দাশ মেমোরিয়ালের জন্য টাকা সংগ্রহ করছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ — হাঁ, গান্ধীমহারাজ এখন সব ছেড়ে দিয়েছেন। হালে আর পাণি পেলেন না। যিনি মহাশক্তি, যাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলছে, তাঁরই হাতে তিনি সব ছেড়ে দিয়েছেন। কি করবেন না ছেড়ে, বল। মানুষ আর কতটা করতে পারে?

চেষ্টা করে মানুষ। যখন দেখে অসীম অনন্তকে ধরা যায় না, যখন বোঝে, তাঁর ইচ্ছা না হলে জগতের উপকার করা যায় না, তখনই তাঁর হাতে ছেড়ে দেয়। চেষ্টা করা ও চেষ্টা ছাড়া — এ দুই-ই দরকার তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হলে।

তিনি কি আর আমাদের সেবার প্রত্যাশী? তা নয়। তোমার নিজের কল্যাণের জন্য তাঁর সেবা করা, নরনারায়ণের সেবা করা।

প্রথমে অহংকার থাকে। নইলে কাজ হয় না। পরে বাধা পেয়ে সে অহংকার তাঁর সঙ্গে যোগ করে দেয়। তখনই অক্লান্ত কর্ম করা চলে।

গান্ধীমহারাজ এখন কেবল টাকার জন্য এখানে রয়েছেন। দেশবন্ধু মেমোরিয়েলের জন্য টাকা তুলছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। ভক্তরা একথা সে কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের কথা উত্থাপন করিলেন। ঠাকুর অবতার। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি আসিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ এইসব কথায় যোগদান করিলেন। তিনি নিজের মন্তব্য বলিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর হলেন এই যুগের সংস্থাপক। আর স্বামীজী ব্যবস্থাপক। স্বামীজী ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন যা যা করা প্রয়োজন, আর যে ভাবে করা প্রয়োজন। তাঁর কথা শুনে কাজ করলে সব সহজ হয়ে যাবে। নইলে অনেক ঘুরতে হবে। কিন্তু শেষে

আবার ফিরে তাঁর পথে আসতে হবে।

কি আত্মজ্ঞান, কি রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশসেবা, অথবা ভারতের পুনরুত্থান, কিংবা জগতের কল্যাণ প্রভৃতি কোন সমস্যাই বাদ দেন নাই। সকল সমস্যার সমাধান সূক্ষ্মে করে গেছেন। দেরী লাগবে এ সব কাজের প্রকাশ হতে। এখনও বুঝতে পারে নাই দেশ। ক্রমে বুঝবে।

একদিন স্বামীজী ঠাকুরঘর হতে নেমে এসে (জানালা দিয়া নিচে দেখিয়া) এইখানে দাঁড়ালেন আমগাছের নিচে। ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে একটা আমগাছ ছিল তখন। Inspired (দিব্য ভাবে উদ্দীপ্ত) হয়ে নিজে নিজে বললেন, 'যা করে দিয়ে গেলাম তা সাত আটশ' বছর চলবে।'

কোনও কারণ ছিল না বলার। হঠাৎ বললেন। যেন দিব্য চক্ষুতে সামনে দেখছেন। ঐখানে একটা খাটিয়ায় বাবুরাম মহারাজ বসা। দৈববাণীর মত নীরবে সকলে শুনলো।

এখন দেখছি, যা বলতেন তাই হচ্ছে। আরও হবে এরপর। একটা কথাও তাঁর বিফলে যাবার নয়।

মহাপুরুষ মহারাজ ক্ষণকাল নীরব। কি যেন স্মরণ করিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর সূক্ষ্মে দেখেছিলেন, জগতের নানা দেশের লোক তাঁর আশ্রয়ে আসবে। স্বামীজী তারই ব্যবস্থা করে গেলেন।

এই যে ওয়েস্টে তাঁর কাজ — এ তাঁর সেই দর্শনের বহিঃপ্রকাশ।

ভারতকে, স্বামীজী বলেছিলেন, ধর্মকে আশ্রয় করে ব্রহ্মজ্ঞানকে আশ্রয় করে উঠাতে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরই মূর্ত বিগ্রহ ঠাকুর। স্বামীজী ঠাকুরের সেই ভাবপ্রচারক, ব্যবস্থাপক। তাই স্বামীজীর কথা শুনে চললে ভারতের উত্থান শীঘ্র হবে।

মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন। বলেছেন, স্বামীজী যা বলে গেছেন আমি তাই করছি।

স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় দেশসেবকের যে রূপ এঁকেছিলেন, গান্ধীমহারাজ তারই স্থূল মূর্তি — সেই কটিবস্ত্র, সেই দারিদ্র্য, দুঃখী দরিদ্রের জন্য সেই দরদ! গান্ধীজীতে স্বামীজীর মহাবাক্য রূপপরিগ্রহ করেছে ঠিক ঠিক।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের সনাতন ধর্ম — ব্রহ্মজ্ঞানকে শিরে নিয়ে সব করছেন, দেশসেবা করছেন।

ঠাকুরের life-এর (জীবনচরিতের) Foreword-এ (ভূমিকায়) ঐ ভাব প্রকাশ হয়েছে। লিখেছেন, 'His life enables us to see God face to face' — তিনি নিজে চোখের সামনে ভগবানকে দর্শন করেছেন। তাই তাঁর জীবনচরিত পড়লে মনে হয় যেন ভগবান আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভগবানদর্শনই গান্ধীজীর জীবনের আদর্শ। তার জন্যই দেশসেবা, দুঃখী নারায়ণের সেবা। এটা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য — রামের সাক্ষাৎকার।

মহাপুরুষ মহারাজ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

মহাপুরুষ মহারাজ (ভক্তদের প্রতি) — ভারতের যিনি সেবক হবেন তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান মস্তকে রেখে সব করতে হবে। নচেৎ কেউ শুনবে না। যদি বল, কেন? এর উত্তর এই — এটাই এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এর জন্যই ভারতের অন্য সবকিছু, ব্যক্তির ও জাতির। এই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ভারতের লোক সর্বস্ব ত্যাগ করে।

মহাপুরুষ মহারাজ (জগবন্ধুর প্রতি) — কি, এই লিখেছেন না গান্ধীমহারাজ?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ। আরও বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দেবত্বের মূর্তবিগ্রহ — 'living embodiment of godliness'.

মহাপুরুষ মহারাজ — যদিও ঐ উক্তিটি ছোট, কিন্তু কত বড় কথা — 'His life enables us to see God face to face'! তাঁর জীবনচরিত ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেয়। তাঁর এই opinion (অভিমত) ভারতের জনসাধারণের opinion (অভিমত)। কেন? না, তিনি যে ভারতবাসীর সত্যিকার প্রতিনিধি!

একজন ভক্ত — কেউ কেউ বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর aggressive (আক্রমণাত্মক) ভাব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

মহাপুরুষ মহারাজ — হাঁ, অনেকে আমাদের বলেন, আপনাদের কাজে জোর নাই। আমরা তাঁদের এই বলি, আমাদের কাজ এইভাবেই চলবে। কয়েকদিন খুব হৈ হৈ করলুম, শেষে কিছুই নাই — আমরা

এইরকম কাজ চাই না।

মহাপুরুষ মহারাজ পুনরায় ভাবিতেছেন। ভক্তরা তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। আর অপেক্ষা করিতেছেন আবার কি বলেন। পুনরায় তিনি কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের কৃপায় তাঁকে ভেবে যাঁরা মা-র রাজ্যে এসেছেন তাঁরা কি শুধু নিজের কথা ভাবতে পারেন! কিসে সকলের মঙ্গল হয় তাই ভাবেন। আমি তো বাবা, মাকে (জগদম্বাকে) সর্বদাই এই কথা বলি — আমি যখনই একটু ধ্যান ট্যান করি, কি তাঁর দিকে মন দি' — 'মা, সকলের মঙ্গল কর, মা সকলের মঙ্গল কর।'

তিনটি যুবকের প্রবেশ। তাহারা শিবলিঙ্গপূজা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতের আলোচনা করিতেছে। এই সম্পর্কে অথর্ব বেদের কথা উঠিল। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী ওঙ্কারানন্দকে ডাকাইয়া আনাইলেন। যুবকগণ তাঁহার সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেছে।

স্বামী বিজয়ানন্দ আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন, নিচে ব্যারিস্টার আর.সি. সেনের স্ত্রী এসেছেন। তাঁদের কাছ থেকে একজন বাটপাড় গত দশ বছর থেকে বেলুড় মঠের নাম করে টাকা তোলে। তার নাম বলেছে, স্বামী শিবানন্দ। বলেছে, বেলুড় মঠে কালীমন্দির আছে। সেখানে দেবসেবা হয়, সাধু অতিথির সেবা হয়। সে এই কথা বলে অর্থ সংগ্রহ করে।

এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ নিচে নামিয়া গেলেন। গঙ্গার ধারের বেঞ্চে তাঁহারা বসিয়া আছেন। তিনিও তাঁহাদের পাশে গিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে।

মিসেস সেন — আপনার নাম স্বামী শিবানন্দ?

মহাপুরুষ মহারাজ — সকলে এই নামেই আমাকে ডাকেন।

মিসেস সেন — আমাদের দশ বছর ধরে ঠকাচ্ছে। আমরা অনেক বন্ধুদেরও বলে অর্থ দিইয়েছি।

মহাপুরুষ — আমাদের এখান থেকে যে চাঁদা তোলে তার কাছে embossed letter of authority (এমবসড্ অধিকার পত্র) থাকে। (একজন সাধুর প্রতি) এনে দেখিয়ে দাও তো এঁদের আমাদের এমবসড্

চিঠির প্যাড। (আনা হইলে তাঁহাদের দেখাইয়া) এই হল আমাদের পরিচয়চিহ্ন। এরপর যখন ঐ লোকটি যাবে তখন আমাদের ফোনে জানাবেন মঠে, অথবা কলকাতার যে কোন ব্রাঞ্চ সেন্টারে।

সন্ধ্যা হইতেছে। মহাপুরুষ মহারাজ উপরে উঠিয়া গেলেন। ভক্তরাও বিদায় লইলেন। জগবন্ধু, দীর্ঘকেশ সুশীল প্রভৃতি চলতি নৌকায় আহিরীটোলায় নামিয়া মর্টন স্কুলে গেলেন।

৩

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বা কি সুন্দর রিপোর্ট! এখানে বসে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কেন লেখেন না? এতে গভীর চিন্তা হয় আর ধ্যানের কাজ হয়। মনে সব গেঁথে যায়।

কি সুন্দর কথা সব! গান্ধীমহারাজ ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় রেখে দরিদ্রের বেশে দেশসেবা করছেন। এটাই ভারতের সনাতন ও শাশ্বত আদর্শ।

আর ঠাকুরের সম্বন্ধে কি ধারণা গান্ধীমহারাজের! বলেছেন, তাঁকে দেখলেই যেন ঈশ্বরকে দেখা হলো।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। শনিবারের ভক্তগণ অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। অল্পক্ষণ পূর্বে তিনি বাহির হইলেন। ভক্তদের কুশল প্রশ্নাদির পর ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা রেলে ভাটপাড়া যাইবেন।

একটি ভক্ত শ্রীম-র আদেশে আজ হইতে কিছুকাল সাত নম্বর শঙ্কর ঘোষের লেনে বাস করিবেন। এখানে একটি মেস হইয়াছে — আহারাদির সুবিধা। শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি প্রথমে এই গৃহে ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র উহার প্রতিষ্ঠা করেন। এখন উহা পার্শিবাগানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া ভক্ত ঐ মেসে রওনা হইলেন।

ঠনঠনের কালীবাড়ির পিছন দিকে মুক্তারামবাবু স্ট্রীট। এখানে মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রমের একটি শাখাকেন্দ্র আছে। বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজ আজ এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। তাই সাধুগণ আনন্দোৎসব করিতেছেন। শ্রীমও ঐ আনন্দোৎসবে যোগদান

করিয়াছেন। তিনি ডাক্তার কার্তিক বক্সীর মোটরে অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়াছেন। সিটি কলেজের কোণে দুর্গাপদ মিত্রের নিকট এই সংবাদ পাইয়া ছোট জিতেন ও জগবন্ধু অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এখন রাত্রি পৌনে দশটা।

ত্রিতল ভবন। ত্রিতলে পূর্বদিকের গৃহমধ্যে ভজনের আসর বসিয়াছে। ভজন চলিতেছে। গায়ক স্বামী বরদানন্দ হারমোনিয়াম বাজাইতেছেন। স্বামী রামেশ্বরানন্দের হাতে তানপুরা। আর স্বামী অমলানন্দ লইয়াছেন বাঁয়াতবলা। শ্রোতা স্বামী শুদ্ধানন্দ, নির্বেদানন্দ, ওঙ্কারানন্দ, সন্তোষানন্দ প্রভৃতি। পাঁচ ছয়জন দোহারও আছেন। সকলেই সাধু। কেহ অদ্বৈতাশ্রমের কর্মী। কেহ মঠের লোক। আশ্রমের পরিচালক স্বামী দয়ানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ প্রভৃতি আসাযাওয়া করিতেছেন।

মহাপুরুষ মহারাজের আগমনে অদ্বৈতাশ্রম আজ আনন্দমুখর। শ্রীম ভজনস্থলীতে উপস্থিত হইলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসরের মধ্যস্থলে বসাইলেন পূর্বাস্য। শ্রীম-র পিছনে ডাক্তার বক্সী। তাঁহার পিছনে বসিলেন জগবন্ধু ও ছোট জিতেন।

সঙ্গীতানন্দে নিমগ্ন সাধুগণ। গাহিতেছেন — 'কটিতে কৌপীন জোটে না' — এই কালীকীর্তন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের প্রাণভরা সঙ্গীতের আনন্দরসপানে শ্রীমও নিমগ্ন। শরীর নিশ্চল, চক্ষু নিমীলিত।

আবার গাহিতেছেন — 'নব সজল জলধর কায়। শ্যামারূপ হেরিয়ে, কালীরূপ হেরিয়ে হেরিয়ে মনপ্রাণ গলে যায়॥' সঙ্গীত চলিতে লাগিল অনর্গল।

শ্রীম নীরবে উঠিয়া পড়িলেন। মহাপুরুষ দর্শন করিবেন। তাঁহার আসন হইয়াছে দ্বিতলের পূর্ব-উত্তর কোণের ঘরে। এই আশ্রমের সকল আসনই মেঝেতে স্থাপিত। এখানে খাটপালঙ্ক কিছুই নাই। মহাপুরুষ মহারাজ মেঝেতেই আপন বিছানায় বসিয়া আছেন।

শ্রীম-র সঙ্গীগণ ডাক্তার বক্সী, জগবন্ধু ও ছোট জিতেন সকলেই উঠিয়া আসিলেন। আর আসিলেন স্বামী নির্বেদানন্দ, ওঙ্কারানন্দ ও সন্তোষানন্দ।

শ্রীমকে দেখিয়াই মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, আসুন, আসুন, মাস্টারমশায়। নমস্কার। বসুন। শ্রীমও প্রতিনমস্কার করিয়া সম্মুখের আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের কুশল প্রশ্নাদির পর মহাপুরুষ ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন। আর কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। জগবন্ধুকে বলিলেন, এয়েছো? ছোট জিতেনকে বলিলেন, তুমি কেমন আছ? ছোট জিতেন উত্তর করিলেন, ভাল না। মহাপুরুষ বলিলেন, কেন?

ছোট জিতেন — ভক্তি বিশ্বাস সব কমে যাচ্ছে। সংসারের যাতনা। সংযম সব কমে যাচ্ছে।

মহাপুরুষ (অভয় দিয়া) — তোমাদের ভয় কি? তোমরা এমন সঙ্গ পেয়েছো মাস্টারমশায়ের! এঁদের সঙ্গে থাকা, কত বড় সৌভাগ্য! ভাবনা কি? ওসব আসে উপরে তুলবে বলে। (উত্তেজিত হইয়া) কি ভয় তোমাদের? না, তোমাদের কোনও ভয় নেই।

শ্রীম — কি বলে, 'নদীর ধারে বসত করে জলপিপাসায় মরবি ক্যানে?'

মহাপুরুষ (অধিকতর দৃঢ়তার সহিত) — না, তোমাদের কোনও ভাবনা নেই। সর্বদা ঠাকুর দেখছেন, — দেখছি যে!

স্বামী দয়ানন্দের প্রবেশ।

মহাপুরুষ (দয়ানন্দের প্রতি) — (ঠন্‌ঠনিয়ার কালী) মায়ের ওখানে যাও তো? যাবে, বসবে গিয়ে। ঠাকুর ওখানে বসে গান শুনাতেন মাকে। (সহাস্যে) তিনি সব দেন। টাকাও দেবেন (সকলের হাস্য)। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ — এই চতুর্বর্গ ফল দেন মা।

মহাপুরুষ মহারাজ উঠিলেন। এবার সকলের ভোজন হইবে। শ্রীমও ভক্তসঙ্গে বিদায় লইলেন।

৪

এবার শ্রীম সভক্ত ঠনঠনিয়ার মা কালীর সম্মুখে বসিলেন। বলিলেন, এ সব সিদ্ধপীঠ। ঠাকুর এখানে বসে মা কালীকে গান শোনাতেন। তখন তিনি এ অঞ্চলে পুজো করতেন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে। বয়স তখন সতের আঠার। থাকতেন বড় ভাই পণ্ডিত রামকুমারের সঙ্গে বেচু

চাটার্জী স্ট্রীটে। এখন যেখানে হেয়ার প্রেস সেখানে খোলার ঘর ছিল। তাতে থাকতেন। অপর দিকে লাহাদের বাড়ি ঝামাপুকুর লেন ছাড়িয়ে। মোড়ে ছিল দাদার পাঠশালা। এখন সেখানে রাধাকৃষ্ণ মন্দির।

ঐ সময়েই আমাদের জন্ম হয়, ঐ একটু দূরে শিবনারায়ণ দাস লেনে — এইটিন্ ফিফ্‌টিফোরে, নাগপঞ্চমীর দিন। এই কথা উল্লেখ করে ঠাকুর কখনও আমাকে বলতেন, ঐ সময়ে আমি তোমাদের পাড়ায় থাকতাম। কি আশ্চর্য! তিনি কি জন্ম থেকেই খবর রেখেছেন? চার বছর বয়সে তিনিই হয়তো আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বর মা কালীর সামনে। আমি কাঁদছিলাম। মা মাহেশের রথের ফেরৎ ওখানে নেমেছিলেন। এদিক সেদিক সব দর্শন করছিলেন। আমি একা পড়ে গিছলাম। ঠিক মনে পড়ছে, একজন যুবক এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আবার একবার আমি ছাদে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলাম আর কাঁদছিলাম। তখন আশ্বিনের সেই বিধ্বংসী ঝড় হচ্ছিল। এই কথা স্মরণ করে পরে আমায় একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার ঐ আশ্বিনের ঝড়ের কথা কি মনে আছে? কি আশ্চর্য!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আর কিই বা আশ্চর্য — জন্ম থেকে সব খবর রাখা? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের খবর রাখেন, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি ভক্তদের খবর রাখা! মানুষভাবে দৃষ্টি করলেই আশ্চর্য বলে মনে হয়।

কিন্তু অতি বড় আশ্চর্য এই — যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, বেদ যাঁকে পরব্রহ্ম বলেন, যিনি নিমেষে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন — তাঁকে জীবিকার্জনের জন্য এ-ঘরে সে-ঘরে পূজারীর বেশে ঘুরতে হচ্ছে! কি দুর্জ্ঞেয় আবরণে ঢেকে এসেছেন নিজেকে। দীনহীন বেশ। নিরক্ষরপ্রায়, আবার দরিদ্র। কেন, এসব আচরণ, আবরণ?

দুর্দান্ত modernism-কে (বর্তমানের প্রগতিকে) যে challenge করতে (রুখতে) হবে! আক্রমণের অস্ত্র তো চাই? রাম বা কৃষ্ণের মত অস্ত্রধারণ এ সময়ে নিষ্ফল। কারণ সমগ্র জগৎকে ওয়েস্ট এই সব অস্ত্রে বশীভূত করে রেখেছে। ঐসব মারণাস্ত্র এখন নিষ্ফল।

তাই ঠাকুর নূতন অস্ত্র তৈরী করলেন — ব্রহ্মজ্ঞানের। আজ পর্যন্ত জগতে আচার্যগণ, ঋষিগণ, মহাপুরুষগণ ব্রহ্মজ্ঞানের যত বিভিন্ন রূপ

প্রকট করেছেন, যেসব বেদ পুরাণ তন্ত্রে ঢাকা পড়েছিল সেইগুলি ঠাকুর উদ্ধার করলেন সাধন করে সুদীর্ঘ কাল। ঐসব গুপ্ত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেইগুলিকে, সেই সত্যগুলিকে উদ্ধার করে ভক্তদের দিলেন। ভক্তরা তাঁর সেই জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নিজেদের অজ্ঞান অবিদ্যাসুরকে নিধন করলেন প্রথমে তাঁর ইচ্ছায়। তারপর তাঁর ইচ্ছাতেই এখানকার ও পাশ্চাত্ত্যের জড়বিজ্ঞানে উদ্ধত, বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ড অসুরকে ব্রহ্মজ্ঞানের নানা অস্ত্রে পরাজিত ও পদানত করেছেন সূক্ষ্মে। বাইরে এই বিজয়ের ফল বেরোতে একটু দেরী আছে।

এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে ওয়েস্টের জড়বিজ্ঞান সম্মিলিত হবে। তখন সমগ্র জগতে শান্তিসুখ সুপ্রতিষ্ঠ হবে। ঠাকুর সেই পথ দেখিয়ে গেছেন। ভক্তরা তার বিস্তার করছেন। ভবিষ্যতে ভারতের এক হাতে ব্রহ্মবিজ্ঞান অপর হাতে জড়বিজ্ঞান থাকবে। তার দ্বারা জগতের শান্তিসুখ বিধান করবে ভারত। অতীতেও ভারত এ কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে — ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতি এই — ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের সকলের শান্তিসুখ বিধান করা।

এই আবরণ ভেদ করে ঠাকুরকে চেনা মানুষের কর্ম নয়। তিনিই কৃপা করে ভক্তদের নিকট স্বরূপে প্রকটিত হয়েছেন। ভক্তরা তাঁর ঐ স্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়তেন — দেব কি মানব ইনি — এই ভাবনায় পড়তেন। এই সংশয়, এই ভাবনা তিনিই দূর করে দিতেন। ভক্তরা নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করেছে তাঁর কৃপায় — ঠাকুর নররূপী পরব্রহ্ম।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরবে ধ্যানমগ্ন রহিলেন। এবার গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছেন। ভক্তগণ কণ্ঠ সহযোগ করিলেন।

গান। কখন কি রঙ্গে থাক মা সুধাতরঙ্গিনী।
রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
(তুমি) লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা অশিধরা করালিনী।
তুমি ত্রিগুণ ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥

'কমলের কমলে' — কমলাকান্তের হৃদয় কমলে।

শ্রীম ডাক্তারের মোটরে গেলেন মর্টন স্কুলে। ছোট জিতেন ও জগবন্ধু গেলেন সাত নম্বর শঙ্কর ঘোষের লেনে, পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতির ভবনে। এখানে এখন মেস। অন্যত্র আহারাদির অসুবিধা হওয়ায় শ্রীম-র আদেশে জগবন্ধু আজ হইতে এখানে কিছুকাল বাস করিবেন।

পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতি ভবন।
৭ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
৩রা আগস্ট, ১৯২৫ খ্রীঃ, সোমবার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীম ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী — বুদ্ধিভ্রষ্টকে বুদ্ধিদান

১

মর্টন স্কুল। কলিকাতা। তিনতলার প্রভাসবাবুর ঘর। সকাল আটটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। পাশে একটি ভক্ত শিক্ষক দাঁড়াইয়া আছেন। আজ ৫ই আগস্ট, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

পাশের কোণের ঘরে শ্রীম-র দ্বিতীয় পৌত্র অজয় অসুস্থ। বয়স চৌদ্দ বছর। টাইফয়েড হইয়াছে। খুব খারাপ আর উগ্র ধরণের আক্রমণ। বাড়ির সকলে অতি ক্লান্ত ও চিন্তিত। শ্রীম বিশেষ বিব্রত। চব্বিশ ঘন্টা পালা করিয়া সেবা চলিতেছে। ভক্তগণও যথাসাধ্য সেবার ভার লইতেছেন। সারাদিন দেখে বাড়ির লোক। আর রাত্রিতে ভক্তগণ দেখেন। এই ব্যবস্থায় শ্রীম কথঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করিতেছেন।

ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন, বিনয় প্রভৃতি ও শ্রীম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীম চিন্তিত হইলেও ভক্তদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলেছিলেন, কর্মফল কেউ রোধ করতে পারে না। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।' (গীতা ৩-৩৩)।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকতেও পাণ্ডবদের অত বিপদ। দেখ না কত বিপদ — রাজ্যনাশ, বনবাস, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, বিরাটপুরীতে সকলের দাসত্ব, অপোগণ্ড পুত্রগুলির বিনাশ, আবার মহাযুদ্ধ — এ সবই হলো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সদা সঙ্গে। কে বুঝতে পারে এ প্রহেলিকা!

এদিকে বলছেন, আমি অবতার। আমি পরমাত্মা। তিনি সঙ্গে থেকেও পাণ্ডবদের দুঃখ গেল না। ঠাকুর সঙ্গে থেকেও ভক্তদের দুঃখ ভোগ করতে হলো। নরেন্দ্রের কত কষ্ট! পিতার মৃত্যু, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংঘর্ষ,

ওদেশে কত দুঃখ, কত কষ্ট।

আর একটি ভক্তেরও (শ্রীম-র) কত বিপদ — পুত্রনাশ, কত কি? এখনও কত বিপদ চলছে। (অন্তেবাসীর প্রতি) আমার যে এখন এই সব বিপদ, এসব আপনাদের শিক্ষার জন্য। ঠাকুর থাকতে আমার যেসব বিপদ হতো সেসব দেখিয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রাদিকে বলতেন, এসব তোদের শিক্ষার জন্য।

সংসারে থাকলে এসব আসবেই। তিনি ঢ্যালা দিয়ে ঢ্যালা ভাঙ্গেন। আবার মাছের তেলে মাছ ভাজেন।

কর্মফল ভোগ করতেই হবে। দেখ না, এই ছেলেটি। জ্বর হয়েছে। তা নিয়ে হেঁটে (গড়ের) মাঠে যাওয়া খেলা দেখতে। আড়াই তিন ক্রোশের রাস্তা। আবার ছোলাভাজা খাওয়া।

দেহ ধারণ করলেই কর্মফল ভোগ করতে হবে। এই ছেলেটির অসুখ। তার জন্য তার বাপ মা, আত্মীয় কুটুম্ব বিব্রত। ছেলের দেহের কষ্ট। কুটুম্বদের দেহের ও মনের উভয়ের কষ্ট। যদি বল, ছেড়ে চলে গেলেই তো বাঁচা যায়। তা পারে কই মানুষ? কর্তৃত্ববোধ রয়েছে যে, আমার ছেলে বলে। যদি জ্ঞানী হয় (যেমন শ্রীম নিজে) বাড়ির লোক, তবু ছেলের কর্মের ফল তাঁকেও ভোগ করতে হবে। তিনি জ্ঞানপূর্বক ভোগ করবেন ছেলের কর্মের ফল।

শ্রীকৃষ্ণের শরীর গেল ব্যাধের তীরে। ব্যাধকে বললেন, তুমি আমার মিত্র। শেষ উপকারটি করলে। ঋষিদের শাপ — যদুবংশ ধ্বংস হোক। ছেলেরা দুর্দান্ত হয়ে গিছলো। ঋষিদের অপমান করতো। তাতে শাপ দিলেন যদুকুল ধ্বংস হবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রধান পুরুষ যদুকুলের। তীরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন করলেন। ওদিকে আবার ঐ ব্যাধকে পুরস্কার দিলেন। তাকে মুক্তি দিলেন।

একের কর্মফল ভোগ অপরকেও স্পর্শ করে। দুর্যোধনের দুষ্কর্মের ফল ভীষ্ম, দ্রোণকে ভোগ করতে হলো।

ডাঁড়াচ্ছে (দাঁড়াচ্ছে) কি তা হলে? শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরা ঈশ্বর, অবতার — নররূপী ঈশ্বর। ঈশ্বররূপে তিনি সব করতে পারেন। তাঁর সেই শক্তি আছে। তিনি ইচ্ছা করলে কর্মফল-ভোগ নিরোধ করতেও

পারেন! কিন্তু তা করেন না। কর্মফল কমিয়ে দেন — একটু লেশ রাখেন। যেখানে খাঁড়ার ঘা পড়তো সেখানে নরুণের আঁচড় লাগে। এ না করলে সৃষ্টি চলবে কি করে?

পুরীতে মাধবদাসকে এই কথা বলেছিলেন ভগবান। ভক্তমালে আছে এ কথা। মাধবদাস বৃদ্ধ সাধু। রক্ত আমাশা করেছে। উঠতে পারেন না। বিছানায় বাহ্যে করছেন। ভগবান রাখালের বেশ ধরে এসে, ঐসব বিছানা ধুয়ে দিচ্ছেন। মাধবদাস বুঝতে পারলেন। বললেন, রোগই কেন দেওয়া, আবার ময়লাই কেন সাফ করা? তোমার লীলা বোঝা ভার। তখন ভগবান বললেন, তোমার একটু কর্মফল-ভোগ বাকী ছিল। ঐটে হয়ে গেল। তুমি আমার উপর সব ভার দিয়েছো। তাই আমাকে তোমার সেবা করতে হচ্ছে। কর্ম, কর্মফল, কর্মফল ভোগ, ভক্তের সেবা — এ সবই সত্য। মানুষ কি করে বোঝে এ প্রহেলিকা!

শরণাগত ভক্ত হলে মন টেনে রেখে দেন তাঁ'তে। তখন অল্প কষ্ট ভোগ হয় মনে। যেমন কাজে মন মগ্ন থাকলে মশার কামড় তত বোধ হয় না, এও তেমনি। ঈশ্বরে মন থাকলে দুঃখকষ্ট কম বোধ হয়। পাণ্ডবদেরও তাই। বনবাস করতে হল, কিন্তু তাঁদের মনে তিনি সদা বসে আছেন। তাই দুঃখবোধ কম। কিন্তু দুঃখ হবেই।

কেন এ খেলা? তার উত্তর — নইলে জগৎ থাকে না। তবে তাঁর শরণাগত হলে, দুঃখবোধ কম হয়। যদি বল, কেন এ খেলা? তার উত্তর, তাঁর ইচ্ছা। কেন খেলেন, তার উত্তর মানুষ দিতে পারে না। তিনি নিজেই দিয়েছেন, শরীর ধারণ করলে এ হবেই। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট কেউ বাদ পড়েন না। ঈশ্বরই নিজে অবতার হয়ে ভোগেন। তবে তো লোক শিখবে — দুঃখকষ্ট হবেই। তবুও তাঁকে ডাকতে হবে। দুই-ই একসঙ্গে চলে — দুঃখ ও দুঃখনাশ।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখ না, ঠাকুরের কত দেহের কষ্ট। ভক্তদের কর্মফল ভোগ করছেন। গিরিশবাবুর কর্মফল-ভোগ ঠাকুর নিজের দেহে নিয়ে ভুগেছেন।

একজন ভক্ত — অবতারেরও কর্মফলে জন্ম হয় কি?

শ্রীম — না। অবতারের জন্ম কর্মফলে হয় না যেমন সাধারণ মানুষের হয়। সাধারণ মানুষের অনন্ত সঞ্চিত কর্ম থাকে। তাতেই বারবার জন্ম হয়। আবার বারবার মানুষজন্মের কর্ম সঞ্চিত হয়। এই ভাবে অনন্ত কর্মফল প্রায় অনন্তই থাকে।

তবে ঈশ্বরদর্শন করলে সঞ্চিত সব কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। যে জন্মে মানুষ ঈশ্বরদর্শন করে সেই জন্মের ক্রিয়মান কর্মও নষ্ট হয়ে যায়। ইহাই বেদান্তের মত। উপনিষদে দৃষ্টান্ত আছে — 'ভ্রষ্টবীজবৎ'। অর্থাৎ বীজ যেমন ভেজে নিলে তার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, এও তেমনি। ঈশ্বরদর্শন করলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। কেবল প্রারব্ধ কর্ম থাকে। তাও তিনি কমিয়ে দেন শরণ নিলে। ঠাকুর গান গেয়ে এ কথাটি বলতেন। বলতেন, 'কপালে লিখেছে বিধি তাই যদি হবে। তবে মা কে তোর দুর্গা নাম নিবে॥'

ঠাকুর আর একটি গান গাইতেন। শ্রীম গাহিতেছেন।

গান।

আমি যদি দুর্গা দুর্গা বলে মা মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শংকরী॥
নাশি গো-ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশী নারী।
এসব পাতক না ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্মপদ লতে পারি॥

গিরিশবাবু ঠাকুরের মুখে এ গানটি শুনে ভরসা পেলেন। বলরাম মন্দিরে গেয়েছিলেন। তারপরেই গিরিশবাবুর পরিবর্তন আরম্ভ হল।

কর্মফল ভোগের কথায় ঠাকুর বলেছিলেন, যতদিন না হাঁড়ি আগুনে পোড়ে ততদিন কুমোরের চাকে পড়ে।

মোহন (স্বগত) — শ্রীম-র পরিবারে এই বিপদ — নাতির কঠিন অসুখ। সকলে ব্যতিব্যস্ত। ভক্তরা পর্যন্ত চিন্তিত ও ক্লান্ত। শ্রীম স্বয়ংও তাই। কিন্তু শ্রীম-র এই দৈহিক ক্লান্তি ও মানসিক চিন্তার পেছনে আর একটি জাগ্রত জীবন্ত ভাব উঁকি মারছে দেখছি — ওটা কি? ও যেন একই আকাশে গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ, তার পেছনে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, প্রায় যুগপৎ দেখা যাচ্ছে। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মন ঘরের অসুখে, কিন্তু এই

ঈশ্বরীয় জ্ঞানোপদেশ কি করে একই সময়ে সম্ভব?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভাগ্যিস্ আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম। তাই একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যাচ্ছে কি করে তিনি ভক্তদের অত কর্মফল তাঁর দেহে ভোগ করলেন অম্লান-বদনে। দেহের তো অত কষ্ট, যাকে যমযন্ত্রণা বলে, তেমনি কষ্ট। কিন্তু এরই ভিতর দেহ ছেড়ে মন ব্রহ্মে বিলীন। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। দেহে প্রাণ নাই। অত বড় ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার এই দৃশ্য দেখে অবাক। একটু পরই নিচে নেমে এসে ঠাকুর মুচকি হেসে বলছেন, কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্সে বুঝি এ কথা নেই?

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ — এই চারটে ভাগ আছে শরীরে। স্থূলেরই অসুখ। মনটি এমনি তৈরী, স্থূল থেকে ফস্ করে একেবারে মহাকারণে নিয়ে যান। সেখানে পরমানন্দ। ওতে মনটাকে রসিয়ে রঙ্গিয়ে নিচে নিয়ে এলেন। 'উঃ উঃ' করছেন একটু পর, কিন্তু মনে দুঃখের অভিনিবেশ নেই। প্রায় যুগপৎ দুঃখবোধ ও সমাধির আনন্দ। এ মানুষে সম্ভব নয়। তবুও ঐসব ঠাকুরের আচরণ চিন্তা করলে সংসারের দারুণ দুঃখ সহ্য করা সম্ভব হয়। দু'টি contradictory (বিরুদ্ধ) ভাব যুগপৎ অবতারেই সম্ভব। চোখে দেখেছি যে — একসঙ্গে আলো ও আঁধার, রোগ যন্ত্রণা ও পরমানন্দ!

অবতার না এলে ঈশ্বরতত্ত্ব বুদ্ধিতে ধারণা হতো না। চোখের সামনে ধরেছেন এই দ্বন্দ্ব, আবার দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। আবার কৃপায় যাঁরা তাঁর স্বরূপদর্শনে ধন্য, তাঁরা এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেছেন। তাঁরাই অপরকে এই তত্ত্ব বোধ করাচ্ছেন। তবে সংসারের ভিতরে থেকে, দেহ ধারণ করে, মনের সাম্য ঠিক রাখতে পারেন কতকটা।

ঠাকুর বলতেন, অবিদ্যামায়ার শক্তি বেশী। উলটিয়ে ফেলে দেয় জ্ঞানবিচার। আবার ভুলিয়ে দেন। সীতা ও লক্ষ্মণের শোকে রাম কাঁদছেন। ক্রাইস্ট আসন্ন মৃত্যুভয়ে ঘেমে অস্থির। ঠাকুরও বিষণ্ণ শরীরত্যাগ চিন্তায়। বললেন, মা রাখবেন না। থাকলে আরও গোটা কয়েক লোকের চৈতন্য হতো। এ সব কেন? তার উত্তর, লোকশিক্ষার জন্য। আর সাময়িক। পয়েণ্ট ওয়ানে এসব ভাববিপর্যয়। নিরানব্বুই পয়েন্ট নাইন ঈশ্বরভাব।

ভক্তরা এসব চিন্তা করলে মনে বল পাবে। মনের স্থৈর্য রাখতে পারবে।

মূল বস্তু দু'টি — ব্রহ্ম ও জগৎ। আর জগতে 'আমি' জীব। এই 'আমি'-টাকে ব্রহ্মের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া। কখন 'আমি'-টা মিশে যায় ব্রহ্মের সঙ্গে — যেমন অবতারাদি, ঈশ্বরকোটিদের হয়। কখনও আল্‌গা হয়ে যায় 'আমি'-টা। তখন দুঃখকষ্ট, শোকতাপ। জীবের এসব থাকে সর্বদা — ঈশ্বরদ্রষ্টার সাময়িক।

এ যেন শিকল দিয়ে নৌকো বাঁধা। তুফানে নৌকোকে উল্টিয়ে দেয়, কিন্তু ছেঁড়ে না। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর সঙ্গে বেঁধে রাখা। মরণপণ না করলে এই বুদ্ধির বন্ধন টেঁকে না। মরণপণ করলে তিনি এসে রক্ষা করেন। তাই ঠাকুর ভক্তদের বলেছেন, 'আমায় ধর'। ব্যাপার ভারি কঠিন। কিন্তু তিনি ধরলে অতি সহজ।

একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন, মা বলেছেন, তোমায় সংসারে রাখবেন লোকশিক্ষার জন্য — 'ভাগবত' শোনাবে। দেখ, সংসারের এই শোকতাপ দুঃখ তিনিই রেখেছেন। আবার তার ঔষধ দেবার জন্য তিনিই ভক্ত তৈরী করেছেন। তারা বলবে সংসারতপ্ত জীবকে ভরসার বাণী, দেখাবে এই মরুভূমিতে 'ওয়েসিস'। এই দু'টি ভাবের খেলার নামই সংসার।

একজন ভক্ত — অবতারের জন্ম যদি মানুষের ন্যায় কর্মফলে না হয়, তবে কি করে জন্ম হতে পারে?

শ্রীম — ভক্তগণ ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে প্রার্থনা করেন নররূপ ধারণ করে আসতে। তাঁদের এই প্রার্থনাই কর্মফলের ন্যায় শক্তি অর্জন করে। সেই শক্তির প্রভাবে জন্ম নেন ভগবান অবতাররূপে। যতদিন শক্তির প্রভাব ততদিনই শরীর থাকে। এইরূপ বলেন দ্বৈতবাদী বেদান্তের আচার্যগণ।

২

দুইদিন পর ৭ই আগস্ট ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা। নিত্যকার ভক্তগণও আসিয়াছেন। আজ একটি নূতন ভক্ত আসিয়াছেন। সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম

ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রায় একঘন্টা ধ্যানের পর ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। নূতন ভক্তটি বিপদে পড়িয়াছেন—মোকদ্দমায় জড়িত।

নূতন ভক্ত — মোকদ্দমায় মন বড় খারাপ হয়েছে। সর্বদা দুশ্চিন্তা, কি হয়। মিথ্যা মোকদ্দমায় ফেলেছে। আচ্ছা, ভগবান কেন এরূপ মিথ্যা বিপদে ফেলেন?

শ্রীম — মনকে majestic height-এ (মহিমময় উৎকর্ষে) অর্থাৎ ঈশ্বরে তুলবেন বলে। সত্য মোকদ্দমাই হোক, আর মিথ্যাই হোক, মনের উপর প্রভাব সমান। মিথ্যা হলে আরও বেশী মনোকষ্ট।

তাই ঠাকুর বলতেন, সর্বদা সাধুসঙ্গ কর। তা-বই উপায় নাই। গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, আকাশে মেঘ উঠবেই। সূর্য ঢাকা পড়বেই। আবার মেঘ চলে যাবে। এতে যদি কথঞ্চিৎ স্থির থাকতে চায় কেউ, তবে এই মনকে ঈশ্বরের চরণে বেঁধে রাখতে হয়। আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। কখন কোথা দিয়ে কোন্ বিপদ আসে তার ঠিক নাই। প্রস্তুত থাকলে অত কাবু করতে পারে না।

ভক্ত — কি করে প্রস্তুত থাকা যায়? যখন সংসারের সব ভাল চলে তখন তো মনেই হয় না বিপদ আসতে পারে।

শ্রীম — হাঁ, সব ভুলিয়ে দেন মহামায়া। মনে থাকে না ভবিষ্যৎ বিপদের কথা। যদি মনে থাকে সকলের এই কথা, তা হলে কি করে চলে এই সংসার? তাই অবিদ্যামায়া দিয়ে সব ভুলিয়ে দেন ভগবান। যাদের এই ভবিষ্যৎ বিপদে সচেতন করাবেন তাদেরই বিপদ দেন — বিপদের উপর বিপদ। দম বন্ধ হয়ে যায় বিপদের চাপে। তখনই লোক ঈশ্বরকে স্মরণ করে। সংসারীর দৃষ্টিতে বিপদ দুঃখের কারণ। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিপদ সুখের কারণ।

ঈশ্বরের দু'টি ডিপার্টমেন্ট — বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। অবিদ্যায় ভুলিয়ে দেন। মৃত্যু পর্যন্ত ভুলে যায় মানুষ এর প্রভাবে। সংসারের অধিক লোকই অবিদ্যার অধীন। তারাই পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ধন-জন-যৌবন, সম্পদ-ঐশ্বর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, উচ্চ পদ আদিতে ভুলে থাকে। মনেও হয় না যে যেতে হবে শরীর ছেড়ে।

আর এক ক্লাস লোক করেছেন। তারা মনে রাখতে চেষ্টা করে —

'হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং'। তাই এ-শ্রেণীর লোক কেউ কেউ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সন্ন্যাসী মানে, অন্য কাজ ছেড়ে ঈশ্বরে মন রাখার চেষ্টা। এদের দেখে যারা সংসারে থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ, খুব অল্প তাদের সংখ্যা, সংসারে থেকেই ঈশ্বরে মন রাখতে চেষ্টা করে। তাদেরই বলে ভক্ত, নিষ্কাম ভক্ত। এটি বড় কঠিন। ঠাকুর বলতেন, এদের দু'খানা তরোয়াল রাখতে হয় — একখানা জ্ঞানের, অন্যখানা কর্মের। এদের জন্য ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়েছেন নিত্য নিয়মিত সাধুসঙ্গ করতে। সাধুরা যেন forward block (অগ্রগামী সম্প্রদায়)। তারা কাঁধে সঙ্গীন চড়িয়ে বন্দুক ধরে রেখেছে। কোন্ দিক দিয়ে কি বিপদ আসে তার জন্য।

শ্রীম (নূতন ভক্তের প্রতি) — যান না একবার। ফস্ করে দেখে আসুন না তাঁদের। তাঁরা বেলুড়মঠে থাকেন। ওখানে সিদ্ধপুরুষও আছেন। যান, অবিলম্বে দর্শন করে আসুন আগে মহাপুরুষকে।

নূতন ভক্ত — বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছি। কিছুই স্থির করতে পারছি না, কি করা উচিত।

শ্রীম — তাই তো আমরা ফ্রেণ্ডের মত এই উপদেশ দিলাম। সাধুসঙ্গ করুন। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন, কিভাবে কখন কি করতে হবে।

নূতন ভক্ত — আজ্ঞে, এই বিপদটা কৃপা করে কাটিয়ে দিন। তারপর সাধুসঙ্গ করবো।

শ্রীম (সহাস্যে) — সকলেই বলে এই কথা — আগে এ বিপদটা কেটে যাক্, তারপর সাধুসঙ্গ করবো। কিন্তু বিপদ কেটে যেই গেল অমনি আর সাধুসঙ্গের কথা মনে থাকে না। যখন বিপদ, তখনই সাধুসঙ্গ করতে হয়। যান, একবার দর্শন করে আসুন সাধুদের। তাঁদের দর্শনই সংসারের সকল বিপদের মহৌষধ।

ওঁদের সঙ্গে মিশলে বুঝতে পারবেন তাঁরা কত শক্তিমান। তাঁরা, ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, এটা বোধে বোধ করেছেন। তাই সংসার ছেড়ে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করেছেন। তাঁরা জানেন, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। তাই তাঁরা অত শক্তিমান। কত বিপদ স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন — কোথায় আহার, কোথায় বাসস্থান, কে দেখবে অসুখে — এসব প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেছেন। দৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরে। বাকী সব অনিশ্চিত। অনিশ্চিত অবস্থাই

মৃত্যু। সেই মৃত্যু বরণ করেছেন অমৃতকে, ঈশ্বরকে পাবেন বলে — গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করে। কত বিপদাপদ পার হয়ে তাঁরা এখন শান্ত। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় রাখলে আপনার মনেও ঐ বল আসবে। তখন মোকদ্দমায় হতবুদ্ধি হবেন না। আমি ঈশ্বরের সন্তান — বিশ্বাস পাকা হয়ে গেলে শত বিপদও মনের স্থৈর্য নষ্ট করতে পারে না। দেখুন না, পাণ্ডবদের! স্বামী বিবেকানন্দের কত বিপদ এদেশে ওদেশে। কিন্তু কি বীর, গ্রাহ্য নেই! এটি হয় যখন মানুষ বুঝতে পারে, আমরা তাঁর সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ। যাঁরা এটা বুঝেছেন তাঁদের সঙ্গ ও সেবা করলে অপরেও সেরূপ হয়ে যায় — বেদে আছে, 'ভ্রমর কীটবৎ'। আরশোলা কুমোরে পোকাকে ভেবে ভেবে কুমোরে পোকা হয়ে যায়!

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম যা বলেছেন মুখের কথায় এই ভক্তটিকে, তিনি তো কাজেই তা করছেন দেখছি। বাড়িতে বিপদ, পৌত্রের জটিল অসুখ, কিন্তু শ্রীম-র মনে দেখছি তার রেখাপাত হয় নাই। যদি হতো তবে কি অমন প্রশান্ত মনে এইসব কথা বলতে পারতেন? শুধু কি কথা বলা — ভক্তদের হৃদয় মন যে শান্ত করে দিয়েছেন! জগৎ ভুলে সকলে মধুপান করছেন। নূতন ভক্তটি দেখছি আপাততঃ শান্ত হয়ে গেছেন। বই পড়ে লেকচার দেয় যারা তাদের কথায় তো চিত্ত এরূপ প্রশান্ত হয় না। শ্রীম বাজনার বোল হাতে এনেছেন, ঠাকুরের কৃপায় ও নিজের চেষ্টায়। আমাদের তাই করতে হবে।

৩

ডাক্তার বক্সী — আজ বেলা দেড়টায় স্বদেশী যুগের সিংহ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী শরীর ত্যাগ করেছেন।

শ্রীম — হাঁ, শুনেছি। শোনা অবধি তিনটি কথা মনে উঠছে। এর মধ্যে দু'টি personal (ব্যক্তিগত) আর তৃতীয়টি ঈশ্বরীয়।

তখন সবে তিনি বিলেত থেকে ফিরেছেন আই. সি. এস্. হয়ে। তালতলার বাড়িতে রয়েছেন। আমাদেরও ইচ্ছা বিলেত গিয়ে আই.সি. এস হওয়া। এইরকম সময় ভাদ্র মাস। আমরা সকাল আটটায় গেছি তাঁর বাসায়। তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়

আমরা ছিলাম একটা সভার সেক্রেটারী, উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট।

খবর পেয়ে উনি এসে বাইরের ঘরে বসলেন। আমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছি — বিলেতের জীবনপ্রণালী, পড়ার কথা। উনিও শান্তভাবে অতি প্রীতির সঙ্গে সব জবাব দিচ্ছেন। এর মধ্যে বাড়ির ভিতর থেকে সকালের জলখাবার খাওয়ার ডাক এলো। উনি ওঠেন নি। রাশি রাশি প্রশ্ন চলছে — ওদেশের সংবাদ ও এদেশে এসে কাজের সংবাদ। যারা খুব ভাল result (ফল) করতো বি.এ. তে তাদের State scholarship (সরকারী বৃত্তি) মিলতো আই.সি.এস্. পড়ার জন্য। (সহাস্যে) তখন স্বপ্ন দেখতাম, ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চলছে কুয়াসার ভিতর দিয়ে। আমি পায়জামা পরে ডেকে বেড়াচ্ছি আনন্দে। বিলেত যাবার জন্য অত প্রবল বাসনা।

এবার বাড়ির ভিতর থেকে মধ্যাহ্নভোজনের ডাক এলো। উনি উঠছেন না। আর আমিও প্রশ্ন করা ছাড়ছি না। একটুকুও চাঞ্চল্য দেখি নাই তাঁ'তে। তারপর একটার পর উঠলাম। নমস্কার করে বিদায় নিলাম। বলে এলাম আবার আসবো সব জিজ্ঞেস করতে। অম্লান বদনে যেতে বললেন। রাস্তায় বের হয়েছি। তখন ভাদ্রমাসের কাঠফাটা রোদ। বাড়ি ফিরে জ্বর হলো। সেই জ্বরে অনেকদিন ভুগি। তখনই বুঝেছিলাম ইনি মস্ত বড় লোক হবেন — অত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও সৌজন্য যাঁর!

দ্বিতীয় কথাটি হয়, ঠাকুর তখন কাশীপুরে অসুস্থ। কেশববাবুর বক্তৃতায় ঠাকুরের কথার স্পর্শসুখ লাভ করে, আর সংসারের যাতনায়, বিলেত যাওয়ার আর বাসনা রইলো না। জীবিকার জন্য অধ্যাপনা গ্রহণ করা হলো। বিদ্যাসাগরমশায় তখন কলকাতার বিভিন্ন অংশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হলেন। আমাকে শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ ইংলিশ স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই সময়েই ঠাকুরের দর্শন লাভ করি। ঐ স্কুলে পাঁচ বছর কাজ করি। শেষের দিকে ঠাকুরের অসুখ হয়। তার জন্য সর্বদা কাশীপুরে যাতায়াত করতে হয়। তাই ঐ বছর স্কুলের result (ফল) অন্যান্য বছরের মত অত উত্তম হয় নাই। একদিন বিদ্যাসাগরমশায়ও ঐ কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করলেন। বললেন, এবার ওখানে অমুকের একটু বেশী যাতায়াত হয়েছে। তাই দেখছি ফল অন্য বছরের মত হয় নাই।

আমার প্রাণে আঘাত লাগলো, ঠাকুরের উপর আক্ষেপ আসায়। অমনি resign (পদত্যাগ) করলাম। বিদ্যাসাগরমশায় অত করে সস্নেহে বোঝালেন। কিন্তু আমি সবিনয়ে ঐ কথা শুনি নাই — resignation (পদত্যাগপত্র) ফিরিয়ে নিই নাই। সারা শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। ঠাকুরের কানেও ঐ সংবাদ পৌঁছাল। সব শুনে ঠাকুর বললেন 'বেশ করেছো, বেশ করেছো, বেশ করেছো' — তিনবার বললেন।

কিন্তু পনর দিনের মধ্যেই fountain dry (প্রস্রবণ শুষ্ক) — অর্থাভাব চরমে উঠলো। একদিন দোতালার বারান্দায় তিনঘন্টা পায়চারী করছি সশাবক ক্ষুধিতা সিংহিনীর ন্যায়। ভাবছি, কি খেতে দেবো ছেলেপুলেদের। ঐ সময়ে নিচে থেকে ডাক এলো — মহেন্দ্রবাবু, বাড়ি আছেন? নিচে চেয়ে দেখি একটা জুড়িগাড়ী, আর একজনের হাতে একটা পত্র। নিচে গিয়ে পত্র পড়ি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লিখেছেন। লিখেছেন, আমি শুনেছি আপনি বিদ্যাসাগরমশায়ের স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। আমি রিপণ কলেজ করেছি তা আপনি জানেন। আপনি যদি এই গাড়ীতেই চলে আসেন তবে খুব খুশি হব। এখানে আপনার খুব দরকার অধ্যাপনার জন্য। খুব জানাশোনা আর প্রীতি ছিল, তাই একেবারে গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ওখানে পাঁচ বছর অধ্যাপনা হলো। ঐ কলেজে কর্মের সময়ই সুধীর, হরিপদ, শুকুল, বিমল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা তখন ঐখানে পড়তো। তাঁদের একদিন নিয়ে যাই প্রথম বরানগর মঠে। আর শশী মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'।

আজ সুরেনবাবুর মৃত্যুতে এই কথাটাই বিশেষ করে মনে উঠছে। জীবনের একটা crisis-এ (সঙ্কটে) ঠাকুর সুরেনবাবুর ভিতর প্রবেশ করে অত স্নেহে ওটা থেকে রক্ষা করলেন।

আর তৃতীয় কথাটি এই সুরেনবাবু অত বড় লোক, কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয় নাই অত কাছে থেকেও। এদিকে কত বড় ত্যাগ, দেশের জন্য আই.সি.এস. কর্মটি গেল। কত বড় দেশভক্ত!

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, বিদ্যাসাগরমশায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম বাবু, কৃষ্ণদাস পাল, শশধর তর্কচূড়ামণি, প্রভৃতির সঙ্গে দেখা

হয়েছিল। ডক্টর মহেন্দ্র সরকার তো চিকিৎসা উপলক্ষে দশ মাস সঙ্গ করেন। হাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দর্শন করেছিলেন ঠাকুরকে নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে। তখন তাঁর বয়স বছর বিশেক। তাঁর রচিত একটি গান ঠাকুর শুনেছিলেন — 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। গানটির সুখ্যাতি করেছিলেন ঠাকুর।

কিন্তু সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমরা কখনও দেখি নাই ঠাকুরের কাছে। শুনেছি বলে মনে হয় না — কখনও দেখা হয়েছে বলে। এদিকে তো অত বড় লোক। তাই ক্রাইস্টের কথা মনে হচ্ছে। বলেছিলেন, শিশুর মত সরল ও নিরভিমান না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। হয়তো নাম শুনে থাকবেন, কিন্তু খেয়াল নেই। সময় না হলে হয় না।

৪

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। পূর্বপ্রান্তে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র পিছনে প্রশস্ত খোলা দরজা। এর পরই নিচে এইচ. বোসের বাড়ি। শ্রীম-র ডান ও বাম হাতে বেঞ্চ। তাহাতে বসা ভক্তগণ — বিনয় ও জগবন্ধু, শান্তি, বলাই ও যতীন প্রভৃতি। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

আজ শ্রীমর উদ্বেগ একটু কম। পৌত্র অজয় আজ অনেকটা ভাল। প্রবীণ ডাক্তার প্রাণধন বোস রোগীকে তিনতলায় দেখিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতলে শ্রীম-র নিকট আসিলেন। শ্রীম ও ভক্তগণ দাঁড়াইয়া প্রাণধনবাবুকে অভ্যর্থনা করিলেন। রোগীর অবস্থা ভাল, এই আশ্বাস দিয়া ডাক্তার নিচে নামিয়া যাইতেছেন। অন্তেবাসী লণ্ঠন লইয়া তাঁহাকে ফটকের কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ভক্ত ডাক্তার কার্তিক বক্সীও রোগীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। আর বড় জিতেন, বড় অমূল্য, রমণী ও রজনী আসিয়া বসিলেন শ্রীম-র কাছে।

এই বিপদেও শ্রীম স্থিতপ্রজ্ঞ। বাহিরে চাঞ্চল্যের কোনও প্রকাশ নাই। প্রশান্ত গম্ভীর প্রকৃতি। ভক্তরা কেহ কেহ শ্রীমকে বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন — গুণাতীত ব্যক্তি বিপদে কিরূপ আচরণ করেন।

রোগ, রোগীর কথা হইতে ভক্তরা চিকিৎসা, সেবা, মৃত্যু — এসব

বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন।

বড় অমূল্য — ডাক্তার খুব যত্ন করলো। বাড়ির লোকেরা সেবাও যথেষ্ট করলো। কিন্তু রোগী মরে গেল। এও তো হয়।

শ্রীম — বাঁচানোতে ডাক্তারই শুধু একটি কিন্তু factor (হেতু) নয়। আরও আছে। দৈব একটা আছে। 'দৈব' মানে তাঁর ইচ্ছা। ডাক্তার ভাল করে দেখলো। সেবাও যথেষ্ট হলো। তবুও রোগী মরে গেল। কেন? হয়তো একটা discipline (নিয়ম) ভেঙ্গে যাচ্ছে (রোগী না মরলে)।

তারপর এর moral value (নৈতিক মূল্য) কত! ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে তিনি বাপ-মার মনে কষ্ট দিলেন। যে মন তাঁর দিকে দিত সে মন ছেলের দিকে দিচ্ছে।

মন শূন্যে থাকতে পারে না। একটা বস্তু বা ভাব আশ্রয় করে সে থাকে।

ছেলে সকলের অতি প্রিয়। সেই ছেলেকে নিয়ে যাওয়ায় বাপ-মার মন সাংসারিক বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখন শান্তির জন্য সে মন ভগবানে দিবে। এরূপ যাদের হয়, বুঝতে হবে, তারা উঁচু থাকের লোক।

সাধারণ লোক আবার সব ভুলে যায়। তাই সে যা করছিল তাই করে। ঠাকুর বলতেন, বছর না যেতেই সেই শোকার্ত বাপ-মা আবার নূতন সন্তানের জন্ম দেয়। কি করবে — তাঁর মহামায়া সব ভুলিয়ে দেয়। যাদের চৈতন্য হয় শোকে, তারা অনেকটা এগিয়ে আছে।

এইরূপে জন্ম জন্ম ধাক্কা খেতে খেতে আত্মচৈতন্য লাভ হয়। তখন বোঝে এখানে আমাদের বাড়ি নয় — বাড়ি শ্রীভগবানের কাছে। তখনই পুত্রকন্যা-পরিজনকে তাঁর রূপ মনে করে তাঁরই সেবা করে। এদের ভিতর তিনিই আছেন, তখন তা বুঝতে পারে।

কর্ম রয়েছে প্রকৃতিতে। তা ছাড়বার যো নাই —

'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।' (গীতা ১৮:১১)

সেই কর্ম ক্ষয় করে ভগবানের সেবায় পরিজনরূপে। গৃহ তখন হয় আশ্রম।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই ঋষিরা বলেন, এ তাঁর লীলা, মানে

খেলা — এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। আজ জন্ম হলো। কাল বড় হলো! পরশু মরলো। এই খেলা চলছে জীবের।

এই world (জগৎ) ঈশ্বর থেকে একটা projection (প্রকল্প)। যেমন ঊর্ণনাভের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে জাল, তেমনি জগৎটা বেরিয়ে এসেছে তাঁর শরীর থেকে। আবার গুটিয়ে নেয় জাল। তাই সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে। মানুষ কি করবে বল।

বাবুরা বলে — এসব গাছ-গাছড়া কেন? এতে কিছু কাজ হয় না। কিন্তু নিজের কাজে লাগে না বলে কোনও দরকার নাই এর? যিনি এসব করছেন তিনি জানেন এর কি কাজ। আমার দরকার নেই বলে এর দরকার নেই? Where you can not unriddle trust in God. তুমি যদি বুঝতে না পার এই সৃষ্টির রহস্য, তা হলে ভগবানে বিশ্বাস কর।

সাধনভজন করা কেন? না, এই বুঝতে যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না।

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, মা জানতেও চাই না এই সব। কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। তিনিই বলেছেন এ কথা। মানুষ এর কি বুঝবে। বলেছিলেন, মায়াকে বুঝতে যেও না — মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সব তাঁর এলোমেলো। কেবল ভক্তি চাও।

কি হবে অত সব জেনে! জানার শেষ নাই। শেষে ও একটা রোগে পরিণত হয়। বেদে আছে, শৌনকের ঐ রোগ হয়েছিল। নারদেরও হয়েছিল। না-জানা যেমন রোগ, জানাও রোগ। অতি-জানা আরও বড় রোগ।

পিপ্পলাদ ঋষির উপদেশে নানানখানা জানার রোগ গেল শৌনকের। আর সনৎকুমারের উপদেশে নারদের অতি-জানার রোগ দূর হলো। শান্তিলাভ হলো উভয়ের।

স্বামীজীও বলেছিলেন, যা শিখেছি বমি করে তা ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। নানানখানা জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বরকে জানার পর দরকার হয় অন্যসব জানা যায়। ঈশ্বরের জ্ঞান ছেড়ে অন্যসব

জানা দুঃখ ও অশান্তির কারণ।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল এঁদের — শৌনক, নারদ, স্বামীজীর। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর অন্তরঙ্গগণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেই লোকশিক্ষা দেওয়া সম্ভব। ঠাকুর একজন ভক্তের (শ্রীম-র) জন্য মাকে বলেছিলেন — 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে চৈতন্য কেমন করে করবে।'

ব্রহ্মজ্ঞান মানে বৃহতের জ্ঞান — বৃহৎজ্ঞান। এটি লাভ হলে অন্য জিনিস লাভের ইচ্ছা থাকে না — 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' (গীতা ৬:২২)।

শৌনকের প্রশ্নটি বড় সুন্দর — 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?' (মুন্ডক ১:১:৩)। যা উত্তর দিলেন তার সার কথা হলো — তস্মিন্নু, তাঁকে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে হেঁজিপেঁজি লোক সাধন করে, কি জানতে? না, তোমার কিছুই জানতে পারলাম না — শুধু এইটি জানতে।

শ্রীম মত্ত হইয়া গান করিতে লাগিলেন।

গান। আমায় দে মা পাগল করে,
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।

গান। তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।

গান। কাকীমুখ আচ্ছাদিনী।

গান। ঘরে ঘরে আলেখ লাগায় রে যোগীয়া।

'আলেখ' মানে, যাতে লেখা নাই — মানে নিরঞ্জন, নির্দোষ। যেমন ঠাকুর — 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (ঈশাবাস্য ৮)। যিনি বাক্যমনের অতীত পরব্রহ্ম তিনিই 'আলেখ'।

এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। কৃষ্ণ, শান্তি, রমণী প্রভৃতি চলিয়া গেলেন। জগবন্ধুও মেসে গেলেন। সভা চলিতে লাগিল।

৫

এর কিছুদিন পর শ্রীম হালসিবাগানে গৌড়ীর মঠে উৎসব দেখিতে গেলেন বিকাল পাঁচটায়। ডাক্তার বক্সী মোটর লইয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন তিনটা হইতে। পাশেই পরেশনাথের মন্দির। শ্রীম বেশীক্ষণ ছিলেন না। দাঁড়াইয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবা দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রি আটটা। মর্টন স্কুলের ছাদে নৈশ আসর বসিয়াছে। শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। আর ভক্তগণ সম্মুখে তিনদিকে বসিয়াছেন বেঞ্চে। নিত্যকার ভক্তগণ সকলেই উপস্থিত। ভক্তগণ নানা কথা কহিতেছেন। শ্রীম ঐ স্রোত বন্ধ করিবার জন্য চৈতন্যদেবের কথা উত্থাপন করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গৌড়ীয় মঠে যাই কেন? ওখানে গেলে চৈতন্যলীলার একটা আভাস পাওয়া যায়। পুরীতে ভক্তগণ ঐরূপ বেশে থাকতেন — মুণ্ডিত মস্তক, ললাটে তিলক আর হাতে হরিনামের মালা। ঠোঁট মৃদু নড়ছে। চৈতন্যদেবও ঐখানে উপস্থিত রয়েছেন।

কেন এই মালার ব্যবস্থা? নইলে বাজে কথা হবে — চৈতন্যদেব বলতেন, গ্রাম্য কথা। মানে, বিষয়কথা। এটি ধর্মপথের শ্রেষ্ঠ বিঘ্ন। যত সদ্ভাব অর্জন করলো সারা দিনে, সেসব নষ্ট হয়ে গেল পাঁচ মিনিটে বাজে কথায়। তাই আচার্যরা এ বিষয়ে অত সাবধান সেটি বন্ধ করতে ব্যবস্থা দিলেন, মালা জপ কর।

এতে দু'টি লাভ — একটি, বাজে কথা বন্ধ করা। আর একটি, নামে রুচি বাড়ান। যেমন চন্দন ঘষতে ঘষতে সুগন্ধ বের হয় তেমনি নাম জপ করতে করতে আনন্দ হয় হৃদয়ে। একবার এর taste (আস্বাদ) পেলে তখন আপনি জপ করবে বাজে কথা ছেড়ে। বড় সুন্দর ব্যবস্থা!

কত দিক দিয়ে দৃষ্টি রাখতে হয় আচার্যদের। মনের স্বাভাবিক গতি বিষয়ভোগে। তাকে রোধ করা কি ছেলেখেলা? অর্জুনের মত উত্তমাধিকারীই বলছেন — 'বায়োরিব সুদুষ্করম্'। কি শ্লোকটা?

ডাক্তার বক্সী — চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

(গীতা ৬:৩৪)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বায়ুকে দমন করা যেরূপ সুদুষ্কর তেমনি সুদুষ্কর মনকে বশ করা। 'সুদুষ্কর' মানে অত্যন্ত কঠিন। অথচ এই মনকেই বশ করতে হবে। নইলে ঈশ্বরদর্শন হবে না। এই যত আয়োজন — মঠ, মন্দির, পূজা, পাঠ, তীর্থদর্শন, সেবা, জপ, ধ্যান প্রভৃতি — এ সবই মনকে বশ করার উপায়। নানা শাস্ত্র, নানা মত, নানা সাধন — এ সবই মনকে বশ করার জন্য।

কৃষ্ণ অর্জুনকে ব্যবস্থা দিলেন অভ্যাস আর বৈরাগ্য সাধন করতে। বললেন, এই চঞ্চল মনকে বশ করা নিশ্চয় অতি কঠিন। তথাপি অভ্যাস আর বৈরাগ্য দ্বারাই একে ধরা যায়— 'গৃহ্যতে'। মানে, বশ হয়। যেমন পাগলা ঘোড়া। দৌড়ে পালাচ্ছে। প্রথমে তাকে খাবারটাবার দেখিয়ে ধরে। তার উপর চড়ে। কিংবা মাল বোঝাই করে, বা গাড়িতে জোতে। ঠিক তেমনি উপায়ে মনকে বশ করা।

জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ — এ সবই অভ্যাস। এই মালাজপ, এটিও অভ্যাস, ভক্তিযোগের অন্তর্গত। কিন্তু কেবল অভ্যাসে হয় না। 'বৈরাগ্য' চাই। বৈরাগ্য মানে, সংসারে বিরাগ, বিতৃষ্ণা। ঈশ্বরে অনুরাগ, সুতৃষ্ণা। ঈশ্বরে অনুরাগ প্রথমে হয় না। তাই ব্যবস্থা, প্রথমে সদসৎ বিচার। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — মনকে বারবার শোনাতে হয় একথা — গুরুর মুখে, শাস্ত্রমুখে আর নিজের মুখে। আর ঐ সঙ্গে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা, জপ করা। এ সবই একসঙ্গে চলে। যেমন অরুণোদয়, অন্ধকার নাশ আর জগৎপ্রকাশ একসঙ্গে হয় — তেমনি, অভ্যাস, বৈরাগ্য আর অনুরাগ একসঙ্গে চললে ঈশ্বরদর্শন হয়। মন বশ হলে তখন তাকে ঈশ্বরে লগ্ন করা। তখন জপ করতে করতে আনন্দ লাভ হয়। সেই আনন্দের শেষ আনন্দময়কে, আনন্দস্বরূপকে দর্শন। এটাই মুক্তি, এটাই সিদ্ধি। তাই বলে জগৎসিদ্ধি।

গৌড়ীয় মঠে এই দৃশ্যটি দেখা যায় — চৈতন্যদেব বসে আছেন আর চারদিকে ভক্তগণ, হাতে মালা। চৈতন্যদেবের উদ্দীপন হয়।

এক এক যুগে এক এক রকম উপায়। ঠাকুর এ যুগে ব্যবস্থা দিলেন, সাধুসঙ্গ কর, সাধুসেবা কর। আবার এই যুগের উপযোগী সাধুও তৈরী করেছেন। ঠাকুরের সব উপদেশ এক কথায় বলা যায় — সাধুসঙ্গ। এটি

করলে সাধুসেবা অভ্যাস ও বৈরাগ্য আপনি আসবে। কারণ ক্রমে সাধুদের ভালবাসা পাবে সাধুদের সেবা করে। তা হলে তাঁদের অর্জিত বৈরাগ্য লাভ হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে ভালবাসাও হবে।

জীবশিবের সেবা — এটাও এই যুগের অনুকূল সাধন মনকে বশীভূত করার। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ কেহ কেহ এই জীবশিব সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা ঠাকুরের কৃপায় ঈশ্বরদ্রষ্টা। তাঁদের সঙ্গ ও সেবা করলে তাঁদের আচরণের অভ্যাস এসে যাবে। তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদের মত আচরণ করলে সহজেই মন বশ হয়। এটা নূতন পথ। এ যুগের অনুকূল।

কথা হচ্ছে, সাধুসঙ্গ করা। এটা করলে ওঁদের আচরণ অভ্যাস করবে। এঁদের মধ্যে প্রাচীন ভাবের আচরণও আছে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের পথ — যোগের পথ, আর ভক্তির পথ। আবার শিব বুদ্ধিতে জীবের সেবার পথ — নিষ্কাম কর্মের পথও আসে। যা তোমার অভিপ্রায় তাই নাও। পূজাপাঠ জপধ্যানই কর আর জীবশিবের সেবাই কর, ফল একই — চিত্তশুদ্ধি। আমি ঈশ্বরের, আর ঈশ্বর আমার — এই দুই ভাবেই মুক্তিলাভ হয়।

জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ — এ চার পথকে ঠাকুর দু'পথে ভাগ করেছেন — মনোযোগ আর কর্মযোগ। এ সবই উপায়, উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। উপায় ভিন্ন ভিন্ন, উদ্দেশ্য এক। উপায় বদলায় যুগে যুগে, উদ্দেশ্য এক — সর্বযুগে।

বর্তমান যুগের প্রবর্তক ঠাকুর। তাঁর এই ব্যবস্থা — মনোযোগ ও কর্মযোগ। দু'পথেই ঈশ্বরলাভ হয়।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

একটি ভক্ত — ঠাকুর এক স্থানে বললেন, এই চোখেই সব ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। আর এক স্থানে বলছেন, এতে দর্শন হয় না। চিন্ময় শরীরে দর্শন হয়, চিন্ময় চোখে। এর মানে কি?

শ্রীম — ভোগের ঘরে চাবি পড়লে তখন সবই ব্রহ্ম দেখতে পাওয়া যায় — 'সর্বং ঋল্বিদং ব্রহ্ম', এই চোখেই। যতদিন এই ঠাণ্ডা হাওয়াতে আমার শরীর ঠাণ্ডা হবে, এই বোধ রয়েছে ততদিন নয়। ততদিন এই

চোখে হয় না দর্শন। ততদিন ভাবচক্ষুতে দর্শন হয়। সেই চক্ষু হয় ভাগবতী তনুতে, ঠাকুর বলতেন।

ঠাকুর এই চক্ষে সব দর্শন করতেন পূর্বে। কিন্তু ভক্তদের শিক্ষার জন্য অনেক নিচে নেমে এলেন। তখন দর্শন হতো ভাবচক্ষুতে। এই ভক্তদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছেন, এই ভাবে ডুবে গেলেন। কখন সচ্চিদানন্দে লীন। তখন তিনি একমদ্বিতীয়ম্। কে কার ভক্ত, কে কাকে শিক্ষা দেয়!

ডাক্তার বক্সী দক্ষিণেশ্বর হইতে ভবতারিণীর সিন্দুর আনিয়াছেন। শ্রীম উহা জুতা ছাড়িয়া নিজ হাতে গ্রহণ করিলেন অতি সম্ভ্রমে। নিজের হাতে নিজের কপালে টিপ পরিলেন। আর ভক্তদেরও টিপ লাগাইতে বলিলেন। ভক্তগণ টিপ লাগাইতেছেন। আর শ্রীম সিন্দুরের এই টিপের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এর মানে, কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়ে মায়ের ছেলে বলে বরণ করলেন মা। স্পার্টাতে (Sparta) সৈন্যদের বরণ করতেন রাজা। কপালে সিন্দুরের টিপ দেখলেই বুঝতে হবে, মা বরণ করেছেন একে মায়ের ছেলে বলে — জগদম্বার ছেলে — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (শ্বেতা ২:৫)।

পুরাতন শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ভবন।
৭, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
২৮শে আগস্ট, ১৯২৫ খ্রীঃ, শুক্রবার।

চতুর্দশ অধ্যায়

নাগজয়ন্তী — ডক্টর মরিনো

১

এলবার্ট হল। কলিকাতা। অপরাহ্ন চারিটা। আজ এখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ সন্ন্যাসীসদৃশ গৃহাশ্রমী শ্রদ্ধেয় শ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের জন্মোৎসব সভা। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই সভায় পৌরোহিত্য করিবেন। নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবাহিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন গুরুদেবের ন্যায় তাঁহার স্ত্রীর সহিত সকল দেহসম্পর্ক-বিবর্জিত ছিলেন। শ্রীগুরুদেবের ন্যায় স্বীয় ধর্ম-পত্নীকে জগদম্বার পবিত্র আসনে সমাসীন রাখিয়াছিলেন সারা জীবন।

সভার কার্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। তথাপি সুবৃহৎ হল লোকে লোকারণ্য। উপরের গ্যালারীও শ্রোতায় পরিপূর্ণ। কথামৃতকার শ্রীমও মহাযোগী গুরুভাই শ্রীনাগমহাশয়ের জয়ন্তী বাসরে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি হলের দক্ষিণ দিকের শেষ বেঞ্চে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। তাঁহার পাশে অন্তেবাসী, বিনয় ও ডাক্তার বক্সী উপবিষ্ট।

শ্রীম-র পাশে ডক্টর মরিনো (Moreno) ডি. লিট., আসিয়া বসিয়াছেন। ইনি এ্যাংলা ইণ্ডিয়ান সমাজের নেতা আর কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার। ডক্টর মরিনো শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার একজন সহৃদয় সমর্থক। তিনি শ্রীম-র সহিত ধর্মবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন।

*Dr. Moreno (to Sri M.) — Vedanta can not find God — what does it mean really?

---

* ডক্টর মরিনো (শ্রীম-র প্রতি)—বেদান্ত ঈশ্বরকে পায় না—এর মানে কি?

M. — Vedanta means, the Upanishads. The Upanishads aim at the knowledge of the Brahman or God. The study of the Vedanta or the scholarship thereof alone can not find God. This is the meaning of this statement.

In other words, simply intellect can not fathom God, although it is required in the beginning. Faith, faith in the words of the Guru like a child, has in the words of its mother, alone can reveal God, not learning. Because He is beyond all senses. Beyond all intellection — Vakyamanatita.

It is in this sense that Christ declares — 'unless ye be born again, ye can not enter into the Kingdom of Heaven.' To 'be born again', means to plunge oneself in deep Sadhana or spiritual practices, believing in the words of the Guru and the Sastras.

The Brihadaranyaka Upanishad very aptly illustrates this point in the story of Narada and Sanatkumar. Narada became almost the embodiment of scholarship, and yet

---

শ্রীম — বেদান্ত বলতে উপনিষদ্ বোঝায়। সকল উপনিষদের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্‌জ্ঞান। কেবলমাত্র বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অথবা এতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ঈশ্বরকে পায় না। ঐ উক্তির ইহাই মর্ম।

প্রকারান্তরে বলা যায়, শুধু বুদ্ধি ঈশ্বরের সন্ধান করতে পারে না। যদিও প্রথম দিকে বুদ্ধির অবশ্য প্রয়োজন।

বিশ্বাস চাই। শিশুর যেমন মাতৃবাক্যে বিশ্বাস, তেমনি গুরুবাক্যে বিশ্বাসই কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকটিত করতে সমর্থ — বুদ্ধি নয়, বিদ্যাও নয়। কারণ ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয়, সকল বুদ্ধিবিচারের পার — বাক্যমনাতীত।

ক্রাইস্টের মহাবাক্য — নবজন্ম লাভ বিনা ধর্মরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব নয় — এই অর্থেই বিঘোষিত। নবজন্ম লাভ মানে, গুরুবাক্যে আর শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করে ধর্মসাধনায়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অনুশীলনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হওয়া।

নারদ-সনৎকুমার উপাখ্যান দিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এই বিষয়টি অতি সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন। নারদ পাণ্ডিত্যের প্রায় মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। তথাপি

he could find no peace. The Maharshi Sanatkumar advised him thus — "Give up all your studies and learning, practise meditation and discrimination. You have so far known the meaning of words only and certainly not the spirit behind them."

Sri Ramakrishna also stressed upon this point when he said — 'The notations of the instrumental music have to be brought on in hands.'

Again, study can not reveal God — not even practice. But His Grace alone can reveal Him to men. This is the significance of this utterance — 'Vedanta can not find God.'

So, the Rishis giving up all other engagements, retired into solitude and engaged themselves whole-heartedly in sadhana and prayer for His Grace to reveal Himself unto them.

Christ also retired into the forests for forty days and forty nights. During this period God revealed Himself unto him and commissioned him to preach the Gospel.

চিত্ত শান্তিবিবর্জিত। সনৎকুমার তাঁকে উপদেশ দিলেন, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিদ্যানুশীলন ছেড়ে ব্রহ্মধ্যান ও সদসদ্বস্তু বিচার অভ্যাস কর। এতকাল তুমি কেবল শব্দার্থ অর্জন করেছ, শব্দের প্রতিপাদ্য মর্মার্থ নয়।

বাজনার বোল হাতে আনতে হবে — এই উক্তি দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণও এই অভ্যাসের উপরই জোর দিয়েছেন।

আবার আছে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে অসমর্থ — ধর্মসাধনাও তাই। একমাত্র ভগবৎকৃপাই মানুষের কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশনে সমর্থ। বেদান্ত ঈশ্বরকে পায় না — এই বাণীর অর্থ এই।

তাই ঋষিগণ সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করে গহন বনে গমন করতেন। আর সর্বান্তঃকরণে সাধনা ও 'ভগবান কৃপা করে আমাদের নিকট প্রকটিত হন' — এই প্রার্থনায় নিজেদের নিযুক্ত করতেন।

ক্রাইস্টও চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রির জন্য গহন বনে গমন করেছিলেন। ঐ সময়ে ভগবান তাঁর কাছে প্রকটিত হয়ে সত্যধর্ম প্রচারে তাঁকে বরণ করেন।

Dr. Moreno — The Vedanta Darshan has been the backbone of the Indian Culture.

M. —The Vedanta Darshan or philosophy is one thing, and the Vedanta is another thing.

The systematic interpretation of the Vedanta, that is, the Upanishads by the sage Vyasa. There are many apparent contradictory statements in the Upanishads. The sage Vyasa reconciled them in his famous treaty named the Vedanta Darshan in several hundred aphorisms.

Correctly speaking, not the Vedanta Darshan, but the Vedanta or the Upanishad, is the backbone of the Indian culture.

Upon Brahmajnan stands this gigantic superstructure of the Indian culture.

Man is divine — upon this truth stands India with its hoary civilization and culture.

To testify this divine origin of man, Sri Ramakrishna became the Babe Eternal of the Mother Eternal of the universe, as did Christ become the Son Eternal of the Father Eternal.

ডক্টর মরিনো — বেদান্তদর্শনই ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড।

শ্রীম — বেদান্তদর্শন এক জিনিস, বেদান্ত ভিন্ন জিনিস। বেদান্তদর্শন হলো, মহর্ষি বেদব্যাস রচিত বেদান্তের, অর্থাৎ উপনিষদসমূহের একটি ধারাবাহিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

উপনিষদ্‌গুলিতে আপাতবিরোধী অনেক বাণী আছে। মহর্ষি ব্যাস ঐ বাণীসমূহের সমন্বয় করেছেন কয়েকশত সূত্রে, তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বেদান্তদর্শনে।

ঠিক ঠিক বলা যায় — বেদান্তদর্শন নয়, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌ই ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই অতি বিশাল সৌধ ব্রহ্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ ঈশ্বরসম্ভূত স্বরূপতঃ — এই মহাসত্যের উপর ভারত দাঁড়িয়ে আছে তার অতি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে।

মানুষ ঈশ্বরসম্ভূত, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' — এই মহাসত্য সুপ্রমাণিত করবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সেজেছিলেন জগদম্বার কোলের শাশ্বত শিশু। যেমন ক্রাইস্ট সেজেছিলেন শাশ্বত পিতার শাশ্বত পুত্র।

Dr. Moreno — In what sense, does the Indian philosophy differ from the western philosophy?

M. — The Indian philosophy is based on direct perception of God. So it is called darshan, that is, seeing — visualising. Among the ancient Greek philosophers, some appear to have approached God before giving out their philosophy.

But the modern philosophy of the west is entirely inferential in nature. It is the product of the senses and intellect.

In India a philospher is first a Rishi, that is, a God realised man. Then second, when he gives out to the world the benefit of his unique experience in a rational language, he is called a philosopher. It is why here philosophy and religion are the same thing. Philosophy in practice is religion.

Kant says — God is unknown and unknowable. But St. Paul says — Him I declare unto you. And Christ says — The son knoweth the Father. Again : I and my Father are one.

ডক্টর মরিনো — ভারতীয় দর্শন আর পাশ্চাত্য দর্শনের পার্থক্য কি?

শ্রীম — ভারতীয় দর্শনের মূলভূমি ঈশ্বরের অপরোক্ষ দর্শন। তাই একে বলে দর্শন, অর্থাৎ দেখা। প্রাচীন গ্রীক দর্শনকারদের মধ্যে নিজেদের দর্শনশাস্ত্র অপরের নিকট প্রকাশ করার পূর্বে কেউ কেউ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন একেবারে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবিচারপ্রসূত। তাই ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অনুমান জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতে একজন দর্শনকার আগে হন ঋষি, অর্থাৎ ব্রহ্মদ্রষ্টা। তারপর যখন তাঁর এই অপূর্ব ব্রহ্মদর্শনের কথা যুক্তিসঙ্গত ভাষায় জগতে প্রকাশিত হয় তখন তাঁকে বলা হয় দর্শনশাস্ত্রকার। এই অর্থেই ভারতে দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম একই বস্তু। জীবনে দর্শনশাস্ত্রের অনুষ্ঠানের নামই ধর্ম।

কান্ট বলেন, ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেন্ট পল বলেন, তাঁকেই আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি। আর ক্রাইস্ট বললেন, পুত্র পিতাকে জানেন। আবার বললেন, আমি ও আমার পিতা এক বস্তু।

The modern western philosophy is not based on revelation. So, it is not practised. It is born in the intellect. The Indian philosophy is born in intuition or the direct perception of God. So, it is based on Truth, the Truth of all truths. Even the Jain philosophy and the Buddhist philosophy which do not recognise the authority of the Vedanta are based on the direct perception of the Ultimate Truth.

Dr. Moreno — Sri Ramakrishna was illiterate and yet all learned men of his time sat at his feet to learn more.

M. (with a broad smile) — Yes, about Christ the doctors of religion said : Is not this carpenter's son? Whence then hath this man all these things? Never man spake like this man, for he taught them as one having authority.

God is all-knowledge. When a man becomes one with Him he never lacks it. If God makes him His

---

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্র এই সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এইজন্যে কেউ তা নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করে না। ইহার প্রসূতি (জন্ম) বুদ্ধি হইতে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রসূতি বুদ্ধির পরপারে তত্ত্ববোধে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বর-দর্শন জ্ঞানে। তাই ইহার জন্মভূমি—সকল সত্যের জন্মভূমি চরম সত্য, শাশ্বত সত্য।

ভারতীয় জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন বেদান্তের আধিপত্য স্বীকার না করলেও তাদেরও অধিষ্ঠান চরম সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞানে।

ডক্টর মরিনো— শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়-নিরক্ষর ছিলেন। তবুও সমসাময়িক পণ্ডিতগণ অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর চরণপ্রান্তে আশ্রয় নিতেন।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে) — হাঁ। ক্রাইস্টের সম্বন্ধে তৎকালীন ধর্মাচার্যগণও এই কথাই বলতেন, এই লোকটা তো সূত্রধরের ছেলে, নয় কি? কিন্তু কোথা থেকে সে অত জ্ঞান লাভ করলো? কখনো কেউ অমন জ্ঞানগর্ভ কথা বলে নাই। সে একজন উচ্চ অধিকারী আচার্যের মত জনগণকে শিক্ষা দিচ্ছে।

সকল জ্ঞানময় ঈশ্বর। যখন কেউ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন তার জ্ঞানের অভাব হয় না। যখন ভগবান কাউকে তাঁর মহাবাক্য প্রচারের যন্ত্ররূপে অভিষিক্ত

instrument to propagate His message, he is given endless supply of knowledge.

And when He speaks through the mouth of His incarnations, they get the utmost supply. For He and His incarnations are one.

Dr. Moreno — I think, there are grades in the incarnations. Buddha, I take to be the greatest.

M. — All are the same!

সভার কার্য আরম্ভ হইল উদ্বোধনসঙ্গীত দিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত অমর সঙ্গীতটি গাহিতেছেন বিখ্যাত দার্শনিক সঙ্গীতবিশারদ শ্রীদিলীপ কুমার রায়। গায়কের সুমধুর ও মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বরের সহিত সঙ্গীতের পদগাম্ভীর্যের সম্মিলনে সভামণ্ডপে একটি পবিত্র ও প্রশান্ত ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। সভ্যগণের হৃদয় অজ্ঞাতে সেই ভাবমাধুর্যে পরিপূর্ণ।

শ্রীম-র পক্ষে জনবহুল স্থানে অধিকক্ষণ থাকা কষ্টকর। তাই তিনি প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বক্তার পর বক্তা নানাভাবে নাগমহাশয়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। একজন বলিতেছেন, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রদীপ্ত সুমধুর, দীনতা ছিল প্রস্তরবিগলিনী। আর একজন বলিলেন, তাঁহার গুরুভক্তি ছিল সংক্রামক। আর সুশীতল জলের ন্যায় মনপ্রাণে মাধুর্যসঞ্চারী। অন্য বক্তা বলিলেন, নাগমহাশয়ের সেবায় ক্ষুদ্র হৃদয় বিশাল রূপ ধারণ করিত আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মানের স্পর্শে। একজন বলিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সংযম ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। অপর একজন বলিলেন, নাগমহাশয়

করেন, তখন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার হয় অফুরন্ত। আর তিনি যখন তাঁর অবতারের মুখ দিয়ে লোকশিক্ষা দেন তখন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার হয় আরও অধিক ও অফুরন্ত। কারণ, তাঁর অবতার আর তিনি — এক।

ডক্টর মরিনো — আমার মনে হয়, অবতারদের ভিতরও তর, তম আছে। বুদ্ধকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলে মনে করি।

শ্রীম — সবই এক!

ছিলেন স্বল্পভাষী। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন বাগ্‌বিলাসী। একজন কহিলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে বাঁধিতে গিয়া মহামায়ার বন্ধনরজ্জু হইয়া গেল ছোট আর স্বামীজী হইলেন অতি বিশাল ব্রহ্মসদৃশ। আর নাগমহাশয়কে বন্ধন করিতে গিয়া বন্ধনরজ্জু হইল নিষ্ফল। নাগমহাশয় হইলেন এত ক্ষুদ্র যে উহা বন্ধনের অযোগ্য। আর একজন স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, সারা জগৎ ঘুরিয়া আসিলাম, কিন্তু অমন মহাপুরুষ কোথাও দেখিতে পাই নাই। অন্যজন বলিলেন, অতি প্রাচীনকালে ভগবান বাহির হইয়াছিলেন স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর হইতে নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে। একথা একালের লোক কেহ বিশ্বাস করে, কেহ করে না। কিন্তু নাগমহাশয়ের কাতর প্রার্থনায় পতিতপাবনী গঙ্গা যে নাগমহাশয়ের অঙ্গনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ঝরণার মত, ইহা তো প্রত্যক্ষ! তাই আজ দেওভোগ হইল গোমুখী গঙ্গোত্তরী। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ভগবান — ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ নাগমহাশয়ের সুন্দর পবিত্র জীবন।

মর্টন স্কুল। ছাদে শ্রীম অপেক্ষা করিতেছেন সভার শেষ দিকের বিবরণ শুনিতে। এখন সন্ধ্যা আটটা। ভক্তগণ অনেকে সভা হইতে ফিরিয়াছেন। আর কেহ কেহ শ্রীম-র কাছে বসিয়া আছেন। অন্তেবাসী শ্রীমকে শেষ বিবরণ পরিবেশন করিলেন। এবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এসেছিলেন বলে এইসব মহাপুরুষ দেখা যাচ্ছে। এঁরা হলেন মূর্তিমান ধর্ম। এঁদের জীবন ও আচরণ দেখে লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। অবতার ও সাঙ্গোপাঙ্গ যুগে যুগে না এলে ধর্মের বিলোপ হয়ে যেতো। ঠাকুর এসেছেন এই যুগে। তাই নাস্তিকতার অভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে ধর্মের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, যাচ্ছে। নাগমশায় আসায় পূর্ববঙ্গ পবিত্র হয়ে গেছে। দেশের লোক যত আলোচনা করবে এঁদের জীবন, তত দেশের ও দশের কল্যাণ। ধর্মের বাহ্য আবরণ তো সবই রয়েছে — তীর্থ, তপস্যা, মন্দির, সবই তো আছে। কিন্তু প্রাণহীন। ঠাকুর এসে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছেন মৃতপ্রায় ধর্মে। তাঁর নিজের জীবন ও অন্তরঙ্গদের জীবন ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ।

মজাটা দেখ না। ঠাকুর প্রাচীন, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গগণ সব নবীন।

ঠাকুর প্রায় - নিরক্ষর। অন্তরঙ্গগণ ইংরেজী-পড়া 'ইংলিশম্যান'। কি জিনিস তিনি এদের দিয়েছিলেন যে তাঁরা সারাজীবন তাঁর দাস হয়ে রইলো? এই ফলগুলিই প্রমাণ করছে ঠাকুর অবতার।

রাত্রি নয়টা।

পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতি ভবন।
৭ নম্বর শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খ্রীঃ।
শ্রীদুর্গাচরণ নাগ-জয়ন্তী।

পঞ্চদশ অধ্যায়

গৃহেই থাক আর গৃহ ছাড় — লক্ষ্য, ঈশ্বরদর্শন

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীম-র শয়নকক্ষের পাশের পার্টিশানের ঘর। রাত্রি সাতটা। শ্রীম বেঞ্চে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, দোর গোড়ায়। সম্মুখে হাইবেঞ্চযুক্ত বেঞ্চে বসা ভক্তগণ — বড় জিতেন, ডাক্তার, বলাই, মনোরঞ্জন, দুর্গাপদ, অমৃত, সুখেন্দু, রমণী, ছোট জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু, বড় অমূল্য প্রভৃতি।

আজ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৩২ সাল, মঙ্গলবার।

অন্তেবাসী অপরাহ্নে বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। খোকামহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) মঠের বাগান হইতে একটি বাতাবী লেবু তাঁহার হাতে শ্রীম-র জন্য পাঠাইয়াছেন। ঐ লেবুটি তাঁহার হাতে দিলে শ্রীম জুতা ছাড়িয়া যুক্তকরে উহা মাথায় ঠেকাইলেন। অতি সম্ভ্রমে বলিলেন, ঠাকুরের প্রসাদ, খোকা মহারাজ পাঠিয়েছেন। সাধু পাঠিয়েছেন মানে, ঠাকুর পাঠিয়েছেন। তিনি সাধুর ভিতর দিয়ে কাজ করেন। কেটে সকলকে দিন।

এইবার মঠের সকল সংবাদ লইলেন তন্নতন্ন করিয়া। সাধুদের সংবাদ নিত্য চাই। ইহা ছাড়া শ্রীম থাকিতে পারেন না — যেন ড্যাঙ্গার মাছের মত ছট্‌ফট্ করেন। শ্রীম কলিকাতায় থাকেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া আছে সাধুদের কাছে। শ্রীম-র মনের এই অবস্থা। তাই বুঝি ঠাকুর নিত্য ভক্তদের তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেন। আর মাঝে মাঝে পাঠান সাধুদের। সাধুরা শ্রীম-র সাধুভক্তি দেখিয়া আত্মসম্মান অর্জন করেন। কেন সাধু ভক্ত পাঠান? তাহা হইলে তাঁহার কথা হইবে। তাহাতে শ্রীম-র প্রাণ হইবে শীতল। আর ভক্তগণ ঠাকুরের কথা শুনিয়া ধন্য হইবে।

শ্রীম ঠাকুরের চরিতসুধা ভক্তদের বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — তুমি চাও আর নাই চাও, তিনি অর্থাৎ অবতার highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ) দিয়ে যাবেন। দেখ না সন্ন্যাসীদের কি বললেন? বললেন, সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। এখন তুমি না পার তুমি বোঝ। তা বলে তিনি বলতে ছাড়বেন না। তাঁর আগমনই এই জন্য।

গৃহস্থদের বললেন, ভাইবোনের মত থাকবে দু'একটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে। আর বড়ঘরের দাসীর মত থাকবে।

এমন test (কষ্টিপাথর) দিয়ে গেছেন, আর লুকোচুরি করার যো নাই। তুমি হাজার গেরুয়াই পর আর যাই কর, কামিনীকাঞ্চন থাকলে সমাধি হবে না। আবার সমাধি হলে বোঝা যায়, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ হয়েছে। এটা synchronous (একসঙ্গে চলে)। দেখ না, সংসারত্যাগ বললেন না। বলছেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ধর্মসংস্থাপন অবতারের একটি কাজ। সৎ ধর্মের আদর্শ স্তরে স্তরে শিক্ষা দেন।

গৃহস্থাশ্রমী ভাল না হলে সন্ন্যাসী ভাল হবে না। আবার সন্ন্যাসী ভাল না হলে গৃহস্থ ভাল হবে না।

চারটি আশ্রম এখন দু'টিতে পরিণত হয়েছে। আর ঠিক ঠিক বলতে গেলে দু'টিই আশ্রম — সন্ন্যাস ও গৃহস্থ। ব্রহ্মচর্য ও বাণপ্রস্থ — এও সন্ন্যাসের অন্তর্গত। তাই ঠাকুর এই দু'টি আশ্রমকে বিশেষ করে শিক্ষা দিয়েছেন।

যদি আদর্শের মত না চলতে পার গৃহস্থাশ্রমে, তবে with apology (ক্ষমা প্রার্থনা করে) থাক। আর চেষ্টা কর weakness (দুর্বলতা) overcome (জয়) করে থাকতে। আর সর্বদা প্রার্থনা কর — প্রভো, সুমতি দাও।

জটিল ব্যাপার কিনা, কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে থেকে তা দ্বারা অভিভূত না হওয়া। বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁর কৃপায় দু'একজন পারে এরূপভাবে থাকতে। তার জন্যই বলেছেন, যতই সেয়ানা হও, কাজলের ঘরে থাকলে তার দাগ লাগবেই।

আবার বলছেন, আর যদি সন্ন্যাসী হও, ঐ আদর্শ — স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। এ আশ্রমে সংসার 'ছাড়া' হয়েছে। এও কম নয় — স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা।

কিন্তু সকলে কামিনীকাঞ্চন ছাড়তে পারে না। বাইরে ছাড়লেও মনে থাকে। তাঁর কৃপায় সমাধি হলে যায়। সে অনেক দূর। তাই সর্বদা প্রার্থনা করে চলতে হয়। তাই ঠাকুর প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

কেন আদর্শটি সামনে ধরেছেন? তা হলে অহংকার কম পড়বে। যেতে হবে ঐখানে অত উঁচুতে। দীনভাব আসবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।

তিনি কারুর বলার অপেক্ষা রাখেন না। তুমি জিজ্ঞেস করলেই বলবেন, নইলে নয় — তা নয়। তাঁর কাজই এই, প্রথম ও প্রধান — ভক্তদের তোলা। তাঁদের সামনে আদর্শ ধরে রাখলেন — ঈশ্বরদর্শন। গৃহেই থাক আর বাইরেই থাক, আদর্শটি সামনে ধরে এগুতে থাক।

শ্রীম পুনরায় ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গৃহস্থাশ্রমীর ভয় বেশী। তাই তাদের বললেন, সাধুসঙ্গ কর। কিরূপ সাধুর সঙ্গ করতে হবে? এর উত্তর দিলেন নিজে সাধু তৈরী ক'রে। বললেন, এদের সঙ্গ কর। ভক্তদের আরও বললেন, এখানকার একজনকে খাওয়ালে হাজার সাধু খাওয়ান হলো।

তিনি সাধু তৈরী করেছেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু, সমাধিবান সাধু। ভক্তরা এদের দেখলে বুঝতে পারে নিজেরা কত নিচে রয়েছে। আর তাঁদের ধরে ওপরে ওঠে। এই সাধুদের দিয়েই ধর্মসংস্থাপন করান।

যুগে যুগে এ চলছে। নূতন সাধু তৈরী করেন যখনই অবতার হন। পূর্বদল গ্লানিতে পড়ে যায়। আর নূতন দল সৃষ্টি করেন। এইরূপে তাঁর কাজ চলছে।

২

দুর্গাপূজা আগতপ্রায়। মায়ের আগমনের জন্য ভক্তগণ আনন্দমুখর। ভক্তসভায় প্রায়ই এই আনন্দোৎসবের কথা হয়। আজও এই প্রসঙ্গ

হইতেছে। সমগ্র বাংলা, বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরী, মায়ের শুভাগমনের আয়োজনে ব্যস্ত।

একজন ভক্ত — যারা সরকারী বা সওদাগরী আফিসে কর্ম করে তাদের আর কি আনন্দ? তিন দিন মাত্র ছুটি। এতে জিরানোই হয় না। আনন্দ করবে আর কি করে মায়ের আগমনে?

শ্রীম — হাঁ, অন্ততঃ দশ দিন আগে ছুটি দেওয়া উচিত। ও কি, তিনদিন ছুটি! ফস্ করে চলে যায়। স্কুল কলেজে ছুটি দেয় আগে থেকে। আর হাই কোর্টে। কেন এই ছুটি? আনন্দ করবে বলে তো। বৈষ্ণবদের আছে 'ভাবোল্লাস'। মা আসবেন, তাতে উল্লাস করা উচিত আগে থেকেই।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — material civilisation-এ (জড় সভ্যতায়) কি হয়েছে, একবার গঙ্গার ধারে গেলে তা দেখা যায়। একটু বসবার জায়গা নাই। কোথায় গঙ্গাতীরে একটু স্থির হয়ে বসে লোক ঈশ্বরের নাম করবে, তাঁর চিন্তা করবে, না যত গুদাম, জেটি, জাহাজ — এইসব। City-architect-এর (নগর-নির্মাতার) scheme (পরিকল্পনা) দেখ! তাঁদেরই বা দোষ কি? গভর্নমেন্ট যেমন পলিসি করেন তাঁরাও তাই করেন। কর্পোরেশনও তাই। তবে আজকাল একটু অন্যরকম হচ্ছে।

পরের দিন, বুধবার। রাত্রি আটটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন দোরগোড়ায় চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। ভক্তগণও বসিয়া আছেন বেঞ্চে, শ্রীম-র সম্মুখে ও বামপাশে — বড় জিতেন, জগবন্ধু, বিনয়, ডাক্তার বক্সী প্রভৃতি। ভক্তগণ নানা রকমের কথা কহিতেছেন। এইসব কথা শ্রীম-র কর্ণে প্রবেশ করিতেছে কিনা বুঝা যাইতেছে না। তিনি মনে মনে কিছু ভাবিতেছেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — আপনি মধু-চতুর্দশী ব্রত করুন (হাস্য)। এ করলে মিষ্টি কথা বলা যায়।

ভক্তটি স্কুলের একটি যুবক কর্মচারী গোকুলকে বেশ অনেকগুলি কড়া কথা বলিয়াছেন। গোকুলও খুব দুঃখিত হইয়া শ্রীমকে উহা নিবেদন করিয়াছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — একটা reservoir (চৌবাচ্চা) আছ। তাতে তিনটে পাইপ রয়েছে। তাদের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃও একটা পাইপ। কিন্তু তা দিয়ে বের হচ্ছে সেই একই জিনিস, জল। সেই জল তৃষ্ণা নিবারণ করে অপর দু'টো পাইপের জলের মত। তেমনি ভক্ত তিন রকমের —সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। সকলের ভিতর দিয়েই সমানভাবে ঈশ্বরীয় ভাবামৃত বিগলিত হয়। শুকদেবের ভিতর দিয়ে যে ঈশ্বরীয় ভাবামৃত প্রকাশ হচ্ছে, জনক বা দুর্বাসার ভিতর দিয়েও সেই ভাবামৃতই প্রকাশিত হচ্ছে। কেবল রং ঢং আলাদা। এটা বাহ্য জিনিস। এতে কিছু এসে যায় না বিশেষ করে। এই তিন থাকেরই প্রয়োজন আছে এই সৃষ্টিরক্ষার জন্য। তোমার ভাল লাগে না বলে এর প্রয়োজন নাই, একথা বলা চলে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর — ঈশ্বর এই তিনজনকেই সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ, এই তিন কাজের জন্য। এই তিনজনের সম্মিলিত কাজে জগৎ চলছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরকে দেখতাম, তমোগুণী সাধুর কাছেও হাত জোড় করে থাকতেন। বলতেন, তমোমুখ নারায়ণ, নারায়ণ তো বটে।

বলেছিলেন, আগে আমার ধারণা ছিল সাধুমাত্রই সত্ত্বগুণী। একটি বৃদ্ধ সাধু সে ধারণা ভেঙ্গে দিলেন। তিনি বলেছিলেন, সাধু তিন গুণীই হয়। সেইদিন থেকে তমোগুণী সাধু দেখলে বেশী করে হাত জোড় করে তাকে প্রসন্ন করতেন।

একজন ভক্ত — ঈশ্বরলাভে তো সত্ত্বগুণের দরকার, রজো তমো ছেড়ে। রজো, তমোগুণী লোক কি করে ঈশ্বরদর্শন করবে?

শ্রীম — এ গুণগুলি তো বাইরের দিকে। ঈশ্বরদর্শনের সময় এগুলিকে অতিক্রম করতে হয়। সত্ত্বকেও ছেড়ে যেতে হয়। এই তিন গুণই বন্ধনের কারণ।

ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন। তিনজন ডাকাত এক বনে বাস করে। একটি পথিক বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। একে এসে ধরলে। একজন বললে, একে কেটে ফেল। আর একজন বললে, কেটো না, বেঁধে রাখ। তৃতীয়জন বললে, না একে কেটো না, বেঁধেও রেখো না। বনের বাইরে

পাঠিয়ে দাও। সে তখন নিজেই ঐ লোকটাকে বনের বাইরে নিয়ে গেল। আর বললো, ঐ দেখ লোকালয়। ওখানে চলে যাও। সে বললে তুমিও চল। উত্তরে সে বললে, না পুলিশে ধরবে। আমিও যে ডাকাত।

তাই তিন গুণের পার ভগবান। রজো-তমোগুণী ভক্তও বৈরাগ্য হলে একই ঈশ্বরকে পেতে চেষ্টা করে। তিনগুণী সাধুরই মনে তীব্র বৈরাগ্য হলেই গুণাতীত ঈশ্বরকে পায়।

শ্রীম-র ইচ্ছায় কথামৃত পাঠ হইতেছে — একজন সাধু খড়ম পায়ে চটরচটর করিয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সাধু চলিয়া গেলে ভবনাথ ঠাকুরকে বলিলেন, আপনার খুব সাধুভক্তি। ঠাকুর উত্তর করিলেন, তমোমুখ নারায়ণ। তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। নারায়ণ তো বটে!

৩

মহালয়া। মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। পূর্ব দরজায় পিছন দিয়া শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। তাঁহার সম্মুখে ডান ও বাম হাতে হাই বেঞ্চ পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান, আর উত্তর-দক্ষিণে মুখোমুখী। মধ্যস্থলে দুই গজ স্থান। ভক্তগণ বসিয়াছেন ঐ বেঞ্চে — ডাক্তার বক্সী, অমৃত, বলাই ও জগবন্ধু। একটু পরে আসিলেন বিনয় আর মোটা সুধীর। এখন সন্ধ্যা সাতটা। আজ বৃহস্পতিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ।

ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। সেখানকার সব কথা হইতেছে। অনেক লোক আজ মহালয়ার গঙ্গাস্নানে ও ভবতারিণীকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়াছিলেন।

একটি অল্পবয়স্ক ভক্ত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন কিছুকাল। তিনি ইতিপূর্বে ডাক্তার বক্সীর বাড়িতে কর্ম করিতেন। ডাক্তার তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। অমৃত আসিয়া মাঝে যোগদান করিলেন ঐ স্তুতিবাদে। শ্রীম অন্যমনস্কভাবে সায় দিয়া হুঁ হুঁ করিতেছেন। কিন্তু ভিতরে অন্য ভাবনা। অমৃতের সমর্থনে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর উচ্চতম রূপ ধারণ করিতেছে দেখিয়া শ্রীম প্রতিবাদ করিলেন। উহা যেন উচ্ছল তপ্ত দুধে

তৈলধারার কাজ করিল। ডাক্তারের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। শ্রীম-র কণ্ঠস্বর প্রশান্ত ও গম্ভীর।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — প্রশংসা করা আবার ভাল নয়। ঠাকুর বলতেন, আগে অষ্টম-ফষ্টমগুলো কাটুক। যেসব ভক্ত একটু ধ্যান জপ করতেন ঠাকুর তাদের প্রশংসা করতেন না। হাবাতে ভক্ত আছে কিনা। তারা এই সব কথা আবার রিপোর্ট করবে। তা হলে সর্বনাশ হবে। তাই প্রশংসায় লোকের সর্বনাশ হয়।

একজন ভক্ত — 'অষ্টম-ফষ্টম'গুলি কি?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, একটা পাঁঠার বাচ্চা রাসের ফুল খেতে চাইছিল। রাস হয় কার্তিক মাসে। তখন ফুল দিয়ে রাসচক্র খুব সাজায়। পাঁঠাদের মা তখন বললে, দাঁড়াও আগে অষ্টম-ফষ্টমগুলি কাটুক। রাসের আগে হয় দুর্গাপজা, আশ্বিন মাসে। তখন অষ্টমী ও নবমীতে খুব পাঁঠাবলি হয়। এই ফাঁড়াটা আগে পার হোক্। খেতে হয়, পরে খাবে। 'অষ্টম-ফষ্টম' মানে, অষ্টমী-নবমী আদি তিথি।

ডাক্তার ও অমৃত একেবারে নির্বাক। ভক্তরাও সকলে নীরব।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যে জিনিসে ভাল হয় সে জিনিসে খারাপও হয়। ব্যবহার জানা চাই। অপব্যবহারে উভয়ের খারাপ।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দক্ষিণেশ্বর কত বড় তীর্থস্থান। সেখানে ভগবান মানুষশরীর ধারণ করে ত্রিশ বৎসর অবতারলীলা করেছেন। ঈশ্বরীয় নানা রূপের দর্শন হয়েছে কত — কত বিহার, কত কথা, কত সম্ভোগ! প্রতি ধুলিকণা অতি পবিত্র। The whole atmosphere is surcharged with spirituality— (ওখানকার সমগ্র বাতাবরণ সত্যকার ধর্মে, জীবন্ত ধর্মে মণ্ডিত।) আজকাল জগতের মধ্যে এটি সকলের শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

ওদের (গদাধর ও বুদ্ধিরামের) যে দক্ষিণেশ্বর ভাল লেগেছে তা বহু সংস্কারের ফল। আমরা একদিন ওখানে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতুম।

ডাক্তার বক্সী নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নন। তিনি বিবাহিত। কিন্তু

সংসার ত্যাগ করিতে চান। মাঝে মাঝে সংসার ত্যাগের কথা শ্রীমকে বলিয়া থাকেন। ইনি ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। ভাল কর্ম। বদলী করিয়া দেওয়ায় কর্মটি ছাড়িয়া দেন। কারণ কলিকাতার বাইরে গেলে নিত্য শ্রীম-র কাছে আসিতে পারিবেন না। আর বেলুড় মঠের সাধুসঙ্গ ও দক্ষিণেশ্বরের তপোবন দর্শন হইবে না। তাই কর্মটি ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহার পক্ষে সামলান অসম্ভব হইয়া পড়িল। তাঁহার ব্যবসা যত বাড়িতেছে, ভিতরের বৈরাগ্যও তত বাড়িতেছে। অর্থে মন নাই। তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে সাধু ও ভক্তের হাসপাতাল। দরিদ্র রোগীদের সব ফ্রি — উপদেশ, ঔষধ ও পথ্য। নিরাশ্রয়দের সেবারও ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ব্যবসার প্রসার, সুনাম ও অর্থাগম যত বেশী হইতে লাগিল অন্তরে বৈরাগ্য তত তীব্র হইতে থাকিল।

একবার এই বৈরাগ্যের প্রেরণায় কাশীধামে তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিলেন না। কাশী গিরির বাগানে সাধুদের সঙ্গে কুটিরে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্রীমকে পত্র লিখেন তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে। এখন তাঁহার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ।

গদাধর ও বুদ্ধিরাম সম্প্রতি কর্ম ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ডাক্তারেরও ইচ্ছা সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরভজন করেন। শ্রীম তাই ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাঁর কৃপা কার উপর নাই? সর্বদা আমাদের উপর তাঁর কৃপা। এইগুলি দেখেও লোক দেখছে না। মানুষ স্বভাবতঃই ভাবে — আমার চেয়ে বুঝি আর কারো খারাপ অবস্থা নেই। সকলেই এই ভাবে। কিন্তু চেয়ে দেখে না, তিনি কত দিয়েছেন। সর্বদা তাঁর কৃপা দেখা যাচ্ছে। তাঁর কথা, তাঁর ভক্ত, এই সব সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে। তবুও ঐ রকম (অসন্তুষ্ট)। যে উপকার স্বীকার করে না, ঠাকুর বলতেন, সেই অকৃতজ্ঞের মুখ দেখতে নেই। — 'Friend, ingratitude thy name! Ingratitude!' 'বন্ধো, অকৃতজ্ঞতা তব নাম — মূর্তিমান অকৃতজ্ঞতা তুমি।'

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাঁর সব চাইতে বড় blessings (আশীর্বাদ) এই যে, তিনি নিজেকে incarnate (নররূপে অবতীর্ণ) করেন। মানুষ কি চায় আর? এইমাত্র ঠাকুর এলেন অবতার হয়ে। চলে গেলেও তাঁর সবই পূর্ণভাবে রয়েছে। শরীরই মাত্র গেছে।

ভক্তদের এখন ভাবনা কি? কত fortunate (সৌভাগ্যবান) এখন জন্ম হওয়ায়! হলোই বা গৃহস্থাশ্রমে থাকা। তাতেই বা কি তাঁর উপর দৃষ্টি থাকলে? হাতী মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলেও লাখ টাকা।

তাঁকে যে চিন্তা করেছে বা করছে একটুকুনও, তার আর ভাবনা কি? সে যেখানেই থাকুক — সংসারেই থাকুক আর যাই করুক।

বিবেকানন্দ তাই বলতেন, মানুষ খালি দুঃখকষ্টগুলি দেখছে। কিন্তু তিনি যে কত ভাল, তা দেখছে না।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — একটা গল্প আছে। দুই বন্ধু বেড়াতে গেছে। বন দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক এসে দেখা দিল। একজন দৌড়ে চলে গেল। আর একজন মড়ার মত পড়ে রইলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ভাল্লুক মড়া ছোঁয় না। সে তার নাক মুখ সব শুঁকে চলে গেল। তখন ঐ বন্ধু ফিরে এসে বললে, হাঁ ভাই ভাল্লুক তোমার কানে কানে কি সব কথা বললো? বন্ধু উত্তর করলো — ভাল্লুক বললো, যে বন্ধু পূর্ব-উপকার ভুলে যায় আর বিপদের সময় ফেলে চলে যায়, তার মুখ দেখতে নেই।

৪

শ্রীম একটু দীর্ঘ সময় কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের বাড়ির লোকগুলি তাঁকে চিনতে পারে নাই। কেউ ভাবছে কাকা, কেউ মামা। এইরূপ মনে করতো। কেবল হৃদয়ের মা চিনেছিলেন, ঠাকুর বলতেন।

বাড়ির লোক বলতো, যা কিছু ছিল সব নিজের মাগকে দিয়ে গেল। আমাদের কি করলেন তিনি? যেন তিনি এখানে টাকা রোজগার করতে বসেছেন!

মাকে ঠাকুর নিজের অলংকারগুলি দিছলেন। আর পাঁচ শ' টাকাও দিছলেন। বলেছিলেন, এসব যেন খরচ করো না, রেখো।

ভাতের চিন্তা থাকলে কিছু হয় না কিনা। তা তিনি জানতেন।

কাছে থাকলেও চিনতে পারা যায় না। কেবল তিনি চেনালে চেনা যায়। হৃদয় মুখুয্যে ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমায় আবার নেও মামা'। ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কেন? তুই না বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক্।' আবার কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলেন, 'আমি কি তখন তোমায় জানতুম।' অমনি ঠাকুরের চোখে জল! তাঁকে চিনতে পারা যায় না, তিনি না চেনালে। কাছে যখন ছিলেন হৃদয় তখন চিনলেন না। Separation (ছাড়াছাড়ি) হলে চিনলেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় লীলামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একবার একটি ভক্ত (শ্রীম) দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনতে গেলেন কেশববাবুর বাড়িতে। ঐ ভক্তটি ঠাকুরের কাছে next meeting-এ (পরবর্তী মিলনে) খুব উৎসাহের সহিত ঐ কথা বললেন। ঠাকুরও প্রথম খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তও আনন্দে ও উৎসাহে খুব বলে যাচ্ছেন। ওমা, যখন সব বলা শেষ হল তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন, 'তুমি কোথাও যাবে না। খালি এইখানে আসবে।' একেবারে command (আদেশ)! এ তাঁর রীতি ছিল না — command (আদেশ) করা। কিন্তু এখানে একেবারে command (আদেশ)!

ভক্তরা (শ্রীম) তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানতো না। তিনি বলেছিলেন মা ঠাক্‌রুণকে এই কথা। বলেছিলেন, 'এ আমা-বৈ কিছু জানে না।' মা পরে প্রায়ই বলতেন এই কথা।

শ্রীম আবার নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখনও যাদের সংস্কার আছে কেবল তারাই ঠাকুরকে চিনতে পারে। অপরে মনে করে, একজন সাধু। কি করবে লোক! তাঁর মহামায়ায় ঢেকে রাখেন, জানতে দেন না।

সকলে চিনতে পারলে যে এদিক থাকে না। সব মুক্ত হয়ে গেলে জগৎলীলা চলে কি করে। মা চান, খেলা চলুক। কাউকে কাউকে খেলা

থেকে টেনে বের করে নিয়ে যান।

কিন্তু পার্ষদরা, থাক্ আলাদা। তারা প্রায়ই নিত্যসিদ্ধ। যুগে যুগে সঙ্গে আসেন। তাঁদের দিয়ে কাজ করবেন কি না, তাই তাঁদের চিনিয়ে দেন। আবার চাবি বন্ধ করে কাজ করান। কাজ শেষ হলে খুলে দেন চাবি। তখন নিজধামে চলে যান ভক্তরা ঠাকুরের কাছে।

ভয় কি? যে যেখানে আছে থাকুক। তিনি কোলে তুলে নেবেন। ভক্তরা সংসারে থাকলেও অপরের মত মোহগ্রস্থ হন না। তবে একটু ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় বৈ কি! তা আর কি করা! তাঁর কাজের জন্য এই ঝঞ্ঝাট। লোক শিখবে তাঁদের দেখে। তাইতো ভক্তদের সংসারে রেখে দেন।

আবার কতকগুলিকে বের করে নিয়ে যান। তাঁদের দিয়ে একটা আলাদা থাক্ করেন। বিবেকানন্দকে দিয়ে সন্ন্যাস আশ্রমের সৃষ্টি করালেন।

সকলকেই তাঁর কাজ করতে হয়। যার যেখানে দরকার তাকে সেখানেই রাখেন। গৃহও তাঁর, সন্ন্যাসও তাঁর।

কলিকাতা, পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতি ভবন।
৭ শঙ্কর ঘোষ লেন।
১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। ১লা আশ্বিন ১৩৩২ সাল।
বৃহস্পতিবার বার। মহালয়া।

ষোড়শ অধ্যায়

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ, পুরীধাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের বসিবার ঘর। স্কুল বন্ধ হইয়াছে, দুর্গাপূজার ছুটি। শ্রীম বেঞ্চে বসিয়া আছেন উত্তর-পূর্ব দরজার পাশে, পশ্চিমাস্য। ভক্তরা বসিয়া আছেন ডবল বেঞ্চে শ্রীম-র বাম হাতে, উত্তরাস্য। এখন সকাল আটটা। রেক্টার মুকুন্দবিহারী সাহা রামপুরহাট হইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় ছাত্র শচীনন্দন দত্ত। তাঁহারা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া জগবন্ধু, সুখেন্দু প্রভৃতি ভক্তদের পাশে বেঞ্চে বসিলেন। শ্রীম তাঁহাদের কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন। এখন সর্বত্রই দুর্গাপূজার ছুটি, সর্বত্রই আনন্দ মায়ের আগমন প্রতীক্ষায়। এইসব কথা হইতেছে। শ্রীম বলিলেন, স্কুলের ছোকরা বেয়ারা সহদেব বলছিল, ম্যায় ছুট্টিমে হরদ্বার চলা যাউঙ্গা। (সহাস্যে) সকলেই বেড়াতে চলে যাক। আমি এই তেল (অয়েল গলথেরিয়া) মালিশ করবো, আর এইসব বেঞ্চ ইত্যাদি পাহারা দেব। শ্রীম-র বাতের বেদনা বাম হাতে।

জগবন্ধু (শ্রীম-র প্রতি) — প্রফেসার ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেছেন।

শ্রীম (আহ্লাদে) — কি বলেছেন?

জগবন্ধু — ওয়েস্টকে সম্বোধন করে উনি বললেন, তোমাদের ধর্মের পরিণতি তো বোঝা যাচ্ছে Great War (প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ)। বললেন, আমরা যে ধর্মে বিশ্বাস করি — তা কেন ছাড়বো? আমাদের বিশ্বাস — যুগে যুগে ভগবান অবতার হয়ে আসেন। বেদের ঋষিদের থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধীজী পর্যন্ত আজও এ বিশ্বাস সত্য হয়ে আসছে। Saintliness of character, beauty and calm (মহাজনোচিত দিব্য চরিত্র, সৌন্দর্য ও প্রশান্ত গম্ভীর ভাব) কোনও

মহাপুরুষ থেকে এঁদের কম নয়।

শ্রীম (জিহ্বাদ্বারা শব্দ করিয়া) — হাঁ। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাইরে বাইরে নিয়ে আছেন এঁরা। ঠাকুর এসবের উপরেও আর একটা কথা বলেছিলেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় — তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। আবার বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এরও উপরে বলেছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি। এখনও দেখছি। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, তোকেও দেখাতে পারি। আর দেখিয়েও ছিলেন।

পণ্ডিতদের appreciation (উপলব্ধি) ঐ মুখে মুখে। এটাও মন্দের ভাল। তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা কোথায়? তা না হলে যেমন আঠার মাসে বছর — হচ্ছে, হবে করে।

লোকগুলি মনে করে, এটাও বুঝি একটা myth – কাল্পনিক কথা, পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু ঠাকুর যে evidence (সাক্ষ্য) দিচ্ছেন — আমি তাঁকে দেখেছি আবার কথা কয়েছি! একঘর লোক বসা। প্রায় সবই ইংরেজী পড়ার ফলে agnostic (সংশয়বাদী)। তাদের সামনে বলছেন, মাইরি বলছি, মা এসেছেন। আবার মায়ের সঙ্গে কথা কইছেন। বলছেন, বাঃ, লালপাড় শাড়ি পরে এসেছো মা! এক দিকের কথা, অর্থাৎ ঠাকুরের কথা সকলে শুনছে। জগদম্বার কথা কেবল ঠাকুর শুনছেন।

ডক্টর মহেন্দ্র সরকার বিজ্ঞানের প্রধান পূজারী। ঠাকুরের চিকিৎসা করতে এসেছেন। ক্যানসার হয়েছিল কিনা। ডাক্তারের সামনেই কথা কইছেন। এরই ভিতর মন সট্ করে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে গেল। নিঃশ্বাস নাই। শরীর কাঠের মত শক্ত। কিন্তু মুখ প্রস্ফুটিত কমলের মত উজ্জ্বল। ডাক্তার দেখে নির্বাক। কিছুক্ষণ পর সমাধি থেকে নেমে এসে ডাক্তারকে উপহাস করে বলছেন, কি ডাক্তার তোমার সায়েন্সে একথা নাই হে, না?

এই অবিশ্বাসের যুগে যতদূর সম্ভব নিকটে এনে সকলকে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। আবার অন্তরঙ্গদের দর্শন করিয়েছেন। অত কাণ্ড করে গেলেন। তবুও লোকের চৈতন্য হয় কই? দর্শনের চেষ্টা কোথায়? মুখে মুখে বলা মাত্র।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (শচীর দিকে মুখ করিয়া) — King Henry VIII-এ

(শেক্সপীয়রের লিখিত অষ্টম হেনরী নামক মহাকাব্যে) আছে — It is commodity, my Lord! It's commodity! (আরাম মহারাজ, আরাম চাই)। কঠোপনিষদেও আছে এ কথা — 'প্রেয়' আর 'শ্রেয়'। 'প্রেয়' মানে বিষয়ানন্দ উপভোগ। আর 'শ্রেয়' মানে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ। 'প্রেয়'ই চায় লোক। সকলেই সুবিধা খোঁজে — দেহসুখ, আরাম — 'প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাৎ বৃণীতে'(কঠো ১:২:২)।

'শ্রেয়ে'র খরিদ্দার খুব অল্প লোক — যেমন নচিকেতা। যেমন মঠের সাধুরা। সব ছেড়ে ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল। গুরু যা বলছেন তাই করছে — যেমন ব্রহ্মজ্ঞানী মা। মূর্তিপূজা মানে না। কিন্তু ছেলের মরণাপন্ন অসুখ। পাড়ার মেয়েরা বলছে, কালীঘাটে মায়ের পূজো দাও। সুভদ্রার ছেলেরও ঠিক এই রকম হয়েছিল। কিন্তু কালীঘাটে মায়ের পুজো দিতেই ভাল হয়ে গেল।

ছেলের জন্য সব করা যায়। এই মঠের সাধুরাও এইরূপ। যে যা বলছে তাই করছে, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল।

লোক ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হতে চায় না। বাইরে বাইরে শুধু appreciation (উপলব্ধি)। এতে কিছু হয় না। এটা intellect-এর (বুদ্ধির) ব্যাপার। মন্দের ভাল। কিন্তু যে অবতারের বাক্যে বিশ্বাস করে ঈশ্বর-দর্শনের জন্য চেষ্টা করছে, যে ব্যাকুল, সে-ই মানুষ। এই জন্মেই ঈশ্বরকে চাই — এমনই আকাঙ্ক্ষা।

যারা দেহের সুখ খোঁজে কেবল, তারা পারে না। তাদের মন 'প্রেয়ে'তে। 'শ্রেয়ে'র সংবাদ শুনলেও হাতে আনতে পারছে না — সাধন নেই। চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু বিপরীত কর্মফল। তাই চেষ্টা আসে না। অবতারকে দেখেও মনে কর, কোন পরিবর্তন নেই এই সব লোকের। তা তোমার কথায় কি হবে? যে শুনবে সেই মনকে বন্ধক দিয়েছে — mortgaged, সংসারে।

তাই ঠাকুর প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমাদের মুগ্ধ করো না। আর তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

একটি ভক্ত (স্বগত) — কি বিচিত্র সব শিক্ষাপ্রণালী সিদ্ধ আচার্যদের! এই অমূল্য প্রাণস্পর্শী উপদেশের লক্ষ্য উপস্থিত ভক্তগণ, কিন্তু উপলক্ষ্য

বক্তৃতা!

রাত্রি আটটা। শ্রীম চারতলার শয়নকক্ষের পাশে পার্টিশানের ঘরে বসিয়া আছেন দোরগোড়ায় বেঞ্চে, পশ্চিমাস্য। ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে জোড়া বেঞ্চে বসা পূর্বাস্য — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, অমৃত, বিনয়, ডাক্তার, বড় অমূল্য, জগবন্ধু, শান্তি, বলাই প্রভৃতি। বড় অমূল্য ৺জগন্নাথপুরীতে যাইবেন। তাই সবিস্তারে ৺পুরী-মাহাত্ম্য কীর্তন হইতেছে।

শ্রীম (বড় অমূল্যের প্রতি) — টাকাকড়ির উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। খালি ভাবে থাকলে হবে না। টাকাকড়ি থাকলে নিশ্চিন্ত আনন্দে তাঁর দর্শন ভজন সব হয়। আহারের ব্যবস্থা না থাকলে মন চঞ্চল হবে। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, ভক্তদের যদি অর্থ থাকে, তবে তারা অর্ধ জীবন্মুক্ত। আমাকে বলেছিলেন, বিদেশে (পুরীতে) যাচ্ছ, অনেক টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাতে মন শান্ত থাকে। ঠাকুরের শরীর থাকতে আমাকে পাঁচ-ছ'বার পুরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

(সহাস্যে) একবার ঠাকুর আমায় বলে দিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে হয়। বৎসরে দু'বার সর্বসাধারণ আলিঙ্গন করতে পারে — একবার স্নানযাত্রায়, আর একবার রথের পূর্বে। আমি অসময়ে গেছি। অথচ ঠাকুর বলে দিয়েছেন আলিঙ্গন করতে। তা করতেই হবে! ভাবছি কি করে হয়। তখন তিনি এক বুদ্ধি দিলেন। দুই পকেটে করে টাকা আধুলী সিকি অনেক নিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেই অসীম সাহসে যো সো করে আলিঙ্গন করে ফেললাম অত উঁচু রত্নবেদীতে আরোহণ করে। অমনি 'কন করোচি, কন করোচি' বলে সব পাণ্ডারা চীৎকার করতে লাগলো। যেমন তীরবেগে বেদীতে উঠে আলিঙ্গন করলাম, সেই তীরবেগে নেমে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। আর দু'হাত ভরে টাকাকড়ি ছুঁড়ে চার দিকে ফেলতে লাগলাম। অন্ধকারে পাণ্ডারা ঐ সব টাকাকড়ি কুড়োতে লাগলো। আর আমি ঐ ফাঁকে বের হয়ে গেলাম (হাস্য)। ঐ একটি অতি দুঃসাহসের কাজ হয়েছিল।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যাত্রার আগে অন্ততঃ দুই তিন দিন আগে থেকে সংযম অবলম্বন করা উচিত। ব্রহ্মচর্য-ব্রত নিয়ে তীর্থে যেতে হয়।

আর আহার খুব কমিয়ে দিতে হয়। হবিষ্যি করা উচিত। রাত্রে কেবল দুধ আর সন্দেশ (ভক্তদের হাস্য) খেতে হয়। অর্থাৎ মনে এই উদ্দীপন করা — কি, আমি ভগবানদর্শন করতে যাচ্ছি।

পূর্বের লোক খুব শাস্ত্রবিশ্বাসী ছিল। তারা তাদের গুরুতে ঈশ্বর দর্শন করতো।

লাল চশমা পরে যাওয়া। 'লাল চশমা' মানে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, অবতারের বাক্যে বিশ্বাস করে যাওয়া। তা হলে তীর্থের রূপ প্রীতিকর হয়। তাঁর ভাব নিয়ে যা-ই দেখ, যাকেই দেখ — সব ভাল লাগবে। তা না হলে যেমন টুরিস্টরা যায় তেমনি হবে। খালি বাজে গল্প করবে। বলবে, আমি জগন্নাথধাম দেখে এলাম, মন্দির বেশী পুরানো নয়, এতে বৌদ্ধযুগের ছাপ আছে — এই সব বাহ্য কথা।

শ্রীম (বড় অমূল্যের প্রতি) — কিন্তু, ওদিকে লক্ষ্য থাকে — purse-টায় (টাকার থলিতে)। পত্রিকাওয়ালারা বেশ বলে — He was relieved of his purse (তার টাকার থলিটির ভার সরিয়ে নিলে)। অর্থাৎ চুরি হয়ে গেল (হাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর আমাকে আরও বলেছিলেন, রাধাকান্তের মঠ দেখবে। ওখানেই 'গম্ভীরা' — একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। ওতে চৈতন্যদেব আঠার বছর বাস করেছিলেন। আর বলেছিলেন, টোটা গোপীনাথ দেখবে। আর সমুদ্র ও নরেন্দ্র-সরোবর। (বড় অমূল্যের প্রতি) আপনিও এসব দেখবেন। আর দেখবেন শশীনিকেতন ও ক্ষেত্রবাসীর মঠ। শশী-নিকেতনে রাখালমহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের অনেক ভক্ত বহুবার বাস করেছেন। ক্ষেত্রবাসীর মঠে মা ছিলেন।

আর ঠাকুর বলেছিলেন, রাস্তায় সাক্ষীগোপাল আছেন। তাঁকে দর্শন করবে।

আপনি ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন করবেন। আর ওখানকার আমাদের মঠ ও ঠাকুরঘর দর্শন করবেন। এসব নূতন তীর্থ ঠাকুরের নামে হয়েছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যারা তীর্থে যাবে তাদের সব সুবিধা করে দিতে হয়। এতে কল্যাণ হয়। এ করে দর্শনের পুণ্যের ভাগ এরাও পেতে পারে। তীর্থযাত্রীদের নমস্কার করতে হয়। ভাগবতে আছে, নমস্কার মানেই

পূজা। ইংরেজীতে বলে worship (অর্চনা), আবার ফিরে এলেও নমস্কার করতে হয়।

আমি আগে এই সব করতাম। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতাম। দেখতাম ফার্স্ট ট্রেন কখন আসবে পুরী থেকে। একেবারে টাট্‌কা কিনা — তীর্থের চিহ্ন সব দেখতে পেতাম সকল যাত্রীদের শরীরে, মুখে ও মনে। মন সকলের অন্তর্মুখ। চোখে মুখে আনন্দ দেখা যেতো। চেয়ে আবার মহাপ্রসাদ নিতাম — একেবারে টাট্‌কা মহাপ্রসাদ।

'সা চাতুরী চাতুরী'। যে চাতুরীতে ঈশ্বরলাভ হয় সে চাতুরীই চাতুরী। যে চালাক হয় সে এইখানে বসেই সব করে নেয়।

শ্রীম (অমূল্যের প্রতি) — চৈতন্যদেবের স্মৃতিপূত সবগুলি স্থানই দর্শন করবেন — হরিদাস মঠ, সিদ্ধ বকুল আদি। হরিদাসকে দর্শন দিতে নিত্য বকুলে যেতেন তিনি।

সারাদিন সাধু, তীর্থ — এ সব দর্শন করা। আর সময় করে একটু পাঠ করা, যেমন চৈতন্য-চরিতামৃত — অন্তলীলা। তারপর তীর্থ থেকে ফিরে এসে বাড়িতে বসে সেই সব ধ্যান করা। তা হলে নিত্য তীর্থে বাস হয়।

একজন ভক্ত — গত শুক্রবার ১৬ই সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে বেলজিয়ামের রাজা ও রাণী গিয়েছিলেন। বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন ও লেডি লিটন তাঁদের নিয়ে এসেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ, শুনেছি। এ সবই ঐ বাজীকরের খেলা। তিনি এসেছিলেন কত আবরণে নিজেকে লুকিয়ে। কিন্তু সত্যকে গোপন করা চলে না। সূর্যকে আর কতক্ষণ মেঘে ঢেকে রাখতে পারে!

এ সবই ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করছে। দেখ না, কি করে সত্য প্রকাশ হচ্ছে। কত আবরণ — দরিদ্র, প্রায়-নিরক্ষর, ছয় টাকা বেতনের পূজারী। আবার কেউ কেউ বলতো পাগল। কেউ বলতো মৃগী রোগী। কত কি আবরণ! কিন্তু অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের নিকট তিনি ধরা দিয়েছিলেন। তাঁরা জেনেছিলেন তাঁরই কৃপায় — যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে আবির্ভূত। সন্দিগ্ধ নরেন্দ্রকে মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানিং রামকৃষ্ণ।' নরেন্দ্র পাশে বসে মনে মনে ভাবছিলেন, যদি এই সময় বলতে পারেন, 'আমি

অবতার' তবে বিশ্বাস করবো। যেই ভাবা আর সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঐ কথা, 'আমি অবতার'। আর একজন ভক্তকেও (শ্রীমকে) বলেছিলেন, 'ক্রাইস্ট গৌরাঙ্গ আর আমি, এক।' আর একবার ভক্তদের বলেছিলেন, 'একদিন দেখলাম সচ্চিদানন্দ এর ভিতর (ঠাকুরের শরীর) থেকে বের হয়ে বললেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই।'

অপরে বুঝবে কি করে তিনি না বুঝালে?

স্বামীজীকে পাঠালেন ওদেশে। তাঁর কাছ থেকে শুনে এদেশের ভক্তরা তাঁকে চিনেছিলেন। ঐ ভক্তদের কাছে শুনেছেন লর্ড লিটন। সম্ভবত তাঁরই কাছে শুনে বেলজিয়ামের রাজা ও রাণী এসেছেন। মিস্ মেকলাউড স্বামীজীর অন্তরঙ্গ ভক্ত। এঁদের পরিবার আর লর্ড লিটনদের পরিবার বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। এইভাবে ঠাকুরের কথা জানাজানি হয়েছে। আরও কত কাণ্ড হবে এর পর। বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর — জগতের ঘরে ঘরে পরিচিত হবে ঠাকুরের নামের সঙ্গে সঙ্গে।

কলিকাতা, পুরাতন শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ভবন।
৭ শঙ্কর ঘোষ লেন।
২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ৬ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল, মঙ্গলবার।
দেবীপক্ষ, পঞ্চমী।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভক্ত দুই শ্রেণী — মাছি ও মৌমাছি

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। এখন বেলা বারটা। আজ বিজয়ার পরদিন। শ্রীম ঠাকুরবাড়ি হইতে মধ্যাহ্ন-আহার করিয়া এইমাত্র ফিরিয়াছেন। বাড়ির সকলে আজকাল ঠাকুবাড়িতে থাকেন। মেয়েরা কেহ কেহ পুরী দর্শন করিতে গিয়াছেন।

শ্রীম দ্বিতলের সিঁড়ির গোড়ায় বেঞ্চে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। একদমে চারিতলায় উঠিতে কষ্ট হয় — বৃদ্ধ শরীর, তাই। সর্বদাই দ্বিতলে বসিয়া বিশ্রামান্তে চারিতলায় আরোহণ করেন।

আজকাল দুর্গাপূজার ছুটি, মর্টন স্কুল বন্ধ। একটি ভক্ত শিক্ষক ও ছোট জিতেন শ্রীমকে বিজয়ার প্রণাম করিলেন। শ্রীম-র আদেশে তাঁহারা তাঁহার পাশে একই বেঞ্চে বসিয়াছেন। ভক্তরা তাঁহাদের বাসস্থান ৭ নং শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে বাহির হইয়া বোর্ডিংএ আহার করিয়া ঐখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা দুর্গাপূজার কয়দিন — বিল্ব-ষষ্ঠী হইতে বিজয়া-দশমী পর্যন্ত — ২৩শে হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর, বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা দর্শন করিয়া আজ ফিরিয়াছেন।

শ্রীম-র শরীর বাতের বেদনায় বেশ অসুস্থ থাকায় দুর্গাপূজায় তিনি এবার মঠে যাইতে পারেন নাই। ভক্তরা তাই শ্রীমকে পূজার কয়দিনের বিবরণ দিতেছেন।

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — দিন দিনই লোক বাড়ছে। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী বাড়ছে। অনেক ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও এখন মঠে আসছেন। একটি বিলেতি মেম এসেছিলেন শাড়িপরা, ইত্যাদি।

শ্রীম — হ্যাঁ, শুনেছি proceedings (বিবরণ) — এরপর এই। তারপর এই। এই কয়দিন মঠে বাস করায় পঞ্চাশ বছরের তপস্যা হয়ে গেল।

কিন্তু এর উপরও আর একটি আছে। সংস্কারবান লোক হলে ফস্ করে হয়ে যায়। সাধুদের সঙ্গে বাস করলে তাঁদের মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা হয়। নইলে, বছর বছর ওখানে যাওয়া যাচ্ছে, আর কাটিয়ে আসা গেল পূজো — এই হয়।

কিন্তু সংস্কারবান হলে এতেই হয়ে যায় কাজ। যেমন বুদ্ধ। দেখ, একটা মড়া দেখেই চৈতন্য! অন্য লোক কত মড়া দেখছে। কিন্তু মনে ভাবছে, যারা মরবে তারাই মরছে। আমরা বেঁচে থাকবো চিরকাল। সংস্কারবানদের আলাদা কথা।

শ্রীম চারিতলায় আরোহণ করিতেছেন। আর ছোট জিতেন শ্রীম-র অনুমতি লইয়া চলিলেন বাড়িতে, রাণাঘাট।

সিঁড়ির ঘর। এখনও সন্ধ্যার এক ঘন্টা বাকী। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছেন, দোরগোড়ায় দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বেঞ্চে বসা জগবন্ধু, ডক্তার, বিনয় প্রভৃতি। হরি পর্বতের প্রবেশ। তিনি মঠের প্রাচীন ভক্ত। বিজয়ার প্রণামাদির পর কথাবার্তা হইতেছে।

মর্টন স্কুলের ভক্তরা প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবে মঠে বাস করিয়া সেবাকার্য করেন। এবারও তাঁহারা ঐরূপ করিয়া ফিরিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীম হরি পর্বতের সহিত আলোচনা করিতেছেন। লক্ষ্য হরি পর্বত, কিন্তু উদ্দেশ্য কুমার ব্রহ্মচারীগণ।

শ্রীম (হরি পর্বতের প্রতি) — এর উপরও আবার আর একটি আছে। তা না হয় তো — বছর বছর যাচ্ছি। গিয়ে লোক খাওয়ান দাওয়ান খাটাখাটি হচ্ছে। যেমন যাই তেমনি যাচ্ছি। একটা বাৎসরিক পর্ব যেন।

কিন্তু আর একটি আছে। সংস্কারবান যারা তাদের এতেই চৈতন্য হয়ে যায়। বুদ্ধদেব একটা মড়া দেখলেন, আর অমনি তাঁর চৈতন্য হয়ে গেল — সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য।

সন্ধ্যার আলো লইয়া আসিল ভৃত্য জীব। শ্রীম যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, এবার নামাজ পড়া যাক্। আর নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ফিরিয়া আসিলেন দেড় ঘন্টা পর।

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন চেয়ারে, দোরগোড়ায় দক্ষিণাস্য। কথাবার্তা হইতেছে।

একটি ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — কৃপা না হলে কিছুই হয় না।

শ্রীম — কৃপালাভের জন্য চেষ্টা করতে হয়। কৃপার তো ছড়াছড়ি। হাওয়া, জল, অগ্নি, খাদ্য, পিতামাতার স্নেহ — এ সবই তো তাঁর কৃপার পরিচয়। তাঁর যে অনুগ্রহ ও করুণা রয়েছে আমাদের উপর — এ যে বুঝতে পারে না তাকে আরও উত্তম জিনিস দিলেও সে ধরতে পারবে না।

ঠাকুর বলেছিলেন, সাধুসঙ্গ কর। এই একটিতেই ধর্মজীবনের যা যা প্রয়োজন সব এসে যাবে। তা করে কই লোক? খালি বলে কৃপা, কৃপা।

যারা অলস তারাই বসে বসে খালি 'কৃপা কৃপা' করে। এ সব তমোগুণে হয়। তমোগুণীর নিকট ঈশ্বরেরই অস্তিত্ববোধ নাই। তা আর কৃপা! শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম — কৃপা আর পুরুষকার বস্তু একটি। পুরুষকার দিয়েই কৃপা বোঝা যায়। ঈশ্বরলাভের জন্য যে সব কথা বলেছেন ঠাকুর সেগুলি পালন করতে হয়। বলেছেন তো নিত্য দু' বেলা আসনে বসবে। ধ্যান জপ করবে, আর প্রার্থনা। আর সাধুসঙ্গ। কখনও নির্জন বাস। এ সব করতে চেষ্টা করলে যখন বাধা আসবে সেগুলির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় পরিণত করার চেষ্টা করতে হয়। যে 'আমি' শ্বশুরবাড়ি যেতে পারে সে 'আমি' ধ্যান ভজন, সাধুসঙ্গও করতে পারে। অবতার হয়ে আসা কত বড় কৃপা!

২

হরি পর্বত (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, তাঁকে প্রাণের প্রাণ বলা হয়, সে কেমন?

শ্রীম — চৈতন্যদেবের হয়েছিল ঐ অবস্থা। তিনি বুঝেছিলেন, ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ। প্রতাপ রুদ্র উড়িষ্যার রাজা। তিনি চৈতন্যদেবকে দর্শনের প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু তিনি দর্শন দিলেন না।

ভক্তরা অনেকে উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন — সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতি। ওঁরা চৈতন্যদেবকে অনুরোধ করায় উনি উত্তর করলেন, তোমরাও যদি ঐ একই কথা বল তা হলে আমি আলালনাথে চলে যাব। আমার এখানে থাকার দরকার নেই। আমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি এই জন্য

— রাজাকে দর্শন দিতে? রাজা বিষয়ীর চূড়ামণি।

শ্রীম (হরি পর্বতের প্রতি) — ঠাকুরেরও হয়েছিল ঐ অবস্থা। মথুরবাবুর বাড়িতে ছিলেন দিন কতক। হঠাৎ একদিন রাত্রি দু'টো-তিনটের সময় বললেন, আমি যাব। মথুরবাবু উত্তর করলেন, বাবা, অত রেতে গাড়ী কোথায় পাওয়া যাবে এখন? ভোর হলে পাঠাব। ঠাকুর বললেন, না হোক গাড়ী, আমি হেঁটে যাব। অগত্যা কোচম্যানকে অনেক বলে ক'য়ে গাড়ী জুতে সেই রাতেই পাঠালেন, দক্ষিণেশ্বর। গিয়ে বললেন, মা আমি এসেছি গো। — এই হলো আর একটি দৃষ্টান্ত ঐ অবস্থার!

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, আর একটি ঘটনা আছে চৈতন্যদেবের। তিনি সন্ন্যাসের কথা মাকে বললেন। মা অনুমতি দেন না। তখন বললেন, তা হলে মা আমার শরীর আর থাকবে না, এই কামিনীকাঞ্চনের ভিতর। মা তখন অনুমতি দিয়ে বললেন, আচ্ছা বাবা, সন্ন্যাস নেও তাতে যদি শরীর থাকে। তবে আমায় সংবাদ দিও। যেখানে থাক কুশলে থাক।

যেমন মাছ ড্যাঙ্গায় তুললে বাঁচে না, তেমনি অবস্থা। ঈশ্বর-বৈ প্রাণ থাকছে না। তাই প্রাণের প্রাণ তিনি।

শ্রীম (স্বগত) — বছর বছর যেমন থাকি মঠে গিয়ে উৎসবাদিতে, তেমনি থাকলুম আর কি? কিন্তু আর এক রকম আছে, ওঁদের (সাধুদের) মত হয়ে যাওয়া, ঘরের লোক হয়ে যাওয়া — সাধু হয়ে যাওয়া। এটি হয় সংস্কার থাকলে। বুদ্ধ একদিন একটা মড়া দেখেই বুঝে ফেললেন সংসার অনিত্য। তাই সাধু হয়ে গেলেন মৃত্যুকে জয় করতে — অমৃত হতে।

শ্রীম-র কাছে কয়েকজন কুমার ব্রহ্মচারী থাকেন — জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি। তিনি ইচ্ছা করেন তাঁহারা মঠে গিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছা শ্রীম-র কাছে থাকেন, তাঁহার সেবা করেন যাবৎ তিনি জীবিত থাকেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আজ বার বার একই কথা বলিতেছেন। তিনি কিন্তু ইচ্ছা করেন তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহারা মঠে যোগদান করেন। প্রায়ই বলেন, ঘরের লোক হয়ে এস। তারপর যেমন ইচ্ছা তা করো। তিনি মনে করেন, একটা সম্প্রদায়ের লোক হইয়া থাকিলে ঈশ্বরভজনে অনুকূল হয়। ক্ষণজন্মা পুরুষদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ বৈরাগ্যবানদের পক্ষে

সম্প্রদায়ের ছাপ রক্ষাকবচের মত কাজ করে। তিনি নানাভাবে নানা দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে মঠের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, দু'রকম মাছি আছে। একরকম মাছি রসে বসে, ফুলে বসে; আবার পচা ঘায়েতে বসে এবং বিষ্ঠাতেও বসে। আর এক রকম মাছি আছে তারা কেবল ফুলেতে বসে। ফুলের মধু পান করে। তেমন দু' রকম ভক্ত আছে — যোগী-ভোগী ও যোগী। পাণ্ডবদের ঠাকুর বলতেন যোগী-ভোগী। তারা রাজ্যসুখ ভোগ করবে। দেবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা নেবে। আবার ব্রহ্মানন্দও ভোগ করবে। কিন্তু শুকদেব যোগী। খালি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করবে। সাধুরা শুকদেবের জাত। কেবল ফুলের মধু পান করে।

আবার বলেছিলেন বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই থাকে ভাল। ভাল জায়গায় রাখ, মরে যাবে। বলেছিলেন, দু'টো ভাণ্ড আছে। একটাতে বিষ্ঠা আর একটাতে ক্ষীর। একজন লোক দেখলো বিষ্ঠার পোকাগুলির বড় দুর্দশা। সে একটা পোকাকে কাঠি দিয়ে তুলে ক্ষীরে রেখে দিল। এটার প্রাণ যায় যায় হয়ে গেল। আবার কাঠি দিয়ে বিষ্ঠাতে যেই রেখে দিল অমনি কিলবিল করে ওতে মিশে গেল, প্রাণ পেয়েছে। এমনি কাণ্ড!

এই থাকের মানুষও আছে। তারা কেবল বিষয়ভোগ নিয়ে আছে। ঠাকুর বলতেন, এই থাকের লোকদের কাছে ঈশ্বরের কথা বল, তখনই উঠে যাবে। বিষয়ের কথা বল, অমনি এগিয়ে এসে বসবে। ঠাকুরের কাছে এইরূপ লোকও যেতো ভক্তদের সঙ্গে। তারা উঠে গিয়ে নৌকোতে বসতো। এদের ভিতরই কেহ বসে থাকতো callous (নির্বিকার) — ঠাকুর তাদের বলতেন, যাও বাগিচা দেখ গিয়ে। এদের মধ্যে অনেকেই সকাম ভক্ত। তাদেরও উঠিয়ে দিতেন। বলতেন, মন্দির দেখ গিয়ে।

একজন ভক্ত — ঠাকুর তো অবতার, ঈশ্বর। তাঁর কাছেই তো সকাম ভক্তগণ সংসারের ঐশ্বর্য চাইছে। তাদের সঙ্গ কেন তবে সইতে পারতেন না?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, যখন আমার এই অবস্থা হল তখন কেঁদে কেঁদে মাকে বলতাম কুঠির উপর চড়ে — মা, শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত এনে দাও। আমার শরীর এই কামিনীকাঞ্চনে থাকবে না। বিশ বাইশ বছর এমনতর

করতেন। তখন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত আসতে লাগলো। তাদের সঙ্গে মিশে তখন প্রাণ শীতল হল, তিনি বলতেন।

সত্য তিনি ঈশ্বর অবতার। কিন্তু যুগধর্ম সাধনের জন্য একেবারে বিশুদ্ধসত্ত্ব শরীর নিয়ে এসেছেন। এতে রজঃ তমঃ সহ্য হয় না। তাইতো স্বামীজী প্রণাম মন্ত্রে বলেছেন, 'অবতার বরিষ্ঠায়।' এবারের শরীর শুদ্ধসত্ত্ব।

এবারের আসার প্রধান কাজ ধর্মসমন্বয়। বিজ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত জগৎ এক পরিবারের মত হয়ে গেছে — দূরত্ব ও সময়কে বিজ্ঞান জয় করে ফেলেছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ, নাস্তিক্যবাদেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাই ঠাকুরের অবস্থিতি ভাবমুখে, মানে ঈশ্বরে — জগতে নয় — সর্বদা ঈশ্বরে। এই অবস্থা যারা বুঝতে পারে তেমন লোকদের চাইতেন। তাঁরা তাঁর কাজ করবেন কিনা, — জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন! প্রবল শত্রু জড়বাদ, তাকে কাবু করবার জন্যই প্রধান চেষ্টা। এই কাজে তাঁর সহায়ক দুই থাকের ভক্ত — যোগী-ভোগী ও যোগী। তাই তাঁদের শিক্ষায় অধিক সময় যেতো।

৩

আদর্শটি তিনি ভক্তদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিলেন — ঈশ্বরদর্শন। এই আদর্শ নিয়ে ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তকে তৈরী করে দিলেন। এঁরা অপরকে বলবেন। এই ভক্তদের দুটি কাজ — নিজের মুক্তিলাভ আর অপরের মুক্তিসাধনে সহায়তা করা। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিত্যসিদ্ধ — পূর্ব পূর্ব অবতারের পার্ষদ। সহজেই এঁদের জ্ঞান হয়ে যায়। যেমন বাপ বড়লোক, অনেক ঐশ্বর্য, অনেক কাজ। ছেলেদের সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজে আলগা হয়ে যায়, তেমনি।

অতি অল্প দিন পেয়েছিলেন ওঁদের শিক্ষার জন্য ঠাকুর — পাঁচ-ছ' বছর মাত্র। প্রথম করলেন নিজে ঈশ্বরদর্শন, মাতৃভাবে। তারপর বেদ পুরাণ তন্ত্রের নানা পথ দিয়ে গিয়ে ঈশ্বরকে দর্শন করলেন। মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মের সাধন করে ঐ একই স্থানে গেলেন। তখন প্রচার করলেন, যত মত তত পথ।

অন্তরঙ্গদের আত্মদর্শন করিয়ে — এই উদার মত প্রচারের জন্য তৈরী

করিয়ে তিনি অন্তর্ধান করলেন। অল্প সময়ে অধিক কাজ করে গেলেন। এখনও তিনিই অদৃশ্যে থেকে ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাচ্ছেন — জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা আর জীবের দুঃখ বিমোচন — নানা এজেন্সির ভিতর দিয়ে।

শ্রীম নীরব। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর একটি নূতন থাকের সাধু সৃষ্টি করেছেন। 'সাধু' মানে যোগী, যাঁরা সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। ঠাকুর সাধুশ্রেষ্ঠ। যাদের সংস্কার আছে তারা এঁদের সঙ্গে থেকে থেকে সাধু হয়ে যায়। কেন এই সাধুসৃষ্টি? না, তাঁদের দিয়ে জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। এখনও সাধু হচ্ছে, আরও হবে। সর্বদাই জগতে সাধু আছে। আবার যোগী-ভোগীও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজ তাঁদের দিয়ে করাচ্ছেন।

হরি পর্বত — যেমন শম্ভু মল্লিক, রসিক। রসিক আমায় শেষের দিকে বলেছিলেন — ভাই, আমরা যেমন তাঁকে দেখেছি তেমন আর কে দেখতে পেয়েছে? তখনও অন্তরঙ্গরা কেউ যান নাই।

রসিক বলেছিলেন, একদিন ঝাউতলা থেকে ঠাকুর ফিরছেন। একটা ঝোপে আমি লুকিয়ে ছিলাম। কাছে কেউ নাই দেখে আমি বের হয় তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, প্রভো, আমার জন্ম কি এই ভাবেই যাবে? ঠাকুর আমাকে অভয় দিয়ে সস্নেহে বললেন, না রে তোর সুদিন তো এসে গেছে। তোকে আর ও কাজ করতে হবে না।

রসিক কালীবাড়ির পায়খানা সাফ করতেন। ঠাকুরের ঘরের দিকে যাওয়া নিষেধ। তাঁর মৃত্যু মহাপুরুষের মত হয়। ঠাকুরের কৃপালাভের পর ধ্যান ভজন করতেন। বাড়ির অঙ্গনে তুলসীকানন করে ওর ভিতর বসে ভজন করতেন। একদিন গ্রীষ্মের সময় স্ত্রীকে বললেন, ছেলেদের ডাক। তাদের বললেন, ঐ তুলসীতলায় আমায় নিয়ে শুইয়ে দাও। শরীর খুব দুর্বল ছিল। সকলে ধরে নিয়ে ওখান শুইয়ে দিল। রসিক কালীবাড়ির দিকে মুখ করে বললেন, গঙ্গা, মা কালী, রামকৃষ্ণ! আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শ্রীম — এঁরই বাড়ির নালী ঠাকুর চুল দিয়ে সাফ করেছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, এই অভিমান ছাড়াতে। সাধনের সময় করেছিলেন। সেই পরশমণির

স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে গিছলো সব। ধন্য রসিক। রসিক আজ মহাত্মা!

হরি পর্বত — ঠাকুরের একজন রসদদার শম্ভু মল্লিক। কিন্তু তাঁর আত্মীয়রা এরূপ কেন হলো? শেষের দিকে তাঁকে আগলে রাখতো। কাউকে দেখা করতে দিত না। একবার চাঁদার জন্য গেলে ফিরিয়ে দিল। কম পড়ে যাবে টাকা দিলে ভাইদের ভাগে, এই ভাব। তাঁর কেউ নাই।

শ্রীম — ঠাকুর তাই টাকা চাইতেন না, পাছে না আসে। বলতেন, মা, টাকা ওদের অত প্রিয় ওদেরই দাও। আমায় তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।

আবার টাকা দিলেও নিতেন না। ছুঁতে পারতেন না। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের কাছ থেকে আবার চেয়েও নিতেন প্রয়োজনীয় কিছু। সে কেবল ভক্তদের কৃতার্থ করবার জন্য। তারা এই কথা মনে করে তাঁর চিন্তা করবে পরে।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে) — একবার একজন (শশধর তর্কচূড়ামণি) জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে আমি লেকচার দিতে থাকবো, যেমন দিচ্ছি? ঠাকুর ঐ কথার সোজা উত্তর না দিয়ে বললেন, এখানে মাঝে মাঝে এসো। আহা, সর্বদা সকলের কল্যাণ-চিন্তা করছেন। (সহাস্যে) যদি বলেন, লেকচার দিও না, তবে আর ঐ ব্যক্তি আসবে না। না এলে তারই মহা অকল্যাণ।

তা হলেও এঁরা ভক্ত। Amateur religion (সখের ধর্ম) থেকে ভাল। এ এক রকম ধর্ম আছে, সেজেগুজে ধর্ম — যেমন থিয়েটারে নারদ, শুকদেব সাজে, সখের ধর্ম। এদের চাইতে ওরা ভাল — সকাম ভক্ত, যারা লেকচার দিতে চায়।

কি করা যায়। মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে আর মাছ থাকে না। একটা আধটা ভাল গুণ দেখে ঐটে ধরে ঠাকুর টান মারতেন। কেরমে (ক্রমে) বাকীগুলি ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীম কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতেছেন। তারপর অব্যক্ত কাহাকেও উপনিষদ্ পাঠ করিতে বলিলেন। একজন ভক্ত পাঠ করিতেছেন। প্রথমে মূল সংস্কৃত পাঠ হইল। তারপর বাংলা অনুবাদ। শ্রীম এবার নিজ মন্তব্য বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে

নির্দেশ করেছিলেন তাঁকে এখানে অব্যক্ত বলছেন। ঠাকুর সেই অব্যক্তে, অখণ্ডে প্রায় লীন হয়ে ছিলেন ছয় মাস একটানা। বলেছিলেন, বাক্যাদি, ইন্দ্রিয়, মনবুদ্ধি — এসব তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। বলতেন, ব্রহ্ম এঁটো হয় নাই।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আমাদের এই সব উপনিষদ্ শোনা কেন? না, ঠাকুরের বিভিন্ন অবস্থা আর মহাবাক্যের সঙ্গে মিলাবার জন্য। তাঁর যা সব অনুভব হয়েছে, সেই সবই সারা শাস্ত্রময় ছড়িয়ে আছে। সেই সব রত্ন একত্র করতে গেলে বহু পরিশ্রম করতে হয়। সাধারণ লোক তা পারে না। কিন্তু ঠাকুরের জীবন দেখ, তাঁর মহাবাক্য সব দেখ, দেখবে সব ঐসব এতে — এইসব শাস্ত্রাদিতে, ব্যক্ত হয়ে আছে, প্রকাশিত হয়ে আছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে এটি হয় না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হবে না। তাঁর কথায় বিশ্বাস হবে না। তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর চিন্তা করবে না।

যদি তাঁতে বিশ্বাস হয়ে গেল অবতার বলে, তবে বেঁচে গেল। কত জন্ম কমে গেল।

যদি ঘরে বসে কেউ ঝরনার বিশুদ্ধ জল পায়, তবে কোথায় যাবে নদী পুকুরে জল আনতে! কিন্তু এটি হবার যো নাই। তা হলে যে এ দিককার খেলাটি, জগৎলীলা থাকবে না। সকলের চৈতন্য হয়ে গেলে, সকলে মুক্ত হয়ে গেলে জগৎ থাকে না। তাই তিনি তাঁর মহামায়া দিয়ে, অবিদ্যাশক্তি দিয়ে মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি ঢেকে রেখে দেন।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — অত কথা মনে থাকে না লোকের। আপনি kindly (দয়া করে) আবার প্রথম মন্ত্রটি, যাতে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হয়েছে, সেটি পড়ে শোনান। আর শেষটি। ওতে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কে, তার কথা বলা হয়েছে।

পাঠক (পড়িতেছেন) — 'কেবলং জ্যোতিরূপং অনাদ্যনন্তং—'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, এটি আপনারা মুখস্থ করে ফেলুন। আর এটি চিন্তা করতে করতে বাড়ি যান। সৃষ্টির পূর্বে এটি কেবল ছিল। (পাঠকের প্রতি) সবটা বলুন ব্রহ্মের লক্ষণ।

পাঠক পড়িতেছেন। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন।

পাঠক — 'কেবলং জ্যোতিরূপং অনাদ্যনন্তং অনণ্বস্থূলং অরূপং

রূপবদবিজ্ঞেয়ম্ জ্ঞানরূপং আনন্দং অয়মাসীৎ।'

শ্রীম (সকলের প্রতি) - ঠাকুরের এ সবই দর্শন হয়েছে — এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগর। (পাঠকের প্রতি) আর অধিকারী কে, তার লক্ষণও পড়ুন।

পাঠক (পড়িতেছেন) — 'ন চ ইমাম্ বিদ্যাম অশ্রদ্ধধানায় ব্রূয়াৎ, ন অসূয়াবতে ন অনুচানায় ন অবিষ্ণুভক্তায়, ন অনৃতিনে, ন অতপসে, ন অদান্তায়, ন অশান্তায়, ন অদীক্ষিতায়, ন অধর্মশীলায়, ন হিংসকায়, ন অব্রহ্মচারিনে।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বেদান্তবাদীরা এক কথায় এগুলিকে সাধন চতুষ্টয় বলেন। কেন মানা করছেন অনধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে? মানে, বললে কোন কাজ হবে না — নিরর্থক হবে।

সকল বিদ্যালাভেরই কতকগুলি preliminary requirements-এর (প্রাথমিক সাধনের) দরকার। সেগুলি না থাকলে বুঝবে না। আপনারা এগুলি ভাবুন যেতে যেতে। তখন নিজেরা কোথায় আছি তা ধরা যায়। এসব mile-stones (পথের দূরত্ব জ্ঞাপক ফলক)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ভগবানে যার শ্রদ্ধা নাই তাকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে নাই। যে ভগবানকে বিদ্বেষ করে, তাকেও না। যে অহংকারী, যে ভক্ত নয়, যে সরল নয়, যে তপস্যা করে নাই, যে শান্ত নয়, দান্ত নয়, যার গুরুলাভ হয় নাই, ধর্মশীল যে নয়, যে অপরকে হিংসা করে, আর যে ব্রহ্মচারী নয় — তাকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে নাই।

শুনুন, যে ব্রহ্মচারী নয় তাকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা নিষেধ। কেন? না সকল সাধনের মূল এটি। ব্রহ্মচর্য না থাকলে ঈশ্বরীয় কথার ধারণা হয় না। তাই বলতে নিষেধ করেছেন ঋষিগণ।

শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। রাত্রি দশটা। ভক্তদের বিদায় দিতেছেন যুক্ত করে নমস্কার করিয়া। আবার বলিতেছেন, এটি ভাবতে ভাবতে বাড়ি যান — বেদে যাকে অব্যক্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে তিনিই ইদানীং নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ।

কলিকাতা, পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতির ভবন।
৭ শঙ্কর ঘোষের লেন।
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খ্রীঃ। ১২ই আশ্বিন, ১৩৩২ সাল।
সোমবার, শুক্লা একাদশী।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পঞ্চবটীতে বনভোজন

আজ মাঘী পূর্ণিমা। ভক্তগণ সকলেই আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আনন্দোৎসব করিতেছেন। রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ পাইবেন। গত রাত্রিতে বিনয়, মনোরঞ্জন, বলাই ও ছোট নলিনী আসিয়া সব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। আজ সকাল হইতে রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে। স্থান পঞ্চবটী, বটতলার উত্তর দিকে আম্রবৃক্ষতলে, ক্রোটন-সারির দক্ষিণে।

আজ ২৮শে জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ। ১৫ই মাঘ ১৩৩২ সাল, বৃহস্পতিবার।

শ্রীম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছিলেন সকাল নয়টার সময় ডাক্তার বক্সীর সঙ্গে। তিনি ঠাকুরের ঘরের পূর্ব বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তগণ কেহ কেহ চাঁদনীতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। তাঁহারা আসিতে আসিতে শ্রীম মন্দির অঙ্গনে অবতরণ করিলেন। শিবমন্দিরশ্রেণীর উত্তরের সোপানকুঞ্জের নিম্ন হইতে দ্বিতীয় সোপানে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর তৃতীয় সোপানে ললাট স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন, উত্তর দিক হইতে আড়াই হাত দূরে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে সমাধিস্থ বসিয়াছিলেন। যে ফোটো আজকাল সর্বত্র পূজিত হয় সেইটি ঐ সময়ে এখানে লওয়া হয়। তাই সর্বদা শ্রীম এখানে প্রণাম করেন। একটি ভক্তকে পাশে দাঁড়ান দেখিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে হার্টে? ভক্তটি কিছুদিন হইতে ভুগিতেছেন।

এবার শ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের নিচে শ্রীম দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন আর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন উত্তরাস্য, সোপানতলে অঙ্গনে। তারপর সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া গলবস্ত্রে শ্রীমূর্তিযুগলের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন আর চরণামৃত গ্রহণ করিলেন। এবার মা ভবতারিণীর

মন্দিরে। এখানেও বারন্দার পূর্ব ধারে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে ডান হাতে রাখিয়া প্রণাম করিলেন পশ্চিমাস্য। রামলালদাদা আসিয়া শ্রীম-র ললাটে সিঁদুরের তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন, আর হাতে চরণামৃত দিলেন। এখন চাঁদনীতে দাঁড়াইয়া তিনি গঙ্গা দর্শন করিলেন। এবার গঙ্গার তীর দিয়া উত্তর দিকে চলিতেছেন। পরে ঠাকুরের ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর নহবত ও বকুলতলার ঘাট দর্শন করিয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্যানগৃহ, মাধবীর লতা ও পঞ্চবটী দেখিয়া পুরানো বটতলায় প্রণাম করিয়া রন্ধনস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রন্ধনের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া বিস্ময়ে বলিলেন, ও বাবা, এতো কাণ্ড!

এবার বেলতলায়। বেদীর উপর বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতেছেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পূর্বাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে ডাক্তার, জগবন্ধু ও এটর্নী বীরেন বসু। বীরেনের সম্প্রতি পিতৃদশা। বড় অমূল্য ও বলাই, অমৃত, যতীন ও হরি পর্বত, মোটা সুধীর ও মনোরঞ্জন প্রভৃতি যে যেখানে পারেন বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। আধ ঘন্টা পরে শ্রীম উঠিলেন।

একদিন শ্রীম এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন দীর্ঘকাল, প্রায় তিন ঘন্টা। ঠাকুর তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া নিচে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুকাল পর চক্ষু মেলিয়া যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিলেন তাঁহাকে বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তদবধি এ স্থান শ্রীম-র নিকট অতি পুণ্যময় ও অতি পবিত্র।

শ্রীম হাঁসপুকুরের পূর্ব তীর দিয়া চলিতেছেন দক্ষিণ দিকে। মধ্যস্থলে রাস্তার পূর্বধারে আম্রকুঞ্জে একদল হিন্দুস্থানী যাত্রী রন্ধন করিতেছেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিলেন। তারপর আসিয়া দাঁড়াইলেন হাঁসপুকুরের দক্ষিণ চাতালে। শ্রীম-র দৃষ্টি অন্তরে, পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। ভগবান রামকৃষ্ণ নিত্য এই চাতালে আসিয়া দাঁড়াইতেন শৌচাদির জল লইতে। কেহ গাড়ু ভরিয়া জল লইয়া আসিতেন। কিয়ৎকাল এই স্থান তিনি মৌন দর্শন করিয়া পঞ্চবটীর ধ্যানকুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবার ঠাকুরের ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। রামলালদাদার সঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে

তিনি বলিলেন, ডাক্তার কালী দেহ রেখেছিলেন সত্তর বছরে। কাগজওয়ালারা তখন লিখেছিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি চলে গেছেন, তার জন্য তো দুঃখ নেই, কারণ উপযুক্ত বয়সেই তো গেছেন। তবে দুঃখ এই, তাঁর কতগুলি গুণ ছিল সেগুলি গেল।' শ্রীম বিস্ময়ে এই কথার সমালোচনা করিয়া বলিলেন, ও মা, মানুষের জন্য কেউ কিছু বলে নাই, তার গুণের জন্য! সেই হিসেবে তো আমাদের আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল। রামলালদাদা উত্তর করিলেন, তা কেন? আপনি আরও হাজার বছর থাকুন। আপনারা যতদিন থাকবেন জগতের কল্যাণ। শ্রীম ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, না, যিনি কর্তা তাঁর ইচ্ছাতেই সব হবে। রামলালদাদা পুনরায় বলিলেন, কেন, নিকষার কথা মনে হয় না — লীলা দেখতে। শ্রীম উত্তর করিলেন, মানুষ মন করলে হয় না। কর্তার ইচ্ছাতেই সব হয়। রামলালদাদা বলিলেন, আর তো আসতে পারবেন না, দেখতে সাধ হয় না? শ্রীম নীরব রহিলেন।

একটু পর শ্রীম গোল বারান্দা হইতে নামিয়া দক্ষিণের বড় ঘাটের চাতালে গিয়া দাড়াইলেন। এখানে ঠাকুরের প্রসাদ সকলে হাতে হাতে পাইলেন।

আবার কালী-ঘরে শ্রীম। মন্দিরের পশ্চিম দরজা বন্ধ ছিল। এখন উহা খুলিয়া দিল। পশ্চিম দিকের পরিক্রমার পথে তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভক্তরাও বসিলেন। রামলালদাদাও আসিয়া বসিলেন। রামলালদাদা ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি এখন মা-কালীর প্রধান পুরোহিত। শ্রীম-র অনুরোধে তিনি গান গাহিতেছেন —

যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী শ্যামা॥
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণুর রবে গোপীর মন ভুলিত।)
(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্) (যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)॥

গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে, 'ধর, ধর, ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী'।
এলায়ে চাঁচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী॥
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা,
(আবার) তাথৈয়া তাথৈয়া তাতা থৈয়া থৈয়া; বাজিত নূপুর-ধ্বনি।
শুনতে পেয়ে আসতো ধেয়ে, যত ব্রজের রমণী গো মা॥
তেমনি তেমনি তেমনি করে একবার নাচ দেখি মা।

এবার গঙ্গাস্নান। ভক্তরা অনেকে স্নান করিয়া উঠিয়াছেন বড় ঘাটে। শ্রীম নামিলেন। তিনিও আজ স্নান করিবেন। স্নানান্তে মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া তিনি নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন, পশ্চিমের দিকে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। শ্রীম মধ্যস্থলে বসা। ভক্তগণ চারিদিকে। শ্রীম নিজে হাতে প্রত্যেককে দুইখানা উত্তম জিলিপি প্রসাদ দিলেন। কতকগুলি দর্শক ভক্তও শ্রীম-র হাত হইতে এই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এখন বেলা বারোটা।

২

এবার পঙ্গদ্ বসিয়াছে। সকলে প্রসাদ পাইবেন। বটতলার উত্তর দিকে দুইটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের মধ্যস্থলে শ্রীম বসিয়াছেন উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসিয়াছেন পূর্বদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে।

একজন ভক্ত ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন। প্রচুর আয়োজন। অতি উত্তম চালের উত্তম খিচুড়ী। ভাজা ও তরকারী অনেক প্রকারের। দই ও মিষ্টি নানা রকমের। অতি পরিতোষপূর্বক সকলে প্রসাদ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে শ্রীম বলিতেছেন, এঁকে আর একটু দই দিন, ওঁকে আর একটা রসগোল্লা। বাহিরের দর্শক ভক্তও অনেকগুলি পাতা লইয়া পঙ্গদে বসিয়াছেন। ভোজনের পূর্বে শ্রীযুক্ত রামলালদাদাকে প্রচুর দই মিষ্টি উপহার পাঠাইয়া দিলেন। আর বলিয়া দিলেন, যুক্তকরে দাদার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আসিবেন। তারপর সকলে প্রসাদ পাইবেন। তিনি ঠাকুরের বংশধর ও সেবক। তাই তাঁহার অনুমতি লইয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সব করিতে হয় এ স্থলে। মন্দিরের খাজাঞ্চীও পঙ্গদে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। আহার চলিতেছে। সকলে আনন্দরসে ডুবিয়া আছেন। তখন

আসিয়া উপস্থিত হইলেন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত, স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য। আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের রিসিভার। তিনি প্রণাম করিয়া শ্রীমকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, মোটর আসিয়াছে। ঠাকুরের ঘরের কাছে দাঁড়ান। কিরণবাবুর ড্রাইভারকে একজন গিয়া লইয়া আসিলেন। তিনিও প্রসাদ পাইলেন।

প্রায় তিনটার সময় শ্রীম মোটরে উঠিলেন। ভক্তদের ড্রাইভারকে পান দিতে বলিলেন। ভক্তরা পান দিলেন। শ্রীম আনন্দে বলিলেন, আরও দাও, আরও দাও। ড্রাইভার কম! যাঁর কৃপায় এইসব হয়। শ্রীকৃষ্ণ সারথি হয়ে এঁদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আমাদের এঁদের তুষ্ট করতে হয়।

মোটরে ডাক্তার বক্সীও এই সঙ্গে যাইবেন। তিনি গিয়াছেন রামলালদাদার বাড়িতে। রামলালদাদার বাড়িতে কন্যা অসুস্থা, তাহাকে দেখিবেন। শ্রীম অপেক্ষা করিতেছেন। বলিতেছেন, ডাক্তারদের কত কাজ! কিন্তু আত্মার ডাক্তার যাঁরা তাঁদের রেহাই নাই। ইহকাল আবার পরকাল দুই-ই দেখতে হয়। শরীরের ডাক্তার কেবল এইখানের ভাবনাই ভাবছে। আত্মার ডাক্তারের অবসর নেই। শ্রীম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এমনি মহামায়ার খেলা! সব গোলমাল লাগিয়ে দেন। চণ্ডীতে আছে, —

যা দেবী সর্বভূতেষু মেধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মেধাও তিনি। তাই দেবগণ মহামায়াকে মেধা বলে মেধারূপে প্রণাম করছেন। কিন্তু সেই মেধাও গোলমালে পড়ে যায়। সব ভুল হয়ে যায়। সব ভুলিয়ে দেন মহামায়া। মেধা মানে শাস্ত্র ও গুরুবচন ধারণা করার শক্তি। কর্ণ অত বড় বীর, আর অমন মেধা! মহামায়া সে মেধাও ভুলিয়ে দিলেন কাজের সময়। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি সব ভুলে গেলেন। গুরু পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন কর্ণকে, তোমার অস্ত্রবিদ্যা সব ভুল হয়ে যাবে কাজের সময়। তুমি প্রতারণা করে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলে সেই পাপে। পরশুরাম অতি সুদক্ষ অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ

ছিলেন। কর্ণ তাঁর নিকট অস্ত্রবিদ্যা লাভ করবেন। পরিচয় দিলেন ব্রাহ্মণ বলে। ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের শত্রু। তাই তাদের তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিখান না। একদিন বনে পরশুরাম কর্ণের কোলে মাথা রেখে প্রগাঢ় নিদ্রায় প্রবিষ্ট হলেন। একটি বজ্রকীট কর্ণের ঊরুদেশ ভেদ করে উপরে উঠছিল। গুরুদেবের পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে তিনি সব জেনে শুনে স্থির হয়ে বসে রইলেন। গুরু পরশুরামের নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি দেখলেন তাঁর শরীর রক্তাক্ত। জিজ্ঞাসায় সব কথা জেনে ক্রোধে কর্ণকে বললেন, 'তুমি ক্ষত্রিয়। নইলে অত সহ্যগুণ হয় না। তুমি মিথ্যা কথা বলে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যুদ্ধের সময় তুমি সব ভুলে যাবে।' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনবধের সময় কর্ণ সব ভুলে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি নিজেই অর্জুনের দ্বারা হত হলেন। এমনি কাণ্ড মহামায়ায়! তাঁর সঙ্গে চালাকী চলে না। তাই তো সর্বদা ঠাকুর সকলকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না!' মহামায়ার সঙ্গে চালাকী! সর্বদা ত্রাহি ত্রাহি। শরণাগত, শরণাগত। মা শরণাগত।

ডাক্তার আসিলেন। এইবার গাড়ী ছাড়িবে। শ্রীম একটি ভক্তকে গাড়ীতে যাইতে বলিলেন। তিনি অসুস্থ। ভক্ত বলিলেন, আমি গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে যাব। শ্রীম বলিলেন, কেন, আলমবাজার পর্যন্ত না হয় মোটরে যাবেন। ভক্ত আবার বলিলেন, আজ্ঞে, আমি গঙ্গা দিয়েই যাব। অমূল্য, অমৃত ও ডাক্তার শ্রীম-র সঙ্গে গেলেন।

সন্ধ্যার পর নৌকা করিয়া জিতেন মুখার্জী ও আর একটি ভক্ত গঙ্গার উপর দিয়া চলিতেছেন। তাঁহারা প্রচুর প্রসাদ আনিয়াছেন মর্টন স্কুলের ভক্তমণ্ডলীর জন্য — যাঁহারা কার্যোপলক্ষ্যে আজের উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। গঙ্গার দুই দিক হইতে আরতির শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি হইতেছে। এখন ভাটা। নৌকা বেগে দক্ষিণ দিকে চলিতেছে। উভয় তীরেই বৈদ্যুতিক আলোকমালা। ভক্তরা চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন, ভগবান মানুষ হয়ে এই দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ত্রিশ বৎসর লীলা করেছেন। কি আশ্চর্য, মানুষ ঠিক তাঁকে চিনতে পারে নাই! মাত্র কয়েকটি ভক্ত তাঁকে চিনেছিলেন। তাঁরাই তাঁকে ধরে রইলেন সারাজীবন। আজ তাঁরা সকলে জগদ্‌গুরুর আসনে আসীন শ্রীশ্রী ঠাকুরের কৃপায়। তিনি দক্ষিণেশ্বরে

ছিলেন বলে আজ এই স্থান পবিত্র, জগদ্বিখ্যাত। আমরাও ধন্য, এই লীলার অংশভাগী! একটু দেরী হয়ে গেলেও আমরা অবতার-লীলারই শেষ অংশ দর্শন করছি তাঁর পার্ষদদের দেখে। নিশ্চয় আমরা ধন্য!

একটি ভক্ত মর্টন স্কুলের শিক্ষক। উনি অসুস্থ। পরের দিন তিনি শ্রীম-র নিকট ছুটি প্রার্থনা করিলেন সমগ্র ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হইল না। মাত্র তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর হইল। শ্রীম বলিলেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পি.ভি. বোস যখন বলেছেন হার্ট ভাল, তখন দরকার নাই ছুটির। আর ইতিপূর্বে অনেকদিনের ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে।

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীঃ।
১৬ই মাঘ, ১৩৩২ সাল। শুক্রবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভক্তদের পিঠেও দু'টো চোখ থাকবে

১

মর্টন স্কুল। আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ আচার্য শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। চেয়ারের উপর ছোট একখানা ভেড়ার লোমের কম্বলাসন। গায়ে লং-ক্লথের পাঞ্জাবী, পরনে সাদা পাড় ধুতি। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, বিরলকেশ শীর্ষ। মুখমণ্ডল প্রশান্তোজ্জ্বল। সম্মুখ প্রসারিত উন্নত নয়নদ্বয়ে ব্রহ্মজ্যোতি বিকশিত। শ্রীম-র সম্মুখে ডান হাতে বসা কয়েকজন ভক্ত। হাই বেঞ্চ সংযুক্ত বেঞ্চের উপর বড় নলিনী, তাহার বামে রজনী প্রভৃতি। শ্রীম-র সম্মুখে বাম হাতে দুইখানা বেঞ্চ এক সঙ্গে পাতা। তাহার উপর শতরঞ্জি। সাধুরা এই আসনে বসিয়া থাকেন।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে চারটা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। গতকাল ৺বিজয়া গিয়াছে। একটি সাধু শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সাধু বেলুড় মঠে থাকেন। তিনি ১-৩৬ মিনিটের স্টীমারে বেলুড় হইতে বাগবাজার আসেন। 'উদ্বোধনে' মাকে ও খোকামহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া মুক্তারামবাবু স্ট্রীটস্থ অদ্বৈত আশ্রম হইয়া শ্রীম-র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাধুকে দেখিয়াই শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, এই যে আসুন আসুন জগবন্ধু। সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আর আপত্তি করিলেও আজ জোর করিয়া পায়ে হাত দিলেন। সাধু বসিলেন পূর্বাস্য শ্রীম-র অতি নিকটে বাম পাশে জোড়া বেঞ্চে। কিছুক্ষণ মধ্যে স্বামী রাঘবানন্দ আসিলেন।

শ্রীম অতি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের কুশল তো? আজ দুপুরে ভাত খেয়েছেন কি? ভুগছেন খুব।

সাধু — খোকামহারাজ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। আর বলেছেন আপনাকে জানাতে, এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। আজকাল তামাক খাচ্ছেন।

শ্রীম — শুনতে পাচ্ছি, আজকাল ওঁর একটা দুষ্ট খিদে হয়েছে। পেটরোগা লোকদের এমন হয়। খালি 'খাব খাব' করে।

(সহাস্য) আমার একবার কলেরা হয়েছিল। একটু ভাল হলে ডাক্তার বললেন, শুধু ঝোল ভাত খাবেন — মাছও না, আনাজও না। আমি জোর করে খাবো! (হাতে ধরার অভিনয় করিয়া) অমনি করে ধরেছি। (হাস্য) কিন্তু ওরা নিয়ে গেল। তখন দুর্বল ছিলাম কি না। আর একজন এসেছে। তাকে বলেছি, তোমাদের ওখানে ঝরনা আছে? সে বললে আছে। মধুপুর না কোথায় পাহাড়ের উপর। আমি বললাম, আমায় নিয়ে যাবে? আমি তার নিচে বসে থাকবো। সে বুঝতে পারলে, তাই বললে, হাঁ নিয়ে যাবে। (হাস্য)। এমনতর কাণ্ড। বিকারের রোগী কি না। ও কারো দোষ নয়।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন। পুনরায় নিজে নিজে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম — আজকাল শুনতে পাচ্ছি মঠের কর্তারা খুব কড়া নিয়ম করবেন। ঐ একটা দল বের হয়ে গেল — যারা ভোগ করবে। যারা রইল তাদের নির্জলা একাদশী।

গোড়ায়ই কিন্তু মস্ত ভুল। গৃহস্থ হয়ে যাবে সাধুদের সঙ্গে ভোট দিতে! কোথায় সে যাবে Worship-এর (পূজার) Spirit (ভাব) নিয়ে! তা-না co-operation (সহযোগিতা) করতে। তাও কি কখনও হয়!

Common wealth (সার্বজনিক সম্পত্তি) ঐ বরানগর মঠে হয়েছিল। এক জোড়া চটি জুতা ছিল! যে বাইরে যাবে সে পায়ে দিয়ে যাবে। Personal (ব্যক্তিগত) কিছুই নাই।

আবার কে ক'টাকা দিলে তা কাগজে বার করা! পূজোর জন্য টাকা দিবে — তা আবার কাগজে বার করা কেন? এই (দুর্গা) মার পূজা হলো। মাকে যদি কেউ বলতো, মা, এই টাকা তোমার পূজায় দিলুম

— মা কি তা কাগজে বার করতেন? বললে হয়তো বলতেন, বাবা দরকার নাই তোমার পূজার। (হাস্য)

কি অন্যায়! এই নূতন সব লোক যাবে। তাদের দিয়ে টাকা আদায় করা। আবার মেয়েমানুষের সঙ্গে মেশামেশি। আবার বলছে, হাঁ মশায়, এই দিলেন?

কোথায় সে এসেছে সব ছেড়ে নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকবে বলে! তা নয়, গৃহস্থদের কাছে টাকা তোলা! এই সব good, bad and indifferent (ভাল, মন্দ ও উদাসীন) লোকদের কাছ হতে।

ভোগও করবো, অথচ সাধুগিরিও করবো, এ আর চলছে না। (সহাস্যে) কি বলে — 'সকলই তোমার ধারা, তফাৎ কেবল ঘণ্টা নাড়া।'

কি বলে (বাইবেলে) — 'Ye are like unto whited sepulchres!' (St. Matt. 23 : 27) Outside white-washed, inside rottenness — full of human bones!

'চুনাপুতি কবর সব'। বাইরে সাফ, ভিতরে কদর্য নরকঙ্কালপূর্ণ।

২

আর কি বলে, ওর খুব success (সাফল্য)! তার মানে কি? না, বড় বাড়ি করা, কতকগুলি ভক্ত করা, ভাল খাওয়া দাওয়া, এই। এর মানে success (সফলতা)! ছিঃ!

তিনি কি টাকা পয়সার কথা বলতেন — প্রেমভক্তি! গয়না চুরি গেল! মথুরবাবু বললেন (রাধাকান্তজীকে), কি ঠাকুর, রাখতে পারলেন না নিজের গয়না? শুনে অমনি ধমক — ছি, সেজোবাবু, বলছ কি? তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করছেন অহর্নিশ! এই মাটির ঢেলার তিনি বশ নন্। প্রেম ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়।

দ্বারকাবাবু, মথুরবাবুর ছেলে, চানকে ঠাকুরবাড়ি করেছিলেন। ওরা ঠাকুরকে বললে, মাকে জাগিয়ে দাও। তিনি খুব টাকাকড়ি খরচ করতে বললেন না। বললেন, চার ফেলো। তবে গভীর জল থেকে রাঙ্গাচোখ রুই মাছ আসবে। রাঙ্গাচোখ রুই — মানে, ভগবান। কি আছে (ব্রাহ্ম সমাজের) ওদের গানে?

মোটা সুধীর — অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়।
বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞযাগ,
তোমারে কি যায় জানা!

গান শুনিয়া শ্রীম বলিলেন, আহা কি গান! বেদের ভাঙ্গা গান! ঋষিরা, মন্ত্রদ্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা তাঁকে দর্শন করে এই সব কথা বলেছেন। তিনি অনুরাগে বদ্ধ হন, ঐশ্বর্যে নন। প্রেম ভক্তিতে বাঁধা। তাঁর সঙ্গে — তাঁর মহামায়ার সঙ্গে চালাকী! তা চলে না। দেখ না, তাঁকে দর্শন করে ঋষিরা প্রার্থনা করছেন, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' Always protect me (প্রসন্ন হয়ে সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন)। তিনি কোন পথে ভুলিয়ে দেন, তাই প্রার্থনা — 'তেন মাং পাহি নিত্যম্।' (শ্বেতা ৪:১১)।

অতো করে যাঁরা দেখেছেন তাঁকে, তাঁদেরই এই প্রার্থনা। আর হরে পেলার কথায় হবে কি? একটু চোখ বুজে, দু' পাতা বই উল্টিয়েই তাঁকে পেয়ে ফেলবে। রসো।

আবার শোন ঠাকুর কি বলছেন, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না। সর্বদা এই প্রার্থনা করতেন। লোকশিক্ষার জন্য করতেন। যে মা সঙ্গে সর্বদা — সেই মা-ই জগতকে ভুলিয়ে দিচ্ছেন দেখে এই প্রার্থনা করতেন ঠাকুর। এ কি আর মানুষের প্রার্থনা? ভগবানই মানুষ হয়ে মানুষের ভাবে করেছেন। তবেই অপরেও করবে — সর্বদা প্রার্থনা।

শ্রীম নীরব রহিলেন কিছুকাল। পুনরায় কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — আপনারা কেমন আছেন?

সাধু — ভালই। শরীরটা একটু দুর্বল।

শ্রীম — হাঁ, পুজোর এই কয়দিন কি খাটুনী গেল। পঞ্চমী থেকে আরম্ভ করে।

সাধু — আপনার শরীর কিরূপ?

শ্রীম — Weakness (দুর্বলতা), বয়স হয়েছে তাই। সেভেনটি ফাইভ এই শেষ হয়ে সেভেনটি সিক্সে পড়েছে, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন — এই তিন মাস। বিলেতফেরৎ ডাক্তার বলেন, যে কোনও সময়ে death (মৃত্যু) হতে পারে। সুনীল বোস, সুভাষ বোসের ভাই বললেন।

চন্দ্র, পূর্ণেন্দু প্রভৃতির প্রবেশ।

শ্রীম নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিজ হাতে করিয়া একটি বড় রসগোল্লা সাধুর হাতে আনিয়া দিলেন। ভক্তদেরও দিলেন বিজয়ার মিষ্টি।

স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, ইনি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছেন কর্ম নিয়ে। লক্ষ্ণৌ একটা তীর্থ, জড়ভরতের পূর্বাশ্রম। ভরত রাজা পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে থাকতেন ওখানে গোমতীতীরে। ঐখানে হরিণশিশুর স্নেহে পড়েন।

শ্রীম — বাঃ, তা হলে তো বেশ জায়গা! (সাধুর প্রতি) কবে যাচ্ছেন সেখানে?

সাধু — সময় চেয়েছি ঠাকুরের তিথিপূজা পর্যন্ত। ওঁরা অতো সময় দিতে রাজী নন।

শ্রীম — বাহিরে যারা থাকে তাদের বিপদ আছে। এখানে মঠে পরস্পর পরস্পরকে দেখছে। তাতে বিপদ কম। বাইরে কেউ নাই, নিজেরাই কর্তা।

আর এক রকম আছে ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে — যাদের অত্যন্ত ব্যাকুলতা ঈশ্বরের জন্য, তারা মঠে আশ্রমে থাকতে পারে না নিয়মকানুনের ভিতর। ভগবানকে আশ্রয় করে গাছতলায় পড়ে থাকে।

মঠের কর্তারা শুনতে পাচ্ছি খুব কড়া নিয়ম করবেন এখন। বড় আলগা যাচ্ছিল। তাইতে এই ধাক্কাটা গেল।

এই যা হল, এ কি আর মানুষ করেছে? তিনিই সব করলেন। তবে তাঁর ভাবটি ঠিক থাকবে। যারা ভোগ করছে তারা বের হয়ে গেল।

বড় নলিনী — লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হয়। যা তা বলে — এই যা হয়ে গেল এতে।

শ্রীম — কেন, বুঝাবেন এদের। ওকি মানুষ করলে কিছু? তিনি করলেন। ভগবান যিনি মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর একটা মিশন আছে — সেটার জন্য যা যা দরকার তিনি সব করবেন। এ কিছু মানুষ করে নাই। ও তো বড্ড আলগা যাচ্ছিল। এবার সকলেরই চৈতন্য হবে।

আমাদের কিছুই ভাবতে হবে না। শুধু তাঁকে প্রার্থনা করা। তিনিই সব করে নেবেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম উঠিয়া তুলসীকুঞ্জে গিয়া বসিলেন ছোট

কম্বলাসনে। ছাদের উত্তর দিকে অনেকগুলি টবে ফুলের গাছ বসান হইয়াছে, আর তুলসী। বেশ সুন্দর স্থান ঈশ্বরোপাসনার। উপরে আকাশে শরচ্চন্দ্র। শ্রীম উত্তরাস্য স্থির হইয়া ধ্যান করিতেছেন। একজন দূর হইতে উহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, ইহাই বুঝি ভবরোগের একমাত্র ঔষধ — ঈশ্বরচিন্তা। তাঁতে মগ্ন হয়ে থাকলেই শান্তি সুখ আনন্দ। বাহিরে মন এলেই দুঃখ। আবার সর্বজীবে তিনি — এ জ্ঞান হলেও শান্তি, সুখ।

দুইটি সাধু শ্রীম-র অলক্ষ্যে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ধ্যানমগ্ন — এই ভাবিয়া। প্রায় এক ঘন্টা ধ্যান করিলেন। একটি সাধু পুনরায় গিয়া দেখিলেন, শ্রীম ডান বাহু দিয়া নিজের তালু চাপিতেছেন, আর বাম হাতে বাম কোমর টিপিতেছেন। ভাবাবেশ প্রবল হইলে শ্রীম সর্বদা এইরূপ করেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া জলের ট্যাঙ্কের কাছে গিয়া পায়চারী করিলেন। তারপর সোজা ঘরে গিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। পূর্ব-পশ্চিম বিছানায় বাম কাতে শ্রীম শায়িত।

৩

আজ একটি সাধু আসিয়া শ্রীমকে খুঁজিতেছেন। মর্টন স্কুলের চারতলায় শ্রীম বাস করেন। তিনি সেখানে নাই। তিনতলায় গিয়া শুনিলেন, তিনি শৌচাগারে। কিছু পরে দেখা হইল তিনতলার কলের কাছে। দেখিয়াই শ্রীম বলিলেন, জগবন্ধুবাবু যে! সাধুটি করজোড়ে বলিলেন, আজ মহাপুরুষের ঔষধ নিতে কলকাতায় এসেছি বেলুড় মঠ থেকে। শ্রীম বলিলেন, আসুন আসুন, উপরে একটু বসবেন।

আজ ১৭ই অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। এখন অপরাহ্ন চারিটা। মর্টনের ছাদে শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণপ্রান্তে, উত্তরাস্য। সম্মুখের জোড়া বেঞ্চে বসিলেন সাধু। বেঞ্চের উপর শতরঞ্জি পাতা। কথাবার্তা চলিতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — কোন্ ডাক্তারের বাড়ি গিছলেন?

সাধু — অমর ডাক্তারের বাড়ি।

শ্রীম — বাড়ির সামনে ফটকে ট্যাবলেটে কি লেখা আছে?

সাধু (লজ্জিত হইয়া) — বোধহয়, ডাক্তার এ. মুখার্জ্জী, এম.ডি.

ফিলাডেলফিয়া।

শ্রীম — খুব minutely (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে) সব দেখতে হয়। 'বোধ হওয়া'র কর্ম নয়। খুব definite (নিশ্চিত) হতে হয়। ভগবান চক্ষু দিয়েছেন দেখতে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে। এ সবের কাজ নিতে হয়। স্বামীজীর কথা শুনেছি — প্রব্রজ্যার সময় কোন গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলে সে গ্রামে কত লোক, স্ত্রী পুরুষ, কি প্রকৃতি, কি আকৃতি — এসব দেখে নিতেন। এমন কি, 'গু' কেমন তাও দেখে নিতেন। তা না হলে কি ঐ কাজ করতে পারতেন, লোকশিক্ষা? সাধু জগদ্‌গুরু কিনা। তার সব দিকে নজর থাকবে। যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের খুব minute observation (সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ) চাই। আর definiteness (নিশ্চয়তা)।

সেদিন (মোটা) সুধীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম দুর্গাবাবুর কথা — ঠিকানা কি, নম্বর কি? উনি বললেন আমি বলতে পারি না। ঠাকুর বলতেন কি না — ভক্ত হ'বি তো বোকা হ'বি কেন? আবার বলতেন, যে নুনের হিসেব করতে পারে সে মিছরীর হিসেবও করতে পারে। বলতেন, ভক্তদের পিঠেও দু'টো চোখ হবে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — মহাপুরুষ কেমন আছেন? আমরা সর্বদা প্রার্থনা করছি যাতে তাঁর শরীরটি ঠাকুর আরও কিছুকাল রাখেন। তবেই মঠটি ঠিক থাকবে। তা নইলে কেউ কাউকে মানবে না। কম strain (মানসিক পরিশ্রম)! দিনরাত কাজ করছেন। কত খাটুনী। সব ভাবতে হচ্ছে।

এখন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম ঘরে গেলেন। ভাটপাড়ার ললিত আসিয়া বসিলেন। শ্রীম নিজ হাতে করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন। বিজয়ার মিষ্টিমুখ করিতে ললিতকে সন্দেশ দিলেন। তারপর আর দুইটি সাধুকে দিয়া বলিলেন, 'জগবন্ধুবাবু লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছেন'। সাধু বলিলেন, আমি কিছুদিন সময় চেয়েছি ঠাকুরের তিথিপূজা পর্যন্ত। তা ওঁরা কিছু consider (বিবেচনা) করবেন।

শ্রীম — না, আগে কাজ।

সাধু — সন্ধ্যা হচ্ছে, এবার আমি আসি।

শ্রীম — হাঁ, আসুন। হাওড়া হয়ে যেতে হবে তো?

সাধু সিঁড়ির নিচে নামিতেছেন। শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে গেলেন আর বলিলেন, হাঁ, জয়রামবাটীর খবর জান কিছু। জগবন্ধুবাবুকে বলছি। সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না। শ্রীম বলিলেন, তুমি এসো। অনেক দূর যেতে হবে।

৪

মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। আজ ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। শ্রীম-র চারতলার শয়নকক্ষ। এখন রাত্রি সাতটা। শ্রীম তাঁহার চেয়ারে বসিয়া ঠাকুরের ছবি দেখিতেছেন। বেলঘরিয়ার বাগানের নূতন ছবি। ছবিটি কুচবিহারের রাজবাটীতে পাওয়া গিয়াছে। ঠাকুর কেশব সেনের কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ভাবে সমাধিস্থ।

স্বামী রাঘবানন্দ শ্রীম-র কাছেই আজকাল থাকেন আমেরিকা হইতে আসিয়া। তিনিও দেখিতেছেন। আর শুকলাল, সুখেন্দু, পূর্ণেন্দু, হিমাংশু, রমণী প্রভৃতি ভক্তগণও একে একে ঐ নূতন ছবি দর্শন করিতেছেন।

এমন সময় বিনয় মহারাজ ও জগবন্ধু মহারাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম তাঁহাদের দেখিয়াই আনন্দে বলিতে লাগিলেন, আসুন, আসুন। ভক্তগণ সকলে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পাশেই হ্যারিকেনের আলো। শ্রীম আহ্লাদে বলিতেছেন, এঁদের দেখান ঠাকুরের নূতন ছবি। 'কথামৃতে' আঠা দিয়ে লাগিয়ে রেখে দিলাম। বাঁধালে হারিয়ে যেতে পারে। এখন আর নষ্ট হবার উপায় নেই।

বিনয় ও জগবন্ধু বেলুড় মঠ হইতে দাঁতের ডাক্তারের কাছে ধর্মতলা গিয়াছিলেন। কার্যশেষে সেখান হইতে এখানে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

খানিক পরে শ্রীম উঠিয়া সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন, সিঁড়ির পাশে চেয়ারে উত্তরাস্য। তাঁহার সামনে জোড়া বেঞ্চে শতরঞ্জির উপর বসিলেন স্বামী রাঘবানন্দ, জগবন্ধু ও বিনয়। ভক্তরা আবার বেঞ্চে সামনাসামনি উত্তর-দক্ষিণাস্য বসিয়াছেন। একটু পর আসিলেন অমৃত, বলাই, শান্তি, ছোট নলিনী, গুহ ও চশমাপরিহিত একজন নূতন ভক্ত। বয়স পঞ্চাশ হইবে। ঠাকুরের নূতন ছবি সম্পর্কে কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়েছিল কি?

শ্রীম — হাঁ, হয়েছিল বোধহয়। তবে সামান্যভাবে। কিন্তু দোলের সময় ভক্তরা খুব আনন্দ করেছিল। মনে আছে, ফাগ দিচ্ছে আর দৌড়াদৌড়ি করছে। তখন বোধহয় তিনি ভাল ছিলেন। ভক্তদের অবস্থা দেখলে তাঁর অবস্থা বোঝা যায়। তখনও তিনি আনন্দে ছিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, ঠাকুরের ক'টা ছবি আছে?

শ্রীম — একটি রাধাবাজারে নেওয়া কোটপরা, দাঁড়ানো। একটি কেশববাবুর বাড়িতে — এটিও দাঁড়ানো। আর একটি — নিত্য যাঁর পূজা হয় আজকাল। আর একটি এই।

স্বামী রাঘবানন্দ — ব্রাহ্মণীর শেষটা কি হলো? কিছুই জানা যায় না।

শ্রীম — কামারপুকুরের লাহাদের ঝিয়ারী একজনের মুখে শুনেছিলাম। তিনি তাঁকে দেখেছিলেন বৃন্দাবনে ধ্যানস্থ। বললেন, ও বামুন ঠাকরুণ, চিনতে পারছো? একবার চোখ মেলে চাইলেন, অমনি আবার ধ্যানস্থ।

ঝিয়ারী মানে — ঝি, মেয়ে, বউ-ঝি, পুত্রবধূ।

স্বামী রাঘবানন্দ — কখন?

শ্রীম — সময় জানা নাই। তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে যারা ছিল তাদের তখন বেশ ছিল। পরে অনেকের নানা রকম দেখা গেল।

যেমন জালে বড় বড় মাছগুলো প্রথম দেখা যায়। পরে জাল ঝেড়ে ছোট ছোট মাছগুলি ফেলে।

স্বামী রাঘবানন্দ — ব্রাহ্মণী খুব লোক! কত করেছেন!

শ্রীম — হাঁ, আবার কামারপুকুরে ঝগড়াও করলেন (হাস্য)।

তাঁর (ঠাকুরের) ব্যাপার বোঝা শক্ত। ওঁরা (বৈষ্ণবরা) বলেন, 'আমরা গোরার সঙ্গে থেকে গোরার ভাব বুঝতে পারলাম না গো।'

চাঁদ জলেতে পড়েছে। মাছগুলো মনে করলে, এই চাঁদকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু সত্যিকার চাঁদ কোথায় — উচ্চে!

'Sages of India'-তে ('ভারতীয় মহাপুরুষগণ'-এ) স্বামীজী এক এক করে অনেকগুলি অবতারের নাম বললেন — রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য। শেষে বললেন, Sri Ramakrishna is the summation of them all. তার মানে, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের সকলের সমষ্টি — অবতার।

স্বামী রাঘবানন্দ — একটা চিঠিতে বলেছেন, সব দেখছি মায়ের ইচ্ছা। এতো পুরুষকার! শেষে এই কথা।

শ্রীম — শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, 'পৌরুষং নৃষু' — তিনিই পুরুষকার। (গীতা ৭:৮)।

পুতুলনাচ হচ্ছিল। অনেক row-তে (সারিতে) লোক বসেছে। শেষের দিকে যারা বসেছে তারা ভাবলে, পুতুল আপনিই নাচছে। সেই লোকদের ক্রমে promotion (আগে আনা) হলো first row-তে (প্রথম পংক্তিতে)। তখন দেখলে — না, একজন তাদের নাচাচ্ছে।

আর একটি চিঠিতে বলেছেন, 'রসো মা, যাচ্ছি।' অন্য একটায় বলেছেন, 'আমি দেখছি, অনন্তকাল থেকে এ চলছে। আমি তার ভিতর চুপ হয়ে বসে আছি।' তার মানে, এই কর্মপ্রবাহ — সংসার। তা বলবেন না — কত বড় যোগী!

কমল নিচের তলায় হারমোনিয়াম সংযোগে গান করিতেছেন। তাহার রাগিণী শ্রীম-র কানে পৌঁছিল। কথা বন্ধ করিয়া শ্রীম আকর্ণ শুনিতেছেন। পরে বলিলেন, মনটা ঐখানে টেনে নিয়ে গেছে চকিতের মত। সর্বত্রই আনন্দ।

শ্রীম — স্বামীজীর গলা মনে পড়ছে। কি গলা! এটা কি রাগিণী?

অমৃত নিচে গিয়া জানিয়া আসিলেন, মিশ্র কানাড়া।

এখন রাত্রি আটটা।

শ্রীম — স্বামীজীর একটা গান মনে পড়েছে এই রাগিণীর 'জীবন কর সনাথ।' কাশীপুরে ঠাকুর উপরে, নিচে গান হচ্ছে। আহা, কি গান!

আচ্ছা একটু কথামৃত পাঠ হোক। আনুন তো বইটা।

শ্রীম চারিভাগ একত্রে বাঁধান কথামৃতখানা হাতে লইয়া পাতা উল্টাইতেছেন। এক হাতে বই, আর এক হাতে পাতা উল্টাইতেছেন। একস্থানে চোখে কিছু পড়িল, অমনি হাসিতেছেন। বলিতেছেন, শ্রীনাথ বলছেন, পূর্বসংস্কার তো আছে? ঠাকুর বলছেন, একে বল না। ঈশ্বরকোটির কিছুই দোষ নাই (হাস্য)।

অন্ধের কথায় বললেন, এক জন্ম অন্ধ থাকতে হবে গঙ্গাস্নান করলেও (হাস্য)। তবে শতজন্ম আর ভোগ করতে হবে না।

ঠাকুর হেসে হেসে বলছেন, মানে শ্রীনাথ intellectual question

(উচ্চস্তরের প্রশ্ন) করেছেন। আর ঠাকুর কেমন meet (উত্তর) করলেন।

শ্রীম 'দোলযাত্রা' বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, এখানে পড়ুন। একটি ভক্ত হ্যারিকেনের আলোতে পড়িতেছেন। শ্রীম ধ্যানস্থ, শুনিতেছেন। সাধু ও ভক্তরাও সকলে বসা।

পাঠক পড়িতেছেন — মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন, 'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।' ইত্যাদি।

প্রশ্ন করিতেছেন একজন শ্রোতা।

স্বামী রাঘবানন্দ — 'অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্'—এর মানে কি?

শ্রীম — হরি যদি অন্তরে ও বাইরে — অর্থাৎ সর্বত্র থাকেন তবুও তপস্যার দরকার নাই। আর যদি না থাকেন তথাপি দরকার নাই। তবে কি লোক তপস্যা করবে না? তা নয়। নারদের আর তখন দরকার ছিল না। তাই দৈববাণী হলো। কে এসে বললেন এই কথা?

জগবন্ধু — সরস্বতী।

শ্রীম — হ্যাঁ, হবে। 'নারদ পঞ্চরাত্র'তে আছে এইটি। উনি যদি তপস্যা করেন তবে কাজ হবে কেমন করে?

জগবন্ধু — কাশীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব সামান্যভাবে যদি হয়ে থাকে তাঁর অসুখের জন্য, তবে দোলের সময় ওখানে অত আনন্দ হয় কি করে? শুক্লা দ্বিতীয়ার পরই তো ফাল্গুন-পূর্ণিমা। এতো অল্প সময়ে ভাল হয়ে গেলেন ঠাকুর?

শ্রীম — হাঁ। তবে সব সময় তিনি বলতেন না। যাতে ভক্তগণ আনন্দে থাকতে পারে তাই দেখতেন। ভক্তগণের অবস্থা দেখে তাঁর অবস্থা অনেকটা ধরা যেতো।

পাঠ চলিতেছে। বিনয় ও জগবন্ধু প্রণাম করিয়া উঠিলেন, বেলুড় মঠে যাইবেন। রাত্রি সাড়ে আটটা।

৫

মর্টন স্কুল। সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ কেহ কেহ বসিয়া আছেন বেঞ্চে শ্রীম-র সামনে ও পাশে। একজন সাধু বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন, আজ ২রা নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। শ্রীম তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজের চেয়ারে ডান হাতে বসাইলেন, পিলারের সামনে। সাধুকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতেছেন, দেখলেন, অগস্ত্য অত বড় ঋষি! বলছেন, আমাদের ভুলিও না প্রভো! তাই সর্বদা আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, যাতে না ভুলান। ঋষিরা বুঝেছেন, দেখেছেন, তিনি ভুলিয়ে দেন। তাই সর্বদা এই প্রার্থনা। আচ্ছা, আপনি একটু অধ্যাত্ম-রামায়ণ পড়ে শোনান আমাদের।

সাধু পড়িতেছেন, অরণ্যকাণ্ডের শেষ অধ্যায়, আর সুন্দরকাণ্ডের প্রথম দুইটি অধ্যায়। এসব স্থানে কেবল প্রার্থনার কথাই পড়া হইল।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — দেখুন, সর্বত্র সর্বদা প্রার্থনা, শরণাগতি। ঋষিরা যা করেছেন আমাদেরও তা করা উচিত — অন্ততঃ চেষ্টা করা উচিত। এ বই বাঁচবার উপায় নাই। যে যত বড়ই হউক, তিনি সকলের বড়। তিনিই আমাদের সর্বদা দেখছেন। আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি। আমাদের আবার অহংকার যাবার যো নাই। তাই ব্যবস্থা শরণাগতি। ঠাকুর বলেছেন তাই, থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে —অহংকার যখন যাবার নয়। এমনি ব্যাপার! ঋষিরা পর্যন্ত অসহায়। আর কি করে লোকে বলে আমার হয়ে গেছে। যাবৎ শরীর, তাবৎ প্রার্থনা — শরণাগতি। শরীরধারী সকলেরই এই অবস্থা। শোনা যায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও সর্বদা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত। অপরের কা কথা! বলছেন, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং। তেন মাং পাহি নিত্যম্।'

এই প্রার্থনাটি শেখাতে আবার ঠাকুর এসেছেন। সাধারণ লোক বলবে, কিরূপ অবতার? সর্বদা প্রার্থনা করেছেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না' বলে! তা করবেন না! অবতার মানে perfect man and perfect God. (মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের একাধারে পূর্ণ প্রকাশ)। মানুষভাবে দেখছেন, মহামায়ার কি কাণ্ড। তাই মানুষকে শেখাবার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করছেন। অন্য পথ নাই যে! তুমি জ্ঞানযোগীই হও, আর ভক্তিযোগী, কি রাজযোগীই হও, তাঁর মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণের এই এক পথ — সর্বদা প্রার্থনা। তিনি কৃপা করে পথ ছাড়লে তবে অন্দরবাড়িতে যাওয়া যায়, তাঁর দর্শন হয়। পর্দা সরলেই কেবল তাঁর দর্শন হয় — মায়ের, ঠাকুর বলতেন। তাই সর্বদা 'ত্রাহি ত্রাহি' প্রার্থনা, মা ভুলিও না।

বেলুড় মঠ। ২রা নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(ত্রয়োদশ ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় সংস্করণ
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ,১লা কার্তিক, ১৪১৬
(১৯শে অক্টোবর, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬/৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন
(ত্রয়োদশ ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

৯

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

সঞ্চয়ন ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভিতরে সাম্য বাহিরে ভেদ ১৯

তৃতীয় অধ্যায়

পূজারী কি ভগবান — এই ধাঁধা ৩০

চতুর্থ অধ্যায়

তোমাকে মায়ের একটু কাজ করতে হবে ৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

রাজর্ষি ভক্ত চিত্তরঞ্জন ৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরদা তুললে সব চুপ — মান্দালের ভক্ত ৬৩

সপ্তম অধ্যায়

মনের ক্ষতিপূরণ হয় সর্বস্ব ত্যাগে ৭৩

অষ্টম অধ্যায়

নিমন্ত্রণে সকলেই খাবে — আগে আর পরে ৮৭

নবম অধ্যায়

বিশ্রান্তির অন্বেষণে ৯৬

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তিমান বিগ্রহ ঠাকুর ১০৭

একাদশ অধ্যায়

গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন — তাঁর এক একটি স্ফুলিঙ্ক ১১৯

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীম ও শ্রীমহাপুরুষ ১৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শ্রীম ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী - বুদ্ধিভ্রষ্টকে বুদ্ধিদান ১৪৬
চতুর্দশ অধ্যায়
নাগজয়ন্তী — ডক্টর মরিনো ১৬৫
পঞ্চদশ অধ্যায়
গৃহেই থাক আর গৃহ ছাড় — লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন ১৭৪
ষোড়শ অধ্যায়
ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ, পুরীধাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫
সপ্তদশ অধ্যায়
ভক্ত দুই শ্রেণী — মাছি ও মৌমাছি ১৯২
অষ্টাদশ অধ্যায়
পঞ্চবটীতে বনভোজন ২০২
ঊনবিংশ অধ্যায়
ভক্তদের পিঠেও দু'টো চোখ থাকবে ২০৯

* * *

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)